



মাসুদ রানা

# শান্তিদূত ১

কাজী আনোয়ার হোসেন

ANIK

RIZON



## এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় \* ভারত-নাট্যম \* স্বর্ণমৃগ \* ছঃসাহসিক  
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা \* দুর্গম দুর্গ \* শত্রু ভয়ঙ্কর \* সাগর-সঙ্গম-১,২  
রানা ! সাবধান ! ! \* বিস্মরণ \* রত্নদ্বীপ \* নীল আতঙ্ক-১, ২  
কায়রো \* মৃত্যুপ্রহর \* গুপ্তচক্র \* মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র  
রাত্রি অন্ধকার \* জাল \* অটল সিংহাসন \* মৃত্যুর ঠিকানা  
ক্ষাপা নর্তক \* শয়তানের দূত \* এখনো ষড়যন্ত্র \* প্রমাণ কই ?  
বিপদজনক-১, ২ \* রক্তের রঙ-১, ২ \* অদৃশ্য শত্রু \* পিশাচ দ্বীপ  
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ \* ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ \* গুপ্তহত্যা  
তিনশত্রু \* অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ \* সতর্ক শয়তান \* নীলছবি-১, ২  
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ \* পাগল বৈজ্ঞানিক \* এসপিওনার্ড-১, ২  
লাল পাহাড় \* হংকম্পন \* প্রতিহিংসা-১, ২ \* হংকং সত্ৰাট-১,২  
কুউউ ! \* বিদায় রানা-১, ২, ৩ \* প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ \* আক্রমণ-১,২  
গ্রাস-১, ২ \* স্বর্ণতরী-১, ২ \* পপি \* জিপসী-১, ২  
আমিই রানা-১, ২ \* সেই উ-সেন-১, ২ \* হ্যালো, সোহানা-১,২  
হাইজ্যাক-১, ২ \* আই লাভ ইউ, ম্যান-১,২,৩ \* সাগর কথ্যা-১,২  
পালাবে কোথায়-১,২ \* টার্গেট নাইন-১,২ \* বিষ নিঃশ্বাস-১,২  
প্রেতাশ্রা-১, ২ \* বন্দী গগল \* জিম্মি \* তুষার যাত্রা-১, ২  
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ \* সন্ন্যাসিনী \* পাশের কামরা  
নিরাপদ কারাগার-১, ২ \* স্বর্ণরাজ্য-১, ২ \* উদ্ধার-১, ২  
হামলা-১, ২ \* প্রতিশোধ-১, ২ \* মেজর রাহাত-১, ২  
লেনিনগ্রাদ-১, ২ \* অ্যামবুশ-১, ২ \* আরেক বারমুড়া-১,২  
বেনামী বন্দর-১, ২ \* নকল রানা-১, ২ \* রিপোর্টার-১,২  
মরুযাত্রা-১, ২ \* বন্ধু \* সংকেত-১, ২, ৩ \* স্পর্ধা-১,২  
চ্যালেঞ্জ \* শত্রুপক্ষ \* চারিদিকে শত্রু-১, ২ \* অগ্নিপুরুষ-১,২  
অন্ধকারে চিতা-১, ২ \* মরণকামড়-১, ২ \* মরণখেলা-১,  
অপহরণ-১, ২ \* আবার সেই ছঃস্বপ্ন-১, ২ \* বিপর্যয়-১,



## শান্তিদূত-১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

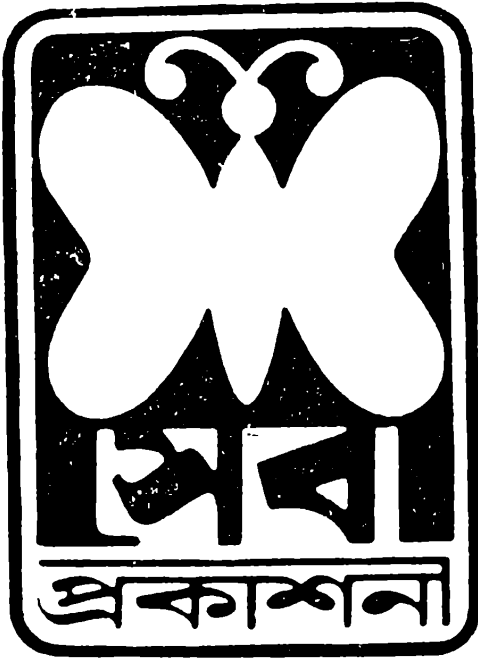
---

সিরিজের অন্ত্য বই পড়া না থাকলেও-বুঝতে পারবেন

---

**কাজী আনোয়ার হোসেন**

রানা-১৪৯



প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

**সেবা প্রকাশনী**

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৭

রচনা বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শরীফত খান

মুদ্রণে :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা,

ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা

**সেবা প্রকাশনী**

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

দূরালোপন ৪০৫৩৩২

শো-রুম :

**সেবা প্রকাশনী**

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHANTIDOOT-1

By Qazi Anwar Husain

M: sud Rana-149



# আসুদ ঝাঝা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের  
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই  
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে ।  
বিচিত্র তার জীবন । অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি ।  
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর ।  
একা ।  
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না ।  
কোথাও অগ্রায় অবিচার অত্যাচার দেখলে  
রুখে দাঁড়ায় ।  
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়  
আর মৃত্যুর হাতছানি ।  
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে  
পরিচিত হই ।  
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে  
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের  
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে ।  
আপনি আমন্ত্রিত ।  
ধন্যবাদ ।



---

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক ।  
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে  
এর কোনও সম্পর্ক নেই ।

॥ লেখক ॥

# এক

কেউ কিছু জানতে পারলো না। রাতের শেষ প্রহরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে মানুষ—চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো বাড়িটাকে।

গাড়িগুলোকে দূরে রেখে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে এলো ওরা। চারটে রাস্তায় ত্রিশ গজ পরপর একজন করে পজিশন নিলো। হাড় কাঁপানো শীত হলেও ক’দিন থেকে কুয়াশা খুব হালকাভাবে পড়ছে, তাই বিদ্যুৎ বিভাগকে আগেই অনুরোধ করা হয়েছিল—রাত ঠিক সাড়ে চারটের সময় রাস্তাগুলোর সব আলো নিভে গেছে। দু’পাশে দিয়াশলাই আকৃতির আপার্টমেন্ট ভবন, কোথাও কোনো জানালা খোলা নেই। সাথে টর্চ থাকলেও একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ তা জ্বাললো না। কিছু কিছু শব্দও হলো, এড়ানো গেল না—কঠিন কংক্রিটের বুকে বুট জুতোর দ্রুত উত্থান আর পতন, ইউনিফর্ম-সেলাই করা ধাতব বোতামের সাথে মেশিন পিস্তল আর অ্যাসল্ট রাইফেলের ঘষা, কমাণ্ডারের চাপা কণ্ঠের নির্দেশ।

গোঁকি স্ট্রীটের দুই মাথায় ছটো করে চারটে জীপ। বরিসভ স্ট্রীটের মাঝখানে একটা অ্যান্ডুলেন্স। নস্টামকিন বুলেভার্ড—পাপেট

থিয়েটারের জন্যে বিখ্যাত—বেশিরভাগ গাড়ি এখানেই রাখা হয়েছে।  
যান্ত্রিক মই, কুণ্ডলী পাকানো রশি, রশির সিঁড়ি, ইত্যাদি সহ দমকল  
বাহিনীর গাড়িটা রয়েছে তাশিনেভো স্ট্রীটে।

বাড়িটার চারদিকে উঁচু-নিচু অনেক ছাদ, প্রায় সব ক'টায় উঠলো  
ওরা। কর্কশ মেঝেতে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে শুয়ে থাকলো,  
প্রত্যেকের সাথে রাইফেল। এরা সবাই স্টেট সিকিউরিটি কমিটি-র  
বিশেষ একটা ইউনিটের সদস্য, ইউনিফর্ম পরে আছে। অপারেশনটা  
কে. জি. বি.-র, সংখ্যায় তারাই বেশি—বত্রিশ জন। সবাই সিভিল  
ড্রেসে।

বাড়িটাকে ঘিরে থাকা সরু গলি আর রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো  
ওরা। ওভারকোটের নিচে স্টেচকিন মেশিন পিস্তল, ভাঁজ করা স্টক  
সহ কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল, আর গ্যাস গান। প্রত্যেকেই  
ওরা নিপুণ লক্ষ্যভেদী। অভিজ্ঞ পেশাদার, নিজেদের কাজে ভারি  
দক্ষ, কর্নেল বিকারেন পছন্দ মতো বাছাই করে এনেছেন। এ-  
ধরনের জটিল অপারেশনে যাদের ওপর তিনি আস্থা রাখতে পারেন।  
কে. জি. বি.-র ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর প্রথম এবং প্রধান  
লক্ষ্য অপারেশনটা সফল করা, সেই সাথে দেখতে হবে আবাসিক  
এলাকার নিরাপত্তা এবং শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। তাঁর বাছাই  
করা লোকেরা সবাই জানে, নিরীহ নাগরিকদের কোনো রকম অশু-  
বিধে করা চলবে না।

কর্নেল বিকারেনের বয়স বাহান্ন, দেখে মনে হয় বিয়াল্লিশ। সম-  
স্যার অকূল সাগরে যখন হাবুডুবু খান তখনো তাঁর ঠোঁটে ক্ষীণ  
হাসির রেখা লেগে থাকতে দেখা যায়। যে-কোনো সমস্যাকে তিনি  
গুরুত্বের সাথে নেন, কিন্তু উদ্বেগে ব্যাকুল হওয়া তাঁর স্বভাব নয়।

প্রায় ছ'ফিট লম্বা, শরীরে সামান্য মেদ আছে কি নেই, চোখে কৌতুক মেশানো বুদ্ধির ঝিলিক। রাস্তার দু'পাশে আরেক বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সবাইকে দেখে নিলেন—যে যার পজিশনে দাঁড়িয়েছে। এ-ধরনের অপারেশনে তিনি নিজের বিশেষ একটা পজিশনে থাকতে পছন্দ করেন, ভাগ্যগুণে আজও সেটা জুটে গেছে। বাড়িটার ঠিক উল্টো দিকে, আরেক বাড়ির টপ ফ্লোর। প্রাক্তন সৈনিক, উঁচু জায়গা থেকে যুদ্ধ করার অভ্যেসটা এখনো রয়ে গেছে।

চোখ থেকে বায়নোফিউলার নামালেন কর্নেল বিকারেন। হাত-ঘড়ির দিকে তাকালেন, ছ'টা বাজতে চলছে। সূর্য উঠলেও, অপ্রত্যাশিত কুয়াশার মোটা চাদর ফুঁড়ে রোদ নামতে পারছে না। সারাটা রাত জেগে, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ডলে চোখের জ্বালা নেভাবার চেষ্টা করলেন তিনি। পাশে দাঁড়ানো কোঁকড়া চুল সহকারীকে বললেন, 'আর দেড়ি করা চলে না। স্কুলের সময় হয়ে আসছে, ছেলেমেয়েরা বেরুতে শুরু করবে।'

'তাহলে হুকুম দেই, কর্নেল কমরেড?' দীর্ঘদেহী দানব লোকটা, মানুষ বুঝে কারো সাথে বিনয়ের অবতার, কারো কাছে নিষ্ঠুর চণ্ডাল। ছোটোই তার বাইরের চেহারা, ভেতরের মানুষটা কাজ পাগল এবং কর্মকর্তাদের হুকুম পালনে নিবেদিত প্রাণ। প্রায় সব অপারেশনেই তাকে সাথে রাখেন কর্নেল, কারণ ওর মতো ভালো-ভাবে আর কেউ তাঁর নির্দেশ বোঝে না।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল বিকারেন।

ওয়াকি-টকি অন করে মুখের সামনে তুললো লেফটেন্যান্ট কুরা-ডিন, নিচু গলায় কথা বললো, 'রেড ড্রাগন সমস্ত ইউনিটকে বলছি।



রেড ড্রাগন সমস্ত ইউনিটকে বলছি। ভেতরে ঢোকো। সব ক’টা রেড ড্রাগন ইউনিট এই মুহূর্তে ভেতরে ঢোকো।’

কর্নেল দেখলেন, এক শো এগারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে এক জোড়া অ্যাস্ট স্কোয়াড ঢুকে গেল। চোখের আড়ালে হারিয়ে গেলেও, লোকগুলো কি করছে পরিষ্কার কল্পনা করতে পারলেন তিনি। তিনজন সেলারে নেমে গিয়ে তল্লাশী চালাচ্ছে, দু’জন পাহারায় রয়েছে ক্ষুদে লবিতে, নয় জন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে—বারো নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামবে তারা। অন্য একটা টিম ইতিমধ্যে বাড়িটার পিছন দিকে পজিশন নিয়েছে, পালাবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ।

‘জ্যান্ত। লোকটাকে আমি জ্যান্ত চাই।’

‘সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কর্নেল কমরেড,’ প্রকাণ্ডদেহী লেফটেন্যান্ট বললো।

‘ওর মা আছে।’ ইতস্তত করে চুপ করে গেলেন কর্নেল বিকারেন।

‘এবং অবিবাহিত বোন। কিন্তু আমরা জানি না তারাও এর সাথে জড়িত কিনা। আপনার নির্দেশ ওদের আমি জানিয়ে দিয়েছি—কেউ বাধা না দিলে কাউকে কিছু বলা চলবে না।’

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল, বাড়িটার ভেতর থেকে পিস্তলের আওয়াজ হলো। মাত্র একবার।

লেফটেন্যান্ট কিছু বলার আগেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নামতে শুরু করলেন কর্নেল।

গোফি স্ট্রীট। রাস্তা পেরিয়ে এক শো এগারো নম্বর বাড়িটার দিকে ছুটলেন তিনি। আরো আওয়াজ হলো গুলির। নির্দেশ

দেয়ার সময় তাঁর গলার শিরা ফুলে উঠলো। একেক বারে তিনটে করে ধাপ টপকে ওপরতালার দিকে ছুটলেন। তাঁকে অনুসরণ করলো আরো তিনজন কে. জি. বি. এজেন্ট। বারো নম্বর অ্যাপার্ট-মেন্টের দরজা ভাঙা হয়েছে, ফ্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন কজা সহ দরজার কবার্ট কাত হয়ে আছে এক দিকে। দোরগোড়ায় চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে একজন কে. জি. বি. করপোরাল, তার বেণ্টের ওপর নাভির কাছে তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে শার্ট, ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে লোকটা।

‘অ্যাম্বুলেন্স!’ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের লোকদের বললেন কর্নেল, লাফ দিয়ে আহত করপোরালকে টপকে ঢুকে পড়লেন অ্যাপার্ট-মেন্টের ভেতর।

সুসজ্জিত কামরা। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন কর্নেল। দেয়ালে লেনিন আর স্ট্যালিনের ছবি।

‘এদিকে, কর্নেল কমরেড,’ ভারি একটা কর্ণিসর শোনা গেল।

‘বৈঁচে আছে ও?’

বেডরুমের দোরগোড়া থেকে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো ক্যাপটেন। তার মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। ‘জী, কর্নেল কমরেড। আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি।’

উকি দিয়ে আগেই দেখেছেন কর্নেল, এবার সরাসরি খাটের তলায় তাকিয়ে মা আর মেয়েকে আশ্বাস দিলেন, ‘আপনাদের কোনো ভয় নেই। কেউ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আপনাদের কোনো ভয় নেই।’

বেডরুমে ঢুকলেন তিনি। মেঝের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে একটা শরীর। যার জন্যে এতো আয়োজন, এই সেই লোক।

এক চুল নড়ছে না ।

‘ষোলো আনা বেঁচে আছে, কর্নেল কমরেড,’ আশ্বস্ত করলো ক্যাপটেন । তার সঙ্গীরা জানালার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । ‘পেটে গুলি হাঁটুর গুঁতো মেরেছি, ব্যাস ।’

মেঝে থেকে গুড়িয়ে উঠলো লোকটা ।

‘অকৃতজ্ঞ ছেলের চেয়ে পেটে হাঁটুর গুঁতো কম ব্যথা দেয়, গ্রাম দেশের প্রবাদ, কর্নেল কমরেড,’ তিনটে স্টেইনলেস স্টীলের দাঁত বের করে হাসলো ক্যাপটেন ।

‘প্রাণ বাঁচিয়েছো মানে ?’ জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ।

‘নক করতেই গুলি করলো, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকলাম আমরা । ঢুকে দেখি মা-বোনের সাথে ধস্তাধস্তি করছে । ফাঁকা আওয়াজ করলাম আমরা, মহিলারা খাটের তলায় লুকালো । বুড়ি মায়ের প্রশংসা করতে হয়, ছেলের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন ।’ নিজের ফুলে থাকা পকেটে চাপড় মারলো ক্যাপটেন । ‘বেডরুমে ছুরি হাতে অপেক্ষা করছিল ছোকরা, সেটা কেড়ে নিয়ে... ।’

কর্নেলের চেহারায় বিরক্তির ভাব ।

‘পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারার আগে ওর পেটে মেশিন পিস্তল ঠেকিয়েছিলাম, কর্নেল কমরেড,’ বললো ক্যাপটেন । ‘মুখের ভেতর থেকে এই ক্যাপসুলটা বেরিয়ে এলো ।’ মুঠো খুললো ক্যাপটেন, তার ঘামে ভেজা তালুতে নীল একটা ক্যাপসুল দেখলেন কর্নেল । দেখেই চিনলেন—সায়ানাইড ক্যাপসুল, পেটে পড়ার সাথে সাথে মৃত্যু হবার কথা । হাতে ওয়াকি-টকি নিয়ে বেডরুমে ঢুকলো লেফটেন্যান্ট কুরাডিন । ক্যাপসুলটা সে-ও দেখলো ।

ব্রিটিশ, আমেরিকান, বা চাইনিজ নয়, ওটা রাশিয়ান সুইসাইড

ক্যাপসুল । কর্নেলের চেহারায় হতভম্ব ভাব, কারণটা বুঝতে পারলো কুরাডিন । কোথাও মারাত্মক কোনো ষড়যন্ত্র পাকানো হয়েছে ।

এ-সব নিয়ে কোনোই মাথাব্যথা নেই এলিস থেলারের । প্রায় ছ'-হাজার মাইল দূরে রয়েছে সে, আমেরিকার ডেনভারে । শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছ'কামরার বাড়িটায় বসে আপনমনে চিনে বাদাম চিবোচ্ছে বেচারী, জীবনে কখনো স্টেট সিকিউরিটি কমিটি-র নাম পর্যন্ত শোনেনি । রাজনীতি সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই, স্পাই মুভি দেখে না, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন । চিনে বাদামের সাথে বিয়ার পান করছে থেলার, অপেক্ষা করছে খবরের পর কখন নাচের অনুষ্ঠান শুরু হবে টিভিতে । জানে না, প্রায় দেড় যুগ পর তার ভাগ্য তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতে উঠতে চাইছে ।

## দুই

---

এগারো নম্বর ক্রোপুতকিন স্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়িটা সংস্কৃতিবান মস্কোবাসীদের জন্যে বিরাট এক আকর্ষণ । লেভ তলস্তয় মিউজিয়াম শাস্তিদূত-১

ওটা। অমর কথাশিল্পীর স্বহস্তে লিখিত অ্যানা কারেনিনা, ওঅর অ্যাণ্ড পীস, ইত্যাদি যুগান্তকারী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রয়েছে ওখানে। দেশ-বিদেশের কতো শতো লোক ওগুলো দেখার জন্যে প্রতিদিন আসছে। কিন্তু মাত্র চারটে দরজা ছাড়িয়ে পাথরের তৈরি প্রাচীন বাড়িটায় কি ঘটছে কেউ তা জানে না। এক কালে ওটা জারের কোনো এক দূর সম্পর্কীয় ভাইয়ের লীলা-নিকেতন ছিলো। খিলান আকৃতির গেটে একটা সাইনবোর্ড লটকানো আছে—বোটানিকাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আসলে তাও নয়, বাড়িটা হলো কে. জি. বি.-র থার্ড ব্যুরো-র হেডকোয়ার্টার। আর থার্ড ব্যুরো মানেই হলো স্টেট সিকিউরিটি কমিটি।

পাথুরে বাড়িটার বেসমেন্টে ছয় হাজার পুরনো মদের বোতল রাখা হতো এক কালে। এই মুহূর্তে সেখানে একটা ইন্টারোগেশন টিম সুকৌশল এবং দক্ষতার সাথে বন্দী লোকটাকে কথা বলাবার চেষ্টা করছে। বন্দীর ওপর নির্যাতন চালানো নতুন কিছু নয়, সেই আদি যুগ থেকে চলে আসছে। বর্তমান যুগে এ-ব্যাপারে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে কমিউনিস্ট বা পুঁজিবাদী সরকার কেউ কারো চেয়ে পিছিয়ে নেই, আর তৃতীয় বিশ্বের জগাখিচুড়ি মার্কী সরকারগুলো তো এক কাঠি বাড়ী মাত্রা জ্ঞান না থাকায় বেশিরভাগ সময় বন্দীকে তারা মেরে ফেলে। কে. জি. বি.-র ইন্টারোগেশন সিস্টেম বরং সি. আই. এ. সিস্টেমের চেয়ে অনেক কম রোমহর্ষক। কে. জি. বি. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, নির্যাতনের মাত্রা অত্যন্ত ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়। আকস্মিক নিষ্ঠুরতা সি. আই. এ. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য, ফলাফল অনেক ভাড়াতাড়ি আসে।

এপ্রিলের চমৎকার সন্ধ্যা, কুয়াশা কেটে গিয়ে থালা আকৃতির



টান্ড উঠেছে আকাশে। পঞ্চাশ গজও দূরে নয়, সাজানো বাগান থেকে ভুর ভুর করে ফুলের গন্ধ ছুটছে, কিন্তু সুবাস নিয়ে বেসমেন্টে ঢোকান সুযোগ নেই হিমেল বাতাসের। সবুজ চামড়া মোড়া একটা আর্মচেয়ারে, দেয়াল ঘেঁষে বসে আছেন কর্নেল আনাতোলি বিকারেন। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা, যেন আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। অথচ নির্যাতন তাঁর ওপর নয়, চলছে বন্দীর ওপর।

অহিংসা পরম ধর্ম নয় তাঁর, তবে স্বদেশী কারো ওপর নির্যাতনের নির্দেশ দিয়ে দারুণ মর্মপীড়ায় ভোগেন ভদ্রলোক। নির্যাতন এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন বন্দীকে, কিন্তু মুখ খুলতে রাজি হয়নি লোকটা। সকাল থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করার পর বর্থ হয়ে ইন্টারোগেশন টিমকে ডেকে পাঠান। দু'ঘণ্টা হলো দৈহিক নির্যাতন ভোগ করছে বন্দী, কিন্তু দুটো মাত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করেনি সে।

‘ট্রুশেনকো! দিমিত্রি ট্রুশেনকো!’ বারবার শুধু নামটা বলে চলেছে বন্দী।

‘দিমিত্রি ট্রুশেনকো,’ বললো লেফটেন্যান্ট নিকিতা কুরাডিন। বেসমেন্টে নয়, তিন তালার একটা অফিসে রয়েছে সে। ওয়াবিন্টকির বদলে হাতে এখন মোটাসোটা একটা বাদামি এনভেলোপ। ‘মানে বন্দীর আইডেনটিটি ডকুমেন্টে এই নামটাই রয়েছে,’ ডেস্কের ওধারে বসা আরেক দানবকে বললো সে। নিকোলাই ডালচিমস্কি দাঁড়ালে মনে হবে ছয় ফিট লম্বা, চৌকো একটা দরজা। ‘কিন্তু

আমাদের ধারণা, কাগজ-পত্র সবই ভুয়া। সেজন্যেই আমরা চাইছি আপনি সব চেক করে দেখুন একবার। কে. জি. বি. সেরা ডকুমেন্টস এক্সপার্ট বলতে আপনাকেই চেনে সবাই।’

এই সব জুনিয়র অফিসাররা ‘আমরা’ বলে কতৃপিক্ষের সাথে নিজেদের এক করে দেখাতে চায়, ব্যাপারটা হাস্যকর—কিন্তু নিকোলাই ডালচিমস্কি হাসলো না। হাত বাড়িয়ে এনভেলাপটা নেয়ার সময় এমন কি তার ঠোঁটের কোণ বা চোখের পাপড়ি পর্যন্ত এক চুল নড়লো না। তেইশ বছর কে. জি. বি.-তে চাকরি করছে, এ-ধরনের পরিস্থিতি তার জন্যে নতুন কিছু নয়। ‘প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট,’ সাবধানে বললো সে।

বিনয়ের অবতার সাজলো লেফটেন্যান্ট, ‘প্রশংসা আপনার প্রাপ্য, মেজর কমরেড। আপনি অর্জন করেছেন। আর এই ব্যাপারটায় আমরা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করছি। ইন্টারোগেশন শেষ হলে আমরা হয়তো সবটুকুই জানতে পারবো, কিন্তু শেষ হতে তিন কি চারদিন লাগবে। আমরা আশা করছি তার আগেই আপনি...,’ অকস্মাৎ প্রশংসা বদলে প্রশ্ন করলো লেফটেন্যান্ট, ‘জানেন, হারাম-জাদার ফ্ল্যাটে কি পাওয়া গেছে?’

‘ট্রান্সমিটার?’

‘শুধু ওটা হলে তো কথাই ছিলো না,’ গলা খাদে নামালো কুরা-ডিন। ‘মেশিন-পিস্তল, রাইফেল, গ্রেনেড, বাজুকা, ডিনামাইট—তথ্যটা কিন্তু গোপনীয়, মেজর কমরেড।’

‘কি বলেছো কিছুই আমি শুনতে পাইনি, লেফটেন্যান্ট।’

‘আপনি খুব ভালো মানুষ, কমরেড!’ আরেকবার বিনয়ের অবতার সাজলো লেফটেন্যান্ট।

এবার ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কি ঠোট টিপে একটু হাসলো। ভালোমানুষ ?

তিন তালায় কুরাডিনের পিছনে ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, বেসমেন্টে আরেকটা দরজা বন্ধ হলো কর্নেল বিকারেনের পিছনে। ইন্টারোগেশন রুমের বাইরে ইউনিফর্ম পরা গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, তার উদ্দেশ্যে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগোলেন তিনি, একটুর জন্যে জেনারেল লুদভিক কায়কোভস্কি-র সাথে ধাক্কা খেলেন না।

‘তুমি হাসছো না, আনাভোলি !’ কে. জি. বি. চীফ কৃত্রিম প্রতিবাদের সুরে বললেন। ‘ব্যাপারটার সাথে আজও তুমি অভ্যস্ত হতে পারলে না। এই একটা সময় তোমার মুখে হাসি থাকে না।’

‘আমি একজন সৈনিক ছিলাম, জেনারেল কমরেড,’ মৃদু কণ্ঠে বললেন কর্নেল। ‘কাউকে নির্যাতন করা—আমার পৌরুষে বাধে। জানি, এরও প্রয়োজন আছে। কেউ কথা বলতে না চাইলে আর কোনো উপায় থাকে না।’ কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। ‘সবই বুঝি, কিন্তু তবু মেনে নিতে কষ্ট হয়।’

‘আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, আনাভোলি। কেউ তোমার কাছে জবাবদিহিও চাইছে না।’ জেনারেল কায়কোভস্কি হাসছেন। ‘সিক্সটি-ফোরে আমিই তোমাকে এখানে এনেছিলাম, মনে আছে ? কে অস্বীকার করবে যে তার আগে তুমি একজন দক্ষ সৈনিক ছিলে ?’

‘এবং কে অস্বীকার করবে আপনিও সেরা কমিশার-দের একজন ছিলেন ?’ স্মরণ করলেন কর্নেল বিকারেন। ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রতিটি সোভিয়েত ব্যাটালিয়নে একজন করে পলিটি-

ক্যাল কমিশার থাকতো, নিজের ভূমিকায় প্রচুর সুনাম অর্জন করেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘তোমাকে মেডেল দেয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলাম, সেজন্যে বলছো না তো?’ করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করলেন জেনারেল। রুশ-চীন সীমান্তে এক সময় একসাথে লড়েছেন গুঁরা, ছোটোখাটো সংঘর্ষে বড় ধরনের বীরত্ব দেখিয়েছিলেন কর্নেল বিকারেন।

‘আপনি ভালো করেই জানেন মেডেলের প্রতি আমার মোহ নেই,’ বললেন বিকারেন। ‘তাহাড়া, আমার সৈনিক হওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত কারণটা ছিলো সর্বহারাদের জন্যে তৈরি করা আমাদের এই স্বর্গটাকে সাম্রাজ্যবাদী কসাইদের নিষ্ঠুর থাবা থেকে রক্ষা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সাথে যুদ্ধ করার সুযোগ আমি পাইনি...।’

‘একটু ভুল হলো,’ পুরুকেশ জেনারেল সকৌতুকে বললেন। ‘আমেরিকার সাথে আমরা নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় বসছি। দু’-একটা চুক্তি হয়ে গেছে, আরো হবার পথে। তারমানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা দিন দিন কমে আসছে। কিন্তু আরেক দিক থেকে বিচার করলে, যুদ্ধ শুধু শুরুই হয়নি; তুমি নিজেও সে-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছো।’ পরিবেশের মধ্যে নাটকীয়তা আনার জন্যে বিরতি নিলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

দৈর্ঘ্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অপেক্ষা করছেন কর্নেল, জেনারেল কায়কোভস্কির পাণ্ডিত্যের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা।

‘যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেছে, এটাতো তোমারই কথা, কর্নেল কমরেড,’ বললেন জেনারেল। ‘আমি, নেভি, বা এয়ারফোর্স নয়, এখন যুদ্ধ করছে স্পাইরা। কাজেই নিজেকে এখনো তুমি একজন সৈনিক

হিসেবে ভাবতে পারো, কারণ তুমি একজন স্পাই—আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো।’ পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করলেন তিনি, ধরাবার জন্যে করিডরে থামলেন। ‘ভালো কথা, ইটারোগেশন এগোচ্ছে কেমন?’

বিকারেন কাঁধ ঝাঁকালেন। ‘সত্যিকার ফ্যানাটিক লোকটা। সমস্ত টরচার নীরবে সহ্য করছে, নাম ছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি। ওটাও আসল বলে মনে হয় না। ওর কাগজ-পত্র সব আমি চেক করতে পাঠিয়েছি।’ জেনারেল হাত বাড়িয়ে দিতে মাথা নাড়লেন তিনি। ‘ধন্যবাদ, জেনারেল কমরেড—আপনার চুরুটের গন্ধ আমার সহ্য হয় না।’

‘রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট, ভারি রোমান্টিক নাম—কিউবান, অবশ্যই। ভাবছি এখন থেকে এটাই খাবো।’

বিকারেন চুপ করে থাকলেন। তিনি ধূমপায়ী, এবং চুরুটই খান; স্বীকারও করেন যে কিউবার কোনো কোনো চুরুট সত্যি ভালো, কিন্তু স্বদেশে তৈরি চুরুটের প্রতি তাঁর দুর্বলতা রয়েছে। লিখিত রিপোর্ট এখনো তৈরি করা হয়নি, সকালের ঘটনাটা তাই এই সুযোগে জেনারেলকে জানিয়ে দিলেন তিনি। সুইসাইড ক্যাপসুল প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সবশেষে বললেন, ‘অসম্ভব একজন কবি বা ভিন্ন মতাবলম্বী কোনো দার্শনিক বা বিজ্ঞানী নয়—তা যদি হতো, মুখের ভেতর সুইসাইড ক্যাপসুল থাকতো না। আমার বিশ্বাস, লোকটা বড় ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। হয়তো আমাদের নিজেদেরও কিছু লোককে তালিকায় পাওয়া যাবে। বোধহয় একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়া...।’

‘কেঁচো খুঁড়তে সাপ?’



‘শ্রেফ কাকতালীয় ব্যাপার। নেহাতই ভাগ্য। পুলিশের ধারণা হয়েছিল, পাশের বিল্ডিং কোনো লোক ব্ল্যাকমার্কেট অপারেশনের সাথে জড়িত। একজন টেকনিশিয়ানকে পাঠায় ওরা, টেলিফোনের ভারে আড়িপাতা যন্ত্র লাগাবে। লাগালো ঠিকই, কিন্তু অন্য এক নম্বরে।’ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ওঁরা। ‘প্রথম এক হপ্তা কিছুই ঘটলো না। তারপর একদিন পরপর ছ’বার মজার মজার কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। ছ’বারই “দাগী আসামী” নামটা উচ্চারণ করা হয়।’

যেন পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে স্থির হয়ে গেলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ‘কি বলছো তুমি! মার্শাল লিউ ওনায়েভকে দাগী আসামী বলার মতো লোক খুব বেশি নেই। শুধু রেড আর্মি স্টাফ অফিসারদের কেউ কেউ বলে থাকে...।’

‘ব্যাপারটার সাথে রেড আর্মি স্টাফরাও জড়িত থাকতে পারে। যতো দূর জানি, জেনারেল স্টাফে স্ট্যালিন পন্থী একমাত্র ওনায়েভই রয়ে গেছেন এখনো। তবে আরো অনেকে থাকতে পারে, আমরা চিনি না। আশা করছি আমরা একটা তালিকা পাবো বন্দীর কাছ থেকে।’

চেহারায অবিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘কমরেড জেনারেল, তাহলে আপনিই বলুন, ছাব্বিশ হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিশন, আঠারো বাক্স গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ, তিন জোড়া বাজুকা, আঠারোটা অটোমেটিক রাইফেল, নয়টা লেটেস্ট মডেল রেড আর্মি স্নাইপার রাইফেল নাইট স্কোপ সহ—কি কারণে একজন লোক তার ঘরে লুকিয়ে রাখতে পারে? আর্মেনিয়ান ফোক ফেস্টিভালের দিন আতসবাজি অনুষ্ঠানের জন্যে? নাকি বিয়ের দিন

ফুটি করার জন্যে ?’

এবার ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল। ‘এ-সবের সাথে যদি মিউজিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া না গিয়ে থাকে...।’

‘যায়নি।’

ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছলেন ওঁরা, করিডর ধরে কর্নেল বিকারেনের অফিসের দিকে এগোলেন। কথায় এমন মশগুল হয়ে আছেন ছ’-জন, পিছনে লেফটেন্যান্ট কুরাডিনের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন না।

‘তাহলে তো দিমিত্রি ট্রুশেনকোর ছাল-চামড়া তুলে হলেও সব কথা বের করে আনতে হবে,’ জেনারেল কায়কোভস্কি প্রতিজ্ঞার সুরে বললেন। ‘তুল হলো, আসলে বলতে চেয়েছি—হাড় গুঁড়ো করে হলেও।’

‘হ্যাঁ, তাই,’ অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সাথে বললেন কর্নেল।

‘তুমি আমাকে বেস্টমানদের তালিকা দাও, আমি ওদের ধ্বংস করি,’ প্রস্তাব রাখলেন জেনারেল। ‘নাম, পরিচয়, ঠিকানা, অস্তিত্ব, ছায়া, প্রভাব—সব নিশ্চিহ্ন করে দেবো। কেউ জানবে না ওরা ছিলো।’

‘সবচেয়ে আগে দরকার বন্দীর আসল পরিচয়...।’

‘বন্দীর আসল পরিচয় সবচেয়ে আগে দরকার, কর্নেল বলেছেন,’ কথাটা পুনরাবৃত্তি করলো লেফটেন্যান্ট কুরাডিন, রাত ছটোর সময়। ল্যাবরেটরীতে ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কির সাথে আরো একজন রয়েছে—একটা মেয়ে। সন্ধ্যায় যে মেয়েটিকে দেখে ছিলো কুরাডিন, এটা তার চেয়েও সুন্দরী। ল্যাবরেটরীতে ডাল-

চিমস্কির সহকারিণীরা সবাই পাৰ্ট টাইম ডিউটি করে। কাউকেই একটানা বেশিদিন রাখে না ডালচিমস্কি, কোনো না কোনো অজু-হাতে হয় তারা নিজেরাই অন্য কোথাও চলে যায়, নয়তো ডালচিমস্কি তাদের বিদায় করে দেয়। ডালচিমস্কির বিরুদ্ধে মেয়ে সংক্রান্ত অনেক গুজব থাকলেও আজ পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। হয়তো যাদের অভিযোগ করার কারণ আছে তারা ডালচিমস্কির প্রভাবকে খাটো করে দেখতে সাহস পায় না। কিংবা তাদের নিজেদেরই এমন সব দুর্বলতা আছে যে সেগুলো ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে চুপ করে থাকাই ভালো মনে করে। কোনো কোনো মেয়েকে নাকি হাসপাতালেও যেতে হয়েছে।

‘ওকে আর দিমিত্রি ট্রুশেনকো নামে ডাকার দরকার নেই,’ বললো ডালচিমস্কি। ‘কাগজ-পত্র সবই জাল। খুবই উঁচুদরের কাজ। সি. আই. এ. বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও এতো নিখুঁত জাল ডকুমেন্টস তৈরি করতে পারবে না। কালি, কাগজ, সীল—সব প্রায় নিখুঁত। এই মুহূর্তে এইটুকুই আপনাকে আমি বলতে পারছি।’

নিষ্ঠুর চণ্ডালের মতো হিংস্র হয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের চেহারা। ‘ওকে আমরা ছিঁড়ে ফেলবো না! নেইল কাটার দিয়ে নখ কাটা হয়, আমরা সেটা দিয়ে ওর মাংস তুলবো—একটু একটু করে। আরো একদিন, বড় জোর দু’দিন—পাখির মতো কিচির-মিচির শুরু করবে বাছাধন!’

ডালচিমস্কি ঘাড় ফিরিয়ে দূরে বসা সহকারিণীর দিকে তাকালো। ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটা। কিন্তু ডালচিমস্কি তাকাতেই ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিলো সে। ঠাণ্ডা স্বাপদের দৃষ্টি ডাল-

চিমস্কির চোখে । নিলিপ্ত চেহারা ।

কিন্তু দু'দিন নয়, বন্দীকে কথা বলাতে একানন্দই ঘণ্টা কয়েক মিনিট লেগে গেল । তবে মুখ খোলার পর গড় গড় করে সবই বলে ফেললো সে, কিছুই লুকালো না । কর্নেল বিকারেন যেমন সন্দেহ করেছিলেন, স্ট্যালিন পন্থীদের বড়সড় একটা সুশৃংখল দল ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করেছিল । চারশোরও বেশি সরকারী এবং সশস্ত্র-বাহিনীর লোক জড়িত । তাদের মধ্যে আবার অর্ধেকের কিছু কম কে. জি. বি.-র লোক—কেউ কেউ এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইন-মেন্ট নিয়ে বিদেশে রয়েছে । কিন্তু বন্দী লোকটা সবার নাম জানে না । মাত্র তেরো জনের ।

তাদের একজন একটা মেয়ে, লেনিনগ্রাদে পোস্টিং, অ্যাডমিরাল ইন কমান্ডের সেক্রেটারী ।

আরেকজন কর্নেল, ওডেসার কাছে এটকা কমান্ডো ইউনিটের ইনচার্জ ।

আরেকজন মার্শাল ওনায়েভ ।

চতুর্থজন কে. জি. বি.-র চীফ ডকুমেন্টস এক্সপার্ট, দানবাকৃতি নিকোলাই ডালচিমস্কি । তেরো জনের একজন বাদে সবাইকে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হলো, তাদের মধ্যে শুধু নিকোলাই ডালচিমস্কি নেই । কিভাবে যেন পালিয়ে গেছে সে, পিছনে কোনো সূত্র রেখে যায়নি । পুলিশ, আর সমগ্র সোভিয়েত সীমান্তে প্রহরারত ফ্রন্টিয়ার কন্ট্রোল ইউনিটকে সতর্ক করে দেয়া হলো । ডালচিমস্কির সন্ধানে চেষ্টা ফেলা হলো গোটা দেশ ।

কিন্তু সে নেই ।

‘দিমিত্রি ট্রুশেনকো’ মচকাবার পর গোটা সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে টানা একমাস ব্যাপক ধর-পাকড় চললো। ষড়যন্ত্রকারীদের কিভাবে ধরা যায় তার একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন কর্নেল বিকারেন, প্ল্যান অনুসারে অপারেশন চালিয়ে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সফল হলেন তিনি। শুধু দেশের মাটিতেই গ্রেফতার করা হলো তিনশো বিয়াল্লিশজনকে। নয় জন ধরা দিলো না, আত্মহত্যা করে হাত ফস্কে গেল। বিদেশের মাটি থেকে আটক করে দেশে পাঠানো হলো আঠারো জনকে, বাষট্টি জন নিখোঁজ থাকলো। এতো বড় সাফল্য সত্ত্বেও কে. জি. বি. কর্মকর্তারা খুশি হতে পারলেন না। খুশি অবশ্য না হবারই কথা তাঁদের। মুখে না বললেও, মনে মনে তাঁরা সবাই জানেন, কে. জি. বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

ধর-পাকড়ের বেশিরভাগ অপারেশনে অফিসারদের সাথে নিজে অংশগ্রহণ করলেন কর্নেল বিকারেন। রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটোছুটি করে বেড়ালেন প্রায় পুরোটা মাস। ভ্লাডিভোস্টক-এর এয়ারফোর্স হেডকোয়ার্টার থেকে গেলেন রিগার বালটিক টেলিকমিউনিকেশন সেন্টারে। রুশ-ইরান সীমান্ত থেকে একটা প্লেন চালিয়ে চলে এলেন রুশ-চীন সীমান্তে। ছ’চার দিন পর পর মস্কোতেও ফিরে আসতে হলো তাঁকে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেনাবাহিনীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে আটক করা হলো, ক্রোপুতকিন স্ট্রীটের বেসমেন্টে নিয়ে যাবার পর এদের বেশ কয়েক জনের কাছ থেকে ‘মূল্যবান তথ্য বেরিয়ে এলো। শতাধিক সিনিয়র সরকারী অফিসার, প্রিমিয়ার এবং জেনারেল সেক্রেটারী, সেই সাথে নয় জন পলিটব্যুরো সদস্যকে খুন করার প্ল্যান করেছিল তারা। তাদের মধ্যে দু’জন প্রথমবার মুখ খুলে আভাস



দিলো যে কে. জি. বি.-র আরো প্রায় দেড়শো অফিসার এবং এজেন্ট এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। কিন্তু দ্বিতীয়বার মুখ খোলার আগেই অকস্মাৎ মারা গেল তারা। সন্দেহ করা হলো, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়।

বিশেষ একটা তদন্ত টিম গঠন করা হলো। কিন্তু তাদের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হলো না। বলা হলো, মাত্রাতিরিক্ত আতংকের কারণে হার্টফেল করে মারা গেছে তারা। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কঠিন হৃদয় পাষণ ছিলো তারা, ভয় বা আতংক কাকে বলে জানতো না।

কর্মকর্তাদের মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব থেকেই গেল। তাঁরা জানলেন, কে. জি. বি.-র ভেতর, তাঁদের আশপাশেই, ষড়যন্ত্রকারীরা রয়েছে। কিন্তু সবাই নাগালের বাইরে।

প্রকাশ্যে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তোলা হলো না। গোটা ব্যাপারটা একা সামলালেন কর্নেল বিকারেন। এবারও চমৎকার একটা পরিকল্পনা তৈরি করলেন তিনি। রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোপন বৈঠক বসলো, অংশ নিলেন মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চীফ, কে. জি. বি. চীফ, রেড আর্মি স্টাফ চীফ, পলিটব্যুরোর প্রথম সারির কয়েকজন সদস্য, সেনাবাহিনী, নেভি ও এয়ারফোর্স চীফ, এবং প্রিমিয়ার ও জেনারেল সেক্রেটারীর সামরিক উপদেষ্টারা। অভিযুক্তদের প্রত্যেককে কথা বলার সুযোগ দেয়া হলো। সবাই নিজেদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

বলাই বাহুল্য, একজনকেও ক্ষমা করা হলো না।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো নিপুণ কৌশলে। এখানেই বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, এবং দক্ষতার পরিচয় দিলেন কর্নেল বিকারেন। অফি-

শিয়াল গেজেটে প্রকাশ না পেলোও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাবে ভূষিত করা হলো তাঁকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি তাঁর ডেপুটিকে বললেন, ‘ভাগ্যিস এ-ধরনের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল ! আমার পদটা পেতে তোমার সামনে আর কোনো বাধা থাকলো না।’

কিন্তু সদাহাস্যময় কর্নেলের চেহারা থেকে হাসি যেন চির বিদায় নিয়েছে। বিষন্ন চোখ তুলে তিনি শুধু বললেন, ‘আমি যে কতোখানি ব্যর্থ, আপনার চেয়ে ভালো কেউ তা জানে না, জেনারেল কমরেড। আপনি তো অবসর নিয়ে বেঁচে যাবেন, কিন্তু আমি ? কাকে বিশ্বাস করবো ? কার ওপর ভরসা রাখবো ? কি করে জানবো কে বেঈমান নয় ?’

ডেপুটিকে আলিঙ্গন করে জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন, ‘অবসর নেয়ার আগে যতোটুকু পারি তোমাকে সাহায্য করবো আমি, আনাতোলি। হ্যাঁ, কে. জি. বি.-কে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের।’

মার্শাল ওনায়েভ সহ ষড়যন্ত্রকারীদের আরো এগারোজন সিনিয়র সদস্য নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট বিস্ফোরণে কৃষ্ণ সাগরে মারা গেলেন। বাকিরা কেউ মারা গেল সড়ক দুর্ঘটনায় বা অগ্নিকাণ্ডে, কেউ হার্ট অ্যাটাকে। সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেল ট্রেন দুর্ঘটনায়, দেড়শোর মতো। দুর্ঘটনাগুলো রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘটলো, প্রচুর সময়ের ব্যবধানে, এবং সবগুলো খবর সংবাদপত্রে প্রকাশও পেলো না।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায়, ল্যাংলিতে একটা আলোড়ন উঠলো। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের অদূরে এই ল্যাংলি-

তেই সূদৃশ্য বনভূমি ঘেরা বিশাল ভবনটা সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার। ভবনটাকে পাহারা দেয় অতি সূক্ষ্ম এবং ব্যয়বহুল ইলেকট্রনিক আর সোনিক হার্ডওয়্যার, ডগ প্যাট্রল, এমন কি ট্রেনিং পাওয়া অ্যালিগেটর, উডচাক টিম, আর কিলার হামিংবার্ড। ল্যাংলিতে এমন অনেক কমপিউটার আছে, যেগুলোর নামও ক্লাসিফায়েড—টপ সিক্রেট, প্রকাশযোগ্য নয়। কোনো কোনো কমপিউটার বসাতে খরচ পড়েছে বত্রিশ কোটি মার্কিন ডলার। আর আছে সি. আই. এ.-র বেতনভুক অ্যানালিস্ট—কারো কারো বেতন প্রেসিডেন্টের চেয়ে ছয় গুণ বেশি। তাদের মধ্যে একজন হলো স্বর্ণকেশী এক ভদ্রমহিলা, উনিশশো ছেষটি সালে শাটলান্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমপিউটার সায়েন্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করে। তার নাম চ্যারিটি উডস্টক, পাঁচ ফিট লম্বা, একহারা, সারা মুখে খয়েরি তিল। তেমন লম্বা নয় বলে কেউ কেউ মাঝে মধ্যে তাকে নিয়ে কৌতুক করে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধি বা মাথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে এমন লোক একজনও পাওয়া যাবে না।

এই প্রতিভাময়ী অ্যানালিস্ট চ্যারিটি উডস্টক কমপিউটার প্রিন্ট-আউট পরীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলো, গতমাসে সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারী এবং সেনাবাহিনীর লোকজন অস্বাভাবিক হারে মারা গেছে। তার মনে হলো, মৃত্যুর কারণ দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানো হলেও, তা হয়তো সত্যি নয়। সম্ভবত বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটে গেছে ওখানে। গত ছত্রিশ মাসের মৃত্যু হার যোগাড় করে গতমাসের মৃত্যুর হারের সাথে মেলালো সে, তারপর পিন দিয়ে গেঁথে কাগজগুলো সেকশন চীফের কাছে পাঠিয়ে দিলো।

কর্নেল জিল ক্যাসেল সন্তুষ্ট হলো, কিন্তু বিস্মিত হনো না। রূপ-

বতী চ্যারিটি উডস্টকের বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর পঞ্চাশোধ কর্নেলের নির্ভে-  
জাল শ্রদ্ধা আছে, শুধু যদি কর্নেল তার লোলুপ দৃষ্টি একটু সংযত  
করতে পারতো তাহলে হয়তো ভালোই বনিবনা হতো দু'জনের।  
সুসম্পর্কের অন্তরায় হয়ে আছে ওই একটা মাত্র জিনিস—কুদৃষ্টি।  
সুযোগ পেলেই আড়চোখে চ্যারিটি উডস্টকের বুকের ওপর দৃষ্টি  
বুলিয়ে নেবে কর্নেল। মেয়েটা সবই লক্ষ্য করে, এবং ব্যাপারটা  
একাধারে অপরিণত ও মর্যাদা হানিকর লাগে তার কাছে।

‘ভালো, খুব ভালো,’ কাগজগুলো ডেস্কে নামিয়ে রেখে বললো  
কর্নেল, আরেকবার চোখ বুলিয়ে আদর করলো মেয়েটাকে।

‘আপনি তাহলে রিপোর্টটা সোভকম-এ পাঠাবেন, মিঃ ক্যা-  
সেল?’ কর্নেলের দৃষ্টি লক্ষ্য করে মনে মনে রেগে যায় চ্যারিটি  
উডস্টক, তারপর সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করে  
যে বেচারী মধ্য-বয়স্ক লোকটা আসলে বড় বড় সোশিও-কালচারাল  
সমস্যার ছোট্ট একটা নমুনা মাত্র।

‘আইডিয়াটা মন্দ নয়, সিরিয়াসলি ভেবে দেখবো আমি,’ বললো  
কর্নেল। সিদ্ধান্তে পৌঁছুলো, বাঁ দিকেরটা একটু বোধহয় বড়।

কর্নেল ক্যাসল, স্বভাব দোষ তার যাই থাক, ঘিলুর কোনো  
ঘাটতি নেই মাথায়, প্রথম সুযোগেই সোভকম-এ—সি. আই. এ.-র  
সোভিয়েত অ্যাফেয়ার্স কমিটি—পেশ করলো কাগজগুলো। কমিটি  
প্রতি সোমবার বিকেলে মিটিঙে বসে। সোভকম সাথে সাথে সদ্য  
পাওয়া তথ্যের সাথে সর্বশেষ প্রাপ্ত স্মলেনস্ক মিসাইল কমপ্লেক্সের  
স্যাটেলাইট ফটো মিলিয়ে দেখলো, এবং উদ্বেগের সাথে উপসং-  
হারে পৌঁছুলো যে বিপর্যয় নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কমিটি  
পরামর্শ দিলো, সোভিয়েত রাশিয়ার কাছাকাছি যে-সব মার্কিন

ইন্টেলিজেন্স নেট ওঅর্ক রয়েছে তারা জোর তদন্ত চালিয়ে দেখবে বিপর্যয়ের প্রকৃতিটা কি ।

ফলাফল শূন্য । কাগজের বৃকে কিছু আইডিয়া আর থিওরি আত্ম-প্রকাশ করলো মাত্র, নিরেট কিছুই জানা গেল না । তাই বলে সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে কেউ হতাশ হলো না, আর চ্যারিটি উডস্টক তো কোনো কিছুতেই হতাশ হবার পাত্রী নয় ।

মস্কোয় কর্নেল বিকারেন আগেই হাসতে ভুলে গেছেন, এবার জেনারেল কায়কোভস্কির দুর্লভ হাসিও উধাও হলো – কারণ ব্রাসেলস-এ নতুন আরেকটা সিকিউরিটি সমস্যায় পড়ে গেছে কে. জি. বি. । ওখানে একটা ব্যাংক আছে, আর সব ব্যাংকের মতোই স্বাভাবিক টাকা-পয়সা লেনদেন করে । কিন্তু আসলে ওটা কে. জি. বি.-র একটা ফ্রন্ট । কে. জি. বি. এজেন্ট যারা পশ্চিম ইউরোপে কাজ করছে, এবং যারা ন্যাটো হেডকোয়ার্টারের ওপর নজর রাখছে তাদেরকে ফাও যোগান দেয় এই ব্যাংক । কে বা কারা ব্যাংকের ভেতর কিভাবে যেন রাতের বেলা ঢুকে পড়ে, দু'জন গার্ডকে গুলি করে মারে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো করে দেয়, তারপর ডাকাতি করে নিয়ে যায় তিন লাখ বিরানব্বই হাজার মার্কিন ডলার । আরো বড় অংকের ফ্রাঙ্ক, মার্ক, পাউণ্ড ছিলো, কিন্তু সে-সবে হাত দেয়া হয়নি ।

কেন ?

এ কোন্ ধরনের চোর বা ডাকাত যে নগদ ছয় লাখ পাউণ্ড, চার লাখ মার্ক, আর বারো লাখ ফ্রাঙ্ক হাতে পেয়েও নিলো না ?

রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটে জোরে টান দিয়ে জিত প্রায় পুড়িয়ে ফেললেন জেনারেল কায়কোভস্কি, মাথা ঠাণ্ডা করে সিদ্ধান্তে

পৌছিলেন : হয় কে. জি. বি. বেলজিয়াম সেকশনে বিদেশী চর অনুপ্রবেশ করেছে, নয় তো সোভিয়েত এজেন্টদেরই কেউ টাকার লোভে মানুষ খুন করে বসেছে। খুনী যদি বিদেশী এজেন্ট হয়, নিশ্চয়ই সে আমেরিকান। আর সে যদি রাশিয়ান হয়, নিশ্চয়ই আমেরিকায় পালাবে।

এই নতুন ছঃসংবাদ অবশ্য কর্নেল বিকারেনকে স্পর্শ করলো না। কারণ ছুটি নিয়ে কৃষ্ণ সাগর বেড়াতে গেছেন তিনি, পয়লা জুনের আগে ফিরবেন না।

ওই পয়লা জুনেই উন্মাদ হয়ে গেল এলিস থেলার।

পরদিন দৈনিক ডেলভার পোস্ট-এর রিপোর্টে বলা হলো, সময়টা ছিলো কাঁটায় কাঁটায় ছুটো পঁচিশ মিনিট। তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সুস্থ দেখা গেছে এলিস থেলারকে। থেলার অটো রিপেয়ার কোম্পানীর একজন মেকানিক জানালো, শুধু সুস্থ আর স্বাভাবিক নয়, ফোন কলটা আ. র আগে পর্যন্ত মালিককে রীতিমতো হাসি-খুশি আর উৎফুল্ল দেখেছে তারা। আগামী মাসে লস অ্যাঞ্জে-লস রেসিং কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এলিস থেলার, এবং মেকানিকদের আবদারে সাড়া দিয়ে রাতে সবাইকে ডিনার খাওয়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। ঠিক তারপরই, ছুটো পঁচিশ মিনিটে, ফোন কলটা আসে। রিসিভার নামিয়ে রাখার পর তাকে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল—কি রকম যেন একটা ঘোরে রয়েছে। কারো সাথে কথা বলেনি। কারো দিকে ভুলেও তাকায়নি। নীল একটা ডজ প্যানেল-ট্রাক ছিলো। তালা দেয়া ছোট্ট গ্যারেজে, সেটা নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। এই ট্রাকটা অনেক দিন থেকে ছিলো

গ্যারেজে, কাউকে ছুঁতে দিতো না খেলার, চাবিটা সব সময় নিজের কাছে রাখতো ।

শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ইউ. এস. আমি কেমিক্যাল বেস । সরাসরি সেখানে চলে যায় খেলার । গেটে তাকে বাধা দেয়া হয়, সেটি তাকে পাস দেখাতে বলে । শান্তিপ্রিয়, সবার প্রিয়পাত্র এলিস খেলার পকেট থেকে পাস নয়, সেভেন-মিলিমিটার পিস্তল বের করে সরাসরি সেটির মাথায় গুলি করে । কয়েক সেকেন্ড পর আরো দু'জন গার্ডের মাথা পাকা আততায়ীর মতো নিপুণ লক্ষ্যভেদে ফুটো করে দেয় সে । এরপর খেলার সোজা রাস্তা ধরে দেড় মাইল ট্রাক চালিয়ে চলে আসে বিল্ডিং এম পর্যন্ত । চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামে সে । গাড়িটা সবেগে গিয়ে ধাক্কা খায় জানালাবিহীন ওয়্যারহাউসে ।

তারপর যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় তা থেকে আন্দাজ করা চলে, ট্রাকটায় হাই এক্সপ্লোসিভ ঠাসা ছিলো । আরো ছিলো ট্যাংক ভর্তি নাপাম, বিস্ফোরণের পরপরই লকলকে আগুনের শিখা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । আগুন আর কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ কয়েক মাইল দূর থেকে দেখতে পায় মানুষ । কিন্তু এলিস খেলারকে কোথাও দেখা গেল না ।

তাকে দেখা গেল টেলিভিশনে, সন্ধ্যার খবর পড়ার সময় । দর্শকরা তার লাশ দেখলো । অগ্নিদগ্ধ, বিধ্বস্ত ভবনটার মতোই চেহারা হয়েছে তার । বিস্ফোরণ ঘটবার পর তাকে পালাতে দেখে মিলিটারী পুলিশ একেবারে শেষ মুহূর্তে অটোমেটিক রাইফেল দিয়ে গুলি করে । ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে দেহটা ।

ভাবতে গেলে অনেক দিক থেকেই ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক । গণ-শাসিত

তত্ত্বের দেশে অপরাধীকে আত্মশুদ্ধি সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়, তার সাংবিধানিক অধিকারের কথা তাকে মনে করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মিলিটারী পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলায় এলিস খেলার তার উকিলকে ফোন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।

তাছাড়া, কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেলো না। ছোটোবেলায় হয়তো খুব অশান্তিময় জীবন কাটিয়েছে এলিস খেলার, ছেলেবেলার অতৃপ্তি বা ক্ষোভ এতো দিন হয়তো জমা ছিলো তার মনের ভেতর, আজ হঠাৎ করে বিস্ফোরণের সাথে বেরিয়ে এসেছিল সব। এই আকস্মিক উন্মত্ততার কোনো কারণ না থেকে পারে না, তাকে সামনে পেলে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হয়তো কারণটা আবিষ্কার করতে পারতো।

এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে অনেক লোকই বিবৃতি দিলো, প্রেস রিলিজ প্রকাশ করলো কেমিক্যাল করপোরেশন। বেশিরভাগ প্রেস রিলিজ যেমন হয়ে থাকে, এটাও সেরকম হলো, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এম বিল্ডিং যে জার্ম ওয়রফেয়ারের কাজে ব্যবহার যোগ্য অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট আর মেশিনারিজ ছিলো, প্রেস রিলিজে বেম'লুম চেপে যাওয়া হলো সেটা। এম বিল্ডিং মাত্র তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টের ডিপো ছিলো, সে প্রসঙ্গেও একটা টুঁ-শব্দ হলো না। কেমিক্যাল করপোরেশনের প্রেস রিলিজ, লোকাল পুলিশের বিবৃতি, আর দমকল বাহিনী প্রধানের মন্তব্য, এই তিনটেকে ভিত্তি করে একটা রিপোর্ট তৈরি হলো, সেটাই ছাপা হলো গোটা দেশের পত্র-পত্রিকায়। নিউ ইয়র্ক টাইমস আর ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম পাতায় ছাপলো খবরটা। এই কাগজ দুটো থেকেই খবরটা কেটে মাইক্রোফিল্ম তৈরি করলেন রুশ দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাশে,



অন্যান্য আরো জিনিসের সাথে সেটা ঢুকিয়ে দিলেন ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে । মস্কোয় পৌঁছে যাবে ওটা ।

## তিন

মাইক্রোফিল্মটা মস্কোয় পৌঁছুবার পরদিন আলবামার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিরুদ্ধে অষ্টাদশী এক কুফ্লাস মেয়ে, মেরিন বায়োলজির ছাত্রী, কোর্টে অভিযোগ তুললো, গভর্নর রেপ করায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে । দক্ষিণ আমেরিকায় বড় ধরনের বিমান দুর্ঘটনায় শতাধিক লোক মারা যাওয়ায় শোকে কাতর হলো পত্রিকা পাঠকরা । হপ্তা শেষ হবার আগে প্যারিস সাবওয়ে, আর রোম বাস ড্রাইভার এসোসিয়েশন ধর্মঘটে গেল, ব্রিটিশ ডক শ্রমিকরা শুরু করলো অনি-দিষ্টকালের জন্যে কর্মবিরতি । খবর পাওয়া গেল হিটলারের ঘনিষ্ঠ একজন সহচর মেক্সিকোর এক রেস্টারায় সিগারেট-গার্ল হিসেবে আত্মগোপন করে আছে । মার্কিন নারকোটিক কন্ট্রোল এজেন্সি একটা জাহাজ থেকে উদ্ধার করলো দুশো তেইশ পাউণ্ড হেরোইন । সারা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে গেল, কারণ রুশ ব্যালেরিনা ভোলিন স্বপক্ষ ত্যাগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা

করেছে। এই সব নাটকীয় এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবরের তলায় চাপা পড়ে গেল ডেনভারের ঘটনাটা, সাংবাদিকরা নানা দিকে এতো বেশি ব্যস্ত থাকলো যে কেমিক্যাল করপোরেশনের বিস্ফোরণ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই তারা পেলো না। ব্যাপারটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করলো অন্তত সাতানব্বই জন লোক, কারণ এতে করে তাদের পক্ষে নিবিঘ্নে তদন্ত চালানো সম্ভব হবে। এরা সবাই হয় বন গিলবার্ট, নয়তো স্টুয়ার্ট কুপারের লোকজন।

মেজর জেনারেল বন গিলবার্ট ইউ. এস. আমি কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স-এর কমান্ডার। আর মিঃ স্টুয়ার্ট কুপার এফ. বি. আই.-এর নতুন ডিরেক্টর। দুই ভদ্রলোকই যার যার পেশায় দক্ষ এবং নিবেদিতপ্রাণ, এলিস খেলার সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব জানার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় বলা হয়েছে, এলিস খেলার হয় উন্মাদ ছিলো, নয়তো গোপনে কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলো—কিন্তু ওঁরা দু'জন কেউ তা বিশ্বাস করলেন না।

বন গিলবার্ট বললেন, ‘সারা জীবন স্বাভাবিক থাকলো একজন লোক, হঠাৎ একদিন পাগল হয়ে গিয়ে দেশের একটা নার্ভ-পয়েন্টে আঘাত করলো—এ হতে পারে না। আর, লোকটা অন্তর্ঘাতক ছিলো তার প্রমাণ কই?’ গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁর সাথে একমত হলেন চীফ অভ স্টাফ।

স্টুয়ার্ট কুপার কম কথার মানুষ, তিনি শুধু বললেন, ‘গোটা ব্যাপারটা রহস্যময় এবং সন্দেহজনক।’ আর কে না জানে যে রহস্য থাকলে এফ. বি. আই. সেটা ভেদ করার দায়িত্ব নেবে। সন্দেহ নেই, এফ. বি. আই.-এর সে যোগ্যতা আছেও।

নিউজ মিডিয়াগুলো যখন আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর নিয়ে ব্যস্ত, এই দুই ফেডারেল এজেন্সি তখন এলিস খেলারের ব্যাপারে ব্যাপক ইনভেস্টিগেশন শুরু করলো। ফাণ্ড এবং লোকবল, কোনোটারই তাদের অভাব নেই।

রুটিন চেক নয়, ফুল ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন শুরু হলো। রাত দুপুরে কয়েক শো লোকের দরজায় টোকা পড়লো। সাবজেক্টের প্রাক্তন স্কুল মাস্টারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, প্রতিবেশীদের সাথে বৈঠক হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মেথর আর মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের জেরা করা হলো। এদের বেশিরভাগই বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, এলিস খেলারের মতো মানুষ কি করে ফেডারেল এজেন্সির সাবজেক্ট হতে পারে! ছায়াছবি বা টিভি নাটক দেখে তাদের ধারণা হয়েছে— নীচ, ধনী, রুচিহীন, ম্যানিয়াক লোকেরাই সাবজেক্ট হয়। এলিস খেলার তো তাদের কারো মতো ছিলো না! নিয়মিত চার্চে যেতো সে, রেজিস্টারড রিপাবলিকান ছিলো, বড় যে-কোনো ধরনের চ্যারিটি ফাণ্ডে দান করতো। কেউ বললো না যে তার কোনো শত্রু ছিলো। শিশুদের ভালোবাসতো খেলার, প্রতি রোববারে বুড়ো-বুড়িদের ক্লাবে বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার পাঠাতো। লালচুলো এক মেয়ে জানালো, এলিস খেলার ক্রিস্টমাস ডে বা তার জন্মদিনে উপহার পাঠাতে ভুল করতো না কখনো, আর ফি হপ্তায় একবার আসা চাই-ই। মেয়েটার চোখে ভালোবাসার যে আলো দেখা গেল, প্রতি হপ্তায় তার সাথে দেখা করার পিছনে সেটার ভূমিকা কম নয়।

এতো বছর ধরে কলোরাডোয় ছিলো খেলার, গাড়ি চালাবার সময় কখনো অ্যাক্সিডেন্ট করেনি বা ট্রাফিক আইন লংঘন করে টিকিট পায়নি। লোকাল এবং ফেডারেল, দু'তরফের ট্যাক্সই সময়

হলে পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে গেছে। মদ খেতো, কিন্তু পরিমাণে খুবই সামান্য। প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবরা কেউ তাকে মাতাল হতে দেখেনি কখনো। ঘুম থেকে উঠে প্রতিদিন বাইবেল পড়তো সে। শনিবার ওয়েস্টার্ন গান ক্লাবে যেতো, রাইফেল আর হ্যাণ্ড-গানে হাতের টিপ ঠিক রাখার জন্যে প্র্যাকটিস করতো।

চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী কোনো গ্রুপের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো, বলে জানা যায় না। নেশাখোর, যৌন-অপরাধী, ফোক ড্যান্সিং সোসাইটি, জুয়াড়ি, ঠকবাজ, প্রতারক, সাইকো-অ্যানালিস্ট, কবি, ব্ল্যাক-ম্যাজিশিয়ান, কিংবা অসামাজিক কোনো লোকের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিলো না। কোনো লাইব্রেরীর সদস্য ছিলো না সে, বিদেশী ছায়াছবি একেবারেই দেখতো না। একজন ইনভেস্টিগেটর তার নোটবুকে লিখলো, ‘এ-ধরনের নিষ্কলুষ একজন মানুষ, রাজ্যের আইন সভায় কেন যে নির্বাচিত হয়নি সেটাই আশ্চর্য!’ আসলে এলিস খেলার ভালো বক্তৃতা দিতে পারতো না, আর তাছাড়া চেহারাটা তার ঠিক সুদর্শন ছিলো না।

ছ’মুখো তদন্ত চলতে থাকলো। আমি তার সাভিস রেকর্ড ঘাঁটতে শুরু করলো, আর এফ. বি. আই. তার আর্থিক অবস্থার গভীরে কিছু লুকিয়ে আছে কিনা খোঁজ নিতে লাগলো। এফ. বি. আই. জানতে পারলো, খেলারের ট্যাক্স পেমেণ্টে তিন বছরের একটা গ্যাপ রয়েছে। সময়টা হলো—তার ডেনভারে আসার আগের তিন বছর। তারপর জানা গেল, শুধু ট্যাক্স পেমেণ্ট নয়, বাকি অন্যান্য সমস্ত রিপোর্টে তিন বছরের একটা গ্যাপ রয়েছে, অথচ কেউ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। খেলার চিরকুমার ছিলো, তার মা-বাবা এবং ওর বড় একমাত্র বোনটা অনেক বছর

আগেই মারা গেছে। আমি ইন্টেলিজেন্স যা আবিষ্কার করলো তা তিন বছর রহস্যের চেয়ে আরো বিভ্রান্তিকর। সতেরো বছর আগে এলিস খেলার একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, এবং তার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী তার মাকে পঁচিশ হাজার ডলার ক্রেইম-ও পেমেন্ট করেছে, বুড়ি মারা যাওয়ার মাসখানেক আগে।

‘আমি জানতাম সান-অভ-আ-বীচ আসলেই একটা সান-অভ-আ-বীচ,’ আবিষ্কারের আনন্দে উল্লাসের সাথে বললেন বন গিলবার্ট। ‘এখন আমাদের জানতে হবে সান-অভ-আ-বীচটা সত্যি সত্যি কে ছিলো।’ এলিস খেলার উনিশ শো ত্রিশ সালে ডেটনে জন্মগ্রহণ করে, কোরিয়ান যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীতে করপোরাল হিসেবে ছিলো সে। আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা গেল যোদ্ধা খেলার আর সদ্য নিহত খেলার এক ব্যক্তি নয়, দ্বিতীয় খেলার কোরিয়ায় যুদ্ধই করেনি। এরপর এফ. বি. আই. আবিষ্কার করলো, তিন বছর গ্যাপের পর ট্যাক্স রিটার্নে যে সই দেয়া হয়, তিন বছর আগে দেয়া সইগুলোর সাথে তার কোনো মিল নেই। সদ্য নিহত লোকটা এলিস খেলার নয়, এটা নিশ্চিতভাবে জানার পর আমেরিকার বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে তার সম্পর্কে সম্ভাব্য সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হলো। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, এ-ধরনের কেস মীমাংসার জন্যে এফ. বি. আই.-ই সবচেয়ে উপযুক্ত সংস্থা। সেটা উনিশে জুনের ঘটনা।

বিশ তারিখে লিজা আইভরসন নামে চল্লিশোর্ধ্ব এক মহিলা নিখোঁজ হলো। মহিলা লিজা’স বৃদ্ধ-এর মালিক, অগাস্টার ছোটো জনপ্রিয় বিউটি শপের একটা ওটা। কোটিপতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের স্ত্রী ইলিনা লোপেজের লুল রঙ করছিল সে, এই সময় টেলিফোনটা

আসে। পাঁচ মিনিট পর লিজা আইভারসন নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্যাংকে যায়, সেফটি ডিপোজিট বক্স থেকে একটা প্যাকেট বের করে সে। আলবানি, নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে ডিপোজিট বক্সটা ভাঙা নেয়া ছিলো তার, বারো বছর ধরে। ব্যাংক রিপোর্ট অনুসারে, এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যায় লিজা আইভারসন।

তারপর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সরু একটা গলিতে পাওয়া গেল গাড়িটা, আগুন লাগার জায়গাটা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আগুন লাগার ফলে জেট ফাইটার বেসের প্রায় সবটুকু তেল পুড়ে যায়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে উত্তর-পূর্ব আমেরিকার ওপর শত্রু বিমান হানা দেয়ার কোনো হুমকি সেদিন বা পরবর্তী তিন দিন ছিলো না। চার চারটে দিন আমেরিকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাময়িক একটা ফুটো তৈরি হয়েছিল—মহামূল্যবান ছাতায় সাময়িক ছোট্ট একটা ফুটো—তারপর চব্বিশ তারিখ বিকেলে ফুয়েল ট্রাক পৌঁছে গেলে সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটে। ইউ. এস. এয়ারফোর্স অফিস থেকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম পাঠানো হলো, টেকনিক্যাল এক্সপার্টরা আগুনের কারণ, কে দায়ী, ইত্যাদি জানার জন্যে তদন্ত চালাবে। কিন্তু আগুন লাগার সাথে লিজা আইভারসনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা ওরা কেউ এক করে দেখলো না।

অগাস্টা থেকে কমবেশি হাজার মাইল দূরে লাক দু ফ্রামবিউ। প্রায় নির্জন, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছড়াছড়ি, ফিল্ম-মেকারদের জন্যে আদর্শ জায়গা। কিন্তু এখানে কেউ ছবি করতে আসে না, কারণ

উত্তর-ঘেঁষা উইসকনসিন বনভূমির ভেতর লাক ছু ফ্ল্যামবিউ ছোট্ট একটা শহর। উইসকনসিন বনভূমিতে, শহরের বিশ মাইল পশ্চিমে রয়েছে একটা ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশন। এই ইণ্ডিয়ানদের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, এমনকি তারা মারমুখোও নয়; কাজেই অল্প ছ'চারজন শিকারী বা ট্যুরিস্ট এদিক দিয়ে আসা-যাওয়া করলেও ইণ্ডিয়ান রিজার্ভেশনের দিকে পা বাড়ায় না। পূবে রয়েছে রেইনবো রিজার্ভেশন, আর দক্ষিণে উইলো রিজার্ভেশন। এ-ছোটোও মানুষকে আকৃষ্ট করে না। আদি এবং অকৃত্রিম লাক ছু ফ্ল্যামবিউ প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, একমাত্র আধুনিক কাঠামো বলতে বোঝায় বিশাল এলাকা জুড়ে টোর্যান্স ন্যাভাল কমিউনিকেশনস স্টেশন। নামকরণটা করা হয়েছে একজন অ্যাডমিরালের নামে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এই বীর পুরুষ উনিশশো উনষাট সালে চীফ অভ ন্যাভাল অপারেশনস ছিলেন। সে বছরই টোর্যান্স তৈরি করা হয়।

তৈরি করা হয় না বলে, বলা উচিত খোঁড়া হয়। কারণ এই অসাধারণ সামরিক স্থাপনার মূল অংশই হলো মাটির নিচে লুকানো তার। সব মিলিয়ে একশো আঠারো মাইল। বিশাল এবং সুকৌশল নৈপুণ্যের সাথে ডিজাইন করা গ্রিড-টা দৈত্যাকৃতি অ্যান্টেনার আকৃতি নিয়ে রয়েছে, ওটার কাজ হলো চার থেকে বারো হাজার মাইল দূরে টহল রত মার্কিন পোলারিস সাবমেরিন-গুলোকে চূড়ান্ত পর্যায়ে শর্টওয়েড সিগন্যাল পাঠানো। টোর্যান্স গ্রিড থেকে পাঠানো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট বা জ্যাম করা সম্ভব নয়, গোপনীয়তা রক্ষার পেটাগন নীতির স্বার্থে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কখনো যদি কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পান্টা আঘাত হানার শাস্তিদূত-১

জন্যে থার্মোনিউক্লিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার নির্দেশ দিতে হয়, তাহলে এই টোর্যান্স গ্রিডের মাধ্যমে মোবাইল সাবমেরিনগুলোকে আগারসী রকেট নিক্ষেপ করার অর্ডার দেবেন তিনি। টোর্যান্স গ্রিড সম্পর্কে বিশদ খুব কম আমেরিকানই জানে, তবে রাশিয়ার সবটুকুই জানা আছে। টোর্যান্স গ্রিড সম্পর্কে একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে তাদের।

মার্কিন ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট টোর্যান্স গ্রিডের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। গোটা স্থাপনাকে তিন প্রস্থ ইলেকট্রিফায়েড কাঁটা-তারের বেড়া বৃত্তাকারে ঘিরে আছে। পেরিমিটারে রয়েছে অসংখ্য সেন্টি পোস্ট, একটা মাইন ফিল্ড, এবং ভ্রাম্যমান জীপ বহর। সারা দিন এবং সারা রাত ধরে হেলিকপ্টার গান-শিপ বেড়া ধরে উড়ে যায়, অনিয়মিত বিরতি দিয়ে।

টোর্যান্স কমিউনিকেশন স্টেশনকে নিয়ে লাক দু ফ্রামবিউয়ের কারো কোনো মাথাব্যথা বা আগ্রহ নেই, কারণ নেভির লোকজন শহরে বড় একটা আসে না। টেকনিশিয়ানদের জন্যে স্টেশন এলাকাতেই রয়েছে খেলার মাঠ, সিনেমা হল, সুপার মার্কেট, হাসপাতাল, সুইমিং পুল, ইত্যাদি। কেউ যখন আসে বা যায়, নিজেদের এয়ারস্ট্রিপ ব্যবহার করে তারা। আশপাশে অবশ্য আরো কয়েকটা এয়ারফিল্ড রয়েছে, কিন্তু সেগুলোয় স্টেশনের কোনো প্লেন কখনো ল্যান্ড করে না। শহরে লোক বসতি কম, শহরের বাইরে আরো দূরে দূরে বাস করে মানুষ। ইণ্ডিয়ানদের এতো টাকা নেই যে কোথাও যেতে হলে প্লেনে চড়বে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিকারী, অ্যাংলার, বা ট্যুরিস্ট যারা আসে তারাই ব্যবহার করে এয়ারফিল্ড-গুলো। আশপাশে অনেক লেক আছে, ভালো মাছ পাওয়া যায়,



এয়ারফিল্ডগুলোও লেকগুলোর কাছাকাছি। বেশিরভাগ লোকই হালকা প্লেন চাটার করে আসে, উঠতে-নামতে অসুবিধে হয় না। পাইলটরা সবাই জানে টোর্যান্সের ওপরকার আকাশ নিষিদ্ধ এলাকা, কিন্তু সেটা কোনো সমস্যা নয়, কারণ খালি আকাশের বিস্তৃতি প্রায় সীমাহীন। ইচ্ছে করলেই ঘাটি এলাকা এড়িয়ে প্লেন চালানো যায়।

নিষিদ্ধ আকাশ সীমা সম্পর্কে অবশ্যই জানা ছিলো বেন কুইকের। ডুলাথ-এ থাকে সে, সেখান থেকে ছোটো একটা প্লেন সার্ভিস চালিয়ে আসছে আজ অনেক বছর হলো। ডুলাথ এবং অন্যান্য শহর থেকে শিকারী বা অ্যাংল রদের নিয়ে লেক ঘেঁষে অমন কয়েক শো বার এদিকে এসেছে। এলাকাটা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে সে, কারণ তার স্ত্রীর শরীরে অর্ধেক ইণ্ডিয়ান রক্ত বইছে। স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে বেড়াতে আসে, আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, বছরে পাঁচ-সাতবার তো বটেই।

ছায়াবিশে জুন, সকাল। নিজের বাড়ির পিছনে, গ্যারেজে ছিলো বেন কুইক, লনমোয়ারে ফুয়েল ঢালছিল, এই সময় ফোন কলটা এলো। এর প্রায় নব্বই সেকেন্ড পর তার স্ত্রী এসে বললো যে ডঃ টোবি টমপল নামে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন, উদ্দেশ্য বেন কুইককে বিকেল চারটের লেক টোমাহক ফ্লাইটের কথা মনে করিয়ে দেয়া।

‘ভালো করে শুনেছো, ঠিক এই কথাগুলোই বললেন তিনি?’

‘হব্ব, বেন। মেসেজের ব্যাপারে তুমি কেমন খুঁতখুঁতে জানি বলে প্রতিটি শব্দ মনে করে রেখেছি,’ মিসেস বেন কুইক স্ত্রী-সুলভ শান্তিদূত-১

হাসলো ।

‘তাহলে বরং প্লেনটা একবার চেক করে আসি ।’ গভীর দেখালো বেন কুইককে, কেমন যেন অন্তমনস্ক । তবে, রওনা হবার আগে স্ত্রীকে চুমো খেলো সে, বলা যায় একটু বেশি সময় নিয়েই এবং একটু বুঝি বেশি আবেগের সাথে—মাত্র আট ঘণ্টার জন্যে ছাড়া-ছাড়ি হতে যাচ্ছে, সে-কথা ভেবে স্বামীর আচরণ একটু যেন বাড়া-বাড়ি বলে মনে হলো স্ত্রীর কাছে । প্রেম-ভালোবাসার এ-ধরনের খোলামেলা প্রকাশ অন্তত দিনের বেলা পাইলট সাহেবের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না, আকস্মিক এই ঢল ভালোই লাগলো তার । মনে মনে ভাবলো, মা হবার আশা এবার হয়তো তার পূরণ হতে পারে । অনেক বছর ধরেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে আসছে বেন কুইক ।

স্টেশন ওয়াগন নিয়ে সী-প্লেন বেসে চলে এলো বেন কুইক, অ্যামফিবিয়ান-টা ভালোভাবে চেক করে নিয়ে বেলা একটার আগেই টেক-অফ করলো । বিকেল চারটে পর্যন্ত বা ডঃ টোবি টেমপলের জন্যে অপেক্ষা করলো না সে । লেক টোমাহকের উদ্দেশ্যে একটা ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করলো, রওনা হলো নরমাল রুট ধরে ।

অন্যান্যবার যা করে, এবার তা করলো না বেন কুইক—টোর্যান্স-কে ঘিরে চক্কর দিলো না । তার বদলে সী-প্লেনটাকে হঠাৎ মাটির মাত্র এক শো ফিট ওপরে নামিয়ে আনলো, তারপর টপ স্পীডে ছুটলো নিষিদ্ধ এলাকার দিকে ।

কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে এলো প্লেন । নতুন লো-স্ক্যান রাডারে ধরা পড়লো সেটা । অ্যালার্ম বেল বেজে উঠলো । নয় নম্বর সেক্টি, পোস্টে একজন মেরিন প্রাইভেট থপ্ করে ধরে ফোনের রিসিভার

তুললো ।

‘হট পিস্টল ! হট পিস্টল !’ আর্তনাদ শুরু করলো সে । ‘অচেনা  
এয়ারক্রাফট সরাসরি কমাণ্ড পোস্টের দিকে যাচ্ছে ! বেয়ারিং  
ডেন্টা, খুব নিচে দিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে !’

‘হট পিস্টল’ সত্যিকার বিপদ সংকেত কোড, প্রতি দু’হণ্ডা পর-  
পর যে মহড়া হয় তার সাথে এই কোডের কোনো সম্পর্ক নেই ।  
এর আগে কখনো টোর্যাঙ্গে হট পিস্টল পরিস্থিতি দেখা দেয়নি ।  
কমাণ্ড পোস্টে কর্তব্যরত লেফটেন্যান্ট তাই তিন সেকেন্ড ইতস্তত  
করলো । এই তিন সেকেন্ডেই ঘেম গোসল হয়ে গেল সে । কি করবে  
বুঝতে পারছে না । খুব সম্ভব চার্টার্ড প্লেনের কোনো হাবাগোবা  
পাইলট বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে । সিভিলিয়ান প্লেন, তাতে  
কোনো সন্দেহ নেই—কারণ ইউ. এস. বা ক্যানাডিয়ান রাডারকে  
ফাঁকি দিয়ে টোর্যাঙ্গের হাজার মাইলের মধ্যে শত্রুপক্ষের কোনো  
বৈরী সামরিক বিমান ঢুকতে পারবে না । তিন সেকেন্ড সময়ের শেষ  
দিকে লেফটেন্যান্টের চেহারা ভূতের মতো কালো হয়ে উঠলো, দাঁতে  
দাঁত চেপে কাঁধ ঝাঁকালো সে, তারপর যা করার ট্রেনিং পেয়েছে  
তাই করলো ।

ডেস্কের দিকে মুখ করা কনসোলে অনেক বোতাম, তার একটা  
টিপে দিলো সে । গোটা টোর্যাঙ্গে চরম সতর্ক সংকেত বেজে উঠলো ।  
এ এমন একটা পিলে চমকানো আওয়াজ, অগ্রাহ্য করার কোনো  
উপায় নেই । কমাণ্ড পোস্ট থেকে প্রায় নব্বই গজ দূরে ছিলো  
সার্জেন্ট ডেভিড কপার, চোখের পলকে বিছাৎ খেলে গেল তার  
শরীরে । হাতল ঘুরিয়ে সে তার রেড-আই মিসাইল লঞ্চার ওপর  
দিকে তুললো, আরেক ঝাঁকিতে বসিয়ে নিলো নিজের কাঁধে, তার-  
শান্তিদূত-১

পর পেরিমিটারের দিকে মারমুখো দৃষ্টিতে তাকালো।

‘কী সর্বোনাশ!’ বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করলো সে। গাছ-পালার মাথার আড়াল থেকে প্লেনটাকে বেরিয়ে আসতে দেখছে।

ঠিক ওই সময় একটা মাইক্রোফোনে হড়বড় করে কথা বলছে লেফটেন্যান্ট। উদ্দেশ্য প্লেনটার ফ্রিকোয়েন্সি জানতে পারলে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেবে। হয় সে ফ্রিকোয়েন্সি পেলো না, নয়তো পাইলট শুনছে না। প্লেনটা তুমুল বেগে এগোতেই থাকলো। সোজা হলুদ বিন্ডিংটার দিকে যাচ্ছে ওটা। ওই বিন্ডিংটাই কমাণ্ড পোস্ট, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ইকুইপমেন্ট রাখা আছে ওখানে।

‘কী সর্বোনাশ!’ সার্জেন্ট কপার আবার স্বগতোক্তি করলো, তারপর ঈশ্বরের নাম জপে টিপে দিলো রেডআই রকেটের ট্রিগার।

চোখের পলকে সী-প্লেনটা আগুনের একটা বল হয়ে গেল। সার-ফেস-টু-এয়ার মিসাইল আঘাত করেছে ওটাকে। আগুনের বলটা মাটিতে আছাড় খাওয়ার আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটলো, উত্তপ্ত ধাতব পিণ্ড ছড়িয়ে পড়লো আধ মাইল এলাকা জুড়ে। তারপরই আরেকটা বিস্ফোরণ, তৈরি হলো নব্বই গজ ডায়ামিটার জুড়ে পুরোপুরি ছ’ফিট গভীর একটা গর্ত।

ঘটনা সম্পর্কে যথা সময়ে সরকারী একটা ভাষ্য পাওয়া গেল। সেটা ছাপাও হলো পত্রিকায়। আকাশে থাকা অবস্থায় একটা টুইন-এঞ্জিন গ্রুপম্যান অ্যামফিবিয়ানে আগুন ধরে যায়। চার্টারড ফ্লাইটে লেক টোমাহকে যাচ্ছিলো ওটা। সিভিলিয়ান পাইলট টোর্যান্স স্ট্রিপে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ের জন্যে চেষ্টা করে।

প্লেনে এক্সপ্লোসিভ কার্গো ছিলো, কিন্তু প্রেসনোটে তার কোনো

উল্লেখ থাকলো না ।

অফিশিয়ালি ঘটনাটা তদন্ত করার দায়িত্ব পেলো ন্যাভাল ইন্টে-  
লিজেন্স । নেভির পাবলিক রিলেশন্স বিশেষজ্ঞরা একাধারে অস্বস্তি  
এবং অপ্রতিভ বোধ করলো । ঘটনাটা যদি সামরিক কোনো ষড়যন্ত্রের  
অংশ না হয়ে থাকে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনাবিহীন এই শান্তিময়  
সময়ে একটা অসামরিক প্লেনকে পাইলট সহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার  
পিছনে কোনো যুক্তি ধোপে টিকবে না । পাইলট যদি স্রেফ ভুল  
করে থাকে, জনসাধারণ ব্যাপারটা জানতে পারলে তাদের মধ্যে  
বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে । কিন্তু মেরিন কমান্ড্যান্ট জেনারেল গ্যাবি  
হিনম্যানের প্রতিক্রিয়া হলো সম্পূর্ণ অন্য রকম ।

‘সার্জেন্ট কপারকে এই মুহূর্তে লাইনে চাই !’ হুকুম করলেন তিনি ।

লাইনে আসতে চার মিনিট লেগে গেল সার্জেন্টের ।

‘সার্জেন্ট কপার, দিস ইজ দি কমান্ড্যান্ট ।’

‘ইয়েস, স্যার !’

‘কপার, নেভির পাবলিক রিলেশন্স তোমার সাড়ে সর্বনাশ করার  
পায়তারা কষছে । আজ বিকেলে তুমি যা করেছো—বীরত্ব নয়  
কাপুরুষতা বলে মনে করছে ওরা । এখন ঠিক কি ঘটেছে সব  
আমাকে খুলে বলো—খবরদার—কিছুই লুকাবে না ! ক্লিয়ার ?’

‘ইয়েস, স্যার ! আমি আমার পজিশনে ছিলাম, স্যার । গর্তের  
ভেতর, চারধারে বালি ভর্তি বস্তা—সিকিউরিটি পজিশন, স্যার ।  
সিকিউরিটি ডিউটিতে ছিলাম, জেনারেল । ইনটেরিয়র সিকিউরিটি,  
স্যার । পোস্ট নাইনটিন, সি. পি. থেকে আধ মাইলের মতো দূরে,  
স্যার । তেমন কিছু ঘটেনি, যদি জানেন ঠিক কি বলতে চাইছি... ।’

‘বাংকারে বসে পাছা চুলকাচ্ছিলে । তারপর কি হলো ?’

‘কী সর্বোনাশ ! বিপদ-সংকেত গ্যাঁ গ্যাঁ করে উঠলো ! টেস্ট

সিগন্যাল নয়, স্যার। হট পিস্টল সিগন্যাল ।’

‘হ্যাঁ, জানি। বলে যাও।’

‘রেডআই কাঁধে তুললাম। কী সন্ধানাশ, দেখি কি গাছের ওপর দিয়ে তেড়ে আসছে ওটা। ঠাট্টা বলে মনে হলো না, স্যার। স্কাপে চোখ রেখে দেখে নিলাম একবার, সেই সাথে চুকিয়ে দিলাম ঝামেলা। সে-অর্ডারই আমাকে দেয়া হয়েছে, স্যার। ওভাবে বিপদ সংকেত বাজলে আমার কাজ হবে এয়ারপ্লেন ধ্বংস করা, আর ঠিক তাই আমি করেছি।’

‘বিউটিফুল,’ মন্তব্য করলেন জেনারেল। ‘বিউটিফুল শূটিং। মাত্র এক রাউণ্ড, তাতেই আকাশ থেকে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। অভিনন্দন, সার্জেন্ট। তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত, এবং ওরা যতোই পায়তারা করুক তা নিয়ে তোমার কোনো চিন্তা নেই।’

‘ধন্যবাদ, স্যার।’

‘আমি চাই না তুমি কোনো রিপোর্টারের সাথে কথা বলো, কপার। পরবর্তী প্লেনে চড়ে অ্যান্ড্রু বিমান ঘাটিতে চলে যাও। ওদিকে আজ যদি কোনো প্লেন না যায়, ওদের বলো তোমার জ্যেষ্ঠ স্পেশাল একটার ব্যবস্থা করতে। দ্যাটস অ্যান অর্ডার।’

তিন ঘণ্টা পর ওয়াশিংটনের কাছে অ্যান্ড্রু এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছে গেল সার্জেন্ট ডেভিড কপার, ঠিক ওই সময় মস্কোয় লেফটেন্যান্ট নিকিতা কুরাভিন ডকুমেন্ট ‘অডিট’-এর ফলাফল নিয়ে কর্নেল বিকারেনের অফিস ঘরে ঢুকলো। কাজটা শুরু করা হয়েছিল নিকোলাই ডালচিমস্কি নিখোঁজ হওয়ার পর। সর্বশেষ আইটেমগুলোর সর্বশেষ তালিকা চেক করা হয়েছে। কে জানে সব ঠিকঠাক পাওয়া গেছে কিনা।

না, সব ঠিকঠাক পাওয়া যায়নি। ভন্টে বেশ ক'টা ডকুমেন্ট নেই।

নিঃশব্দে রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল বিকারেন। আবার পড়লেন তিনি, তারপর আবার একবার। চোখ বুজে ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করলেন তিনি। শিউরে উঠলেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গেল। জেনারেল কায়কোভস্কির প্রাইভেট লাইনের দিকে হাত বাড়ালেন, আঙুলগুলো কাঁপছে। রিসিভার তুলে ডায়াল করতে ভুলে গেলেন তিনি, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সিলিঙের দিকে। একটা টিকটিকি ডেকে উঠতে সম্মিত ফিরে পেলেন।

‘জেনারেল কমরেড কায়কোভস্কি মিটিঙে রয়েছেন,’ জেনারেলের এইড, এক মহিলা ক্যাপটেন ব্যাখ্যা করলো।

‘তা থাকুন, বলো জরুরী ব্যাপার, এখনি তাঁর সাথে আমার কথা বলতে হবে।’

‘কিন্তু কর্নেল কমরেড, সিনিয়র অফিসারদের সাথে মিটিং করছেন তিনি...।’

‘আমি তোমাকে হুকুম করছি জেনারেলকে খবরটা দাও—এই মুহূর্তে!’ টেলিফোনে চোঁচিয়ে উঠলেন কর্নেল বিকারেন। ‘জেনারেল গুরুত্ব না দিলে বলো তাঁর ছেলেরা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে!’

নব্বই সেকেন্ড পর লাইনে এলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ‘আবার কি হলো, আনাতোলি? ক্যাপটেন ইলিনা বললো, তুমি নাকি অস্থির হয়ে আছো। আরেকটা ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছো নাকি?’

‘তারচেয়েও খারাপ।’

‘তারচেয়ে খারাপ ? তারচেয়ে খারাপ কি হতে পারে ?’

কটমট করে লেফটেন্যান্ট কুরাডিনের দিকে তাকালেন কর্নেল, মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন নিঃশব্দে। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

‘আনাতোলি, কি ব্যাপার ?’ অপরপ্রান্তে ধৈর্য হারাচ্ছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘এক সেকেন্ড...ঠিক আছে, এখন আমি একা। শুনুন। জেনারেল, আপনার মনে আছে চোদ্দ বছর আগে আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছিলাম—আমি আর আপনি ?’

‘চোদ্দ বছর আগে ? কোন্ প্রজেক্টের কথা বলছো ?’

‘টেলি-বম।’

অপরপ্রান্তে ঝাড়া দশ সেকেন্ড কোনো শব্দ নেই।

‘মনে আছে, জেনারেল ?’

এবার কথা বললেন জেনারেল, ‘কেউ ভোলে ?’

‘ডকুমেন্ট অডিট শেষ করেছি আমরা, জেনারেল কমরেড। টেলি-বম বুকটা পাওয়া যায়নি।’



# চার

---

ক্লিক ।

জ্বীনে দাগহীন, রোদে পোড়া, একটু ফোলা ফোলা একটা মুখের ছবি ফুটে উঠলো । পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স । মার্কিনী ধাঁচে কাটা চুল, নেকটাইটা আমেরিকান ।

এ-সবই এক সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময়ের ভেতর মনের মুকুরে গঁথে নিলো অতিথি গুপ্তচর । একটা ফাইটার বম্বারের কাঠামো বা পোলারিস সাবমেরিনের কায়া দেখামাত্র চিনে নিতেও এরচেয়ে বেশি সময় লাগে না তার । মানুষ হিসেবে তার অনেক দুর্বলতা আর সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু মাথাটা কাজ করে বিদ্যুৎ বেগে । ভাগ্যের অকুপণ সহায়তা পেয়েছে সে, প্রকৃতি তাকে বার-বার অলৌকিকভাবে রক্ষা করেছে বিপদ থেকে, আর সেই সাথে বেড়েছে তার অভিজ্ঞতা । কৃতিত্ব আর সাফল্যের তালিকা দেখে মনে হতে পারে সে বোধহয় অতিমানব—সুপারম্যান—কিন্তু আসলে তা নয় । লোকে তার সাফল্যের খবর জানে, কিন্তু ব্যর্থতার খবর তাদের জানানো হয় না । অথচ সাফল্যের চেয়ে তার ব্যর্থতার সংখ্যা কম

নয়। তবে এ-কথা ঠিক যে এসপিওনাজ জগতের আর সবার থেকে সে আলাদা। কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে চর্চা করে নৈপুণ্য আর দক্ষতা অর্জন করেছে সে। কঠোর অনুশীলনে বিশ্বাসী, অমানুষিক পরিশ্রম করতে জানে। আর আছে ঝুঁকি নেয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা। ভাগ্য, অভিজ্ঞতা, অনুশীলন, পরিশ্রম, এবং মেধা—সব মিলিয়ে তাকে করে তুলেছে প্রায় অজেয়, কিংবদন্তীর নায়ক।

‘বলুন!’ অন্ধকার ঘরে কর্নেল বিকারেনের গলা পাওয়া গেল।

‘কি বলবো,’ জবাব দিলো মাসুদ রানা। ‘ওকে আমি চিনি না।’  
ক্লিক।

স্ক্রীনে এবার এক মহিলার মুখ।

‘একেও চিনি না,’ বললো রানা। ‘কারা এরা? বোঝা যাচ্ছে আমেরিকান, কিন্তু...।’

ক্লিক, ক্লিক।

প্রজেক্টর অফ হয়ে গেল, আলো জ্বলে উঠলো ঘরে। জেনারেল কায়কোভস্কিকে অস্বাভাবিক গভীর দেখলো রানা।

‘চোদ্দ বছর আগে অপারেশনটা শুরু হয়,’ রানার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন জেনারেল। ‘আমেরিকান ইউ-টু স্পাই ফ্লাইটের কথা মনে আছে আপনার? তার পরের ঘটনা।’ পক্কেশ বৃদ্ধের চেহারা দেখে মনে হতে পারে এইমাত্র কুইনাইন খেয়েছেন। ‘তখন আমাদের মনে হয়েছিল, আমেরিকানরা বোধহয় আঘাত হানার জন্যে টার্গেট খুঁজছে। মনে হচ্ছিলো, একটা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বেধে যাওয়া খুবই সম্ভব। কাজেই এই প্রজেক্টটায় হাত দেই আমরা—টেলি-বম।’

মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে রানা, কিন্তু বারবার ছুটে যাচ্ছে

মনোযোগ। অনেক দুর্বলতার একটা হলো, ধূমপানের ব্যাপারে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। জানে ক্ষতিকর, মাঝে মাঝে অনেক কষ্ট করে ছেড়েও দেয়, কিন্তু তারপর আবার ধরে। এই মুহূর্তে গলা বুক সব যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে বলে মনে হলো, সিগারেট ধরাতে পারলে বড় শান্তি পেতো। কিন্তু জেনারেল কায়কোভস্কি বস রাহাত খানের বন্ধু মানুষ, তাঁর সামনে ধরায় কি করে! নাকি ধরিয়ে বসবে? — ভাবছে রানা।

‘টেলি-বম। আগে কখনো শুনিনি, জেনারেল,’ বললো রানা।

রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে জেনারেল বললেন, ‘সিগারেট, মিঃ রানা?’

‘জ্বী-না, ইচ্ছে করছে না—ধন্যবাদ,’ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল কথাগুলো, তারপরই গাল দিয়ে ভূত ছাড়ালো নিজের। এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে!

‘আপনার শোনার কথাও নয়,’ রানার কথার খেই ধরে আবার শুরু করলেন জেনারেল। ‘এ-ব্যাপারে গোপনীয়তার মাত্রা টপ সিক্রেটকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গোটা ব্যাপারটার ভিত্তি ছিলো এক দল ডীপ-কভার এজেন্ট। এ-ধরনের ক্রটিহীন ডীপ-কভার এজেন্ট আর কোনো দেশ তৈরি করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ পারবে বলে মনে হয় না।’ হঠাৎ মুখ তুলে ডেপুটি ডিরেক্টরের দিকে তাকালেন জেনারেল। ‘আনাতোলি, নিখুঁত ডীপ-কভার এজেন্ট কাকে বলে?’ কৌতূকের সাথে নয়, অনেকটা চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

উত্তরের জন্যে জেনারেল অপেক্ষা না করায় মোটেও অবাক হলো না রানা। জেনারেলের সাধারণত অতোটা বৈধেয় পরিচয় দেন

না।

‘নিখুঁত ডীপ-কভার এজেন্ট,’ বলে চললেন জেনারেল, ‘হলো, যে জানে না সে ডীপ-কভার এজেন্ট। যতো যাই বলো, আনা-তোলি, আইডিয়াটা কিন্তু ইউনিক ছিলো! ব্রিলিয়ান্ট!’

‘সে-সময় এর পিছনে যুক্তি ছিলো,’ বিনয়ের সাথে বললেন কর্নেল বিকারেন।

‘হিপনোসিস,’ চুরুটের ডগাটা ছাইদানির মাঝখানে ঘষে ঘষে আগুন নেভালেন জেনারেল। ‘চারশো ত্রিশজন মেধাবী লোককে এক জায়গায় জড়ো করি আমরা। কেউ কখনো দেশের বাইরে কোথাও যায়নি। সবাই ভালো ইংরেজী জানতো। আমেরিকান লাইফ-স্টাইল সম্পর্কে ওদের আমরা ট্রেনিং দেই, ড্রাগ-অ্যাসিস্টেড-হিপনোসিসের মাধ্যমে। এক একজনের পিছনে টাকার পাহাড় খরচ হয়ে গেল, সময়ও লাগলো প্রচুর, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো। ট্রেনিং শেষ হবার পর দেখা গেল, ওরা প্রত্যেকে নিজেকে সত্যি সত্যি আমেরিকান বলে বিশ্বাস করছে, সাথের কাগজ-পত্রে যা লেখা আছে সে-সবকে একমাত্র সত্য বলে জানছে। ওদেরকে আমরা পাঠিয়ে দিলাম। সবাইকে নয়, শুধু বাছাই করা কিছু ছেলে আর মেয়েকে। পিছনে কোনো সূত্র না রেখে প্রত্যেকেই ওরা নিবিধে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ করলো।’

‘ফ্যানটাসটিক!’ বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো রানা। সিগারেটের কথা ভুলে গেছে ও। চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি, চেহারায় গভীর মনোযোগের ছাপ।

‘সবাই ওরা স্বাস্থ্যবান, সাবোটাজে কমপ্লিট ট্রেনিং পাওয়া লোক। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে স্ট্র্যাটেজিক মিলিটারী বা ন্যাভাল

টার্গেট স্থির করা ছিলো, সবাই যে যার টার্গেট এরিয়ায় সাফল্যের সাথে ঢুকে পড়ে। কারো মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি না করে ওই এলাকায় শান্তিতে বসবাস করতে থাকে ওরা। সচেতনভাবে ওরা জানে না জায়গাগুলো বা শহরগুলো কেন তাদের এতো ভালো লাগে বা আকর্ষণ করে। যে যেখানে গেল সেখানেই রয়ে গেল, তার মনে অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছে জাগলো না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত যে যার জায়গায় অপেক্ষা করছে ওরা।’

‘কিসের জন্যে?’

‘কোড সংকেত,’ ব্যাখ্যা করলেন কর্ণেল বিকারেন। ‘প্রত্যেক এজেন্টের মনের গভীরে খোদাই করা আছে একটা কোড সংকেত। সেটা শুধু আমরা ব্যবহার করবো, কখনো যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধে। টেলি-বম আক্রমণ শুরু করার অধিকার বা ক্ষমতা শুধু একজনেরই আছে—প্রিমিয়ারের। এজেন্টদের কারো কারো মিশন এতোই বিপজ্জনক যে নিজেকে সেরক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না।’

‘মৃত্যুকে হাসিমুখে মেনে নেয়ার জন্যে সবাই তৈরি হয়ে আছে ওরা,’ বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। সময় নিয়ে নতুন একটা চুরুট ধরালেন তিনি। ‘মৃত্যুর এই ইচ্ছেটাও তাদের মনে সুপ্ত অবস্থায় আছে।’ যার যার এলাকায় বসবাস শুরু করলো ওরা, ঠিক এক বছর পর সবাই ওরা একটা করে ভিউকার্ড পাঠালো—কানাডায় আর মেক্সিকোয়, আগে ঠিক করা ঠিকানায়। ‘পরে ওদেরকে একটা করে প্যাকেট পাঠাই আমরা। অবচেতন মনের নির্দেশে যে যার প্যাকেট লুকিয়ে রাখে।’

‘এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ধোঁয়া

আড়াল সৃষ্টি করায় মাথাটা একটু কাত করে 'রানার দিকে তাকা-  
লেন। 'ছ'মাস পরপর লোকাল টেলিফোন গাইড চেক করে দেখে  
নিই আমরা, এজেন্টদের নম্বর ঠিক আছে, না বদলেছে। সরাসরি  
যোগাযোগ রাখা হয়নি, কারণটা পরিষ্কার। কোনো রকম খুঁকিই  
আমরা নেইনি, কাজেই ওদের পরিচয় কোনো দিনই ফাঁস হবে  
না।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড চিন্তা-ভাবনা করলো 'রানা, তারপর মাথা  
ঝাঁকালো। সত্যি, কোথাও কোনো ফাঁক দেখা যাচ্ছে না। 'প্ল্যানটা  
চমৎকার, কমপ্লিটলি ওয়াটার-টাইট। ক্রটিহীন ডীপ-কভার এজেন্ট  
ওরা, সন্দেহ নেই। বেশ, তারপর? ওদের আপনারা বের করে  
আনতে চান?'

জেনারেল আর কর্নেল দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন কর্নেল বিকারেন, 'ভয়ংকর খুঁকি না নিয়ে  
ওদেরকে বের করে আনা সম্ভব নয়। খুঁকি নিলেও বের করে আনা  
সম্ভব কিনা তাও আমরা জানি না। কিন্তু সমস্যা ঠিক এটা নয়,  
আরো বড় সমস্যায় পড়েছি আমরা।'

'জ্ঞীনে যাদের ছবি দেখলাম, ওরা কারা?'

'মেয়েটাকে অগাস্টার সবাই লিজা আইভারসন হিসেবে চেনে,'  
প্রাক্তন পদাতিক সৈনিক বললেন। 'আর লোকটাকে ডেনভারের  
মানুষ জানে এলিস থেলার হিসেবে। এজেন্টদের মধ্যে সেটা ছুঁজন।  
ছুঁজনেই মারা গেছে—গেল মাসে।' একটু বিরতি নিয়ে একা  
প্রকাশের ভঙ্গিতে বললেন আবার, 'ওদের জন্যে আমি গর্বিত।  
বীরের মতো মরেছে ওরা...'

'ওদের মৃত্যু অর্থহীন আর দুঃখজনক, আনাতোলি,' কক্শ কণ্ঠে

বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ‘খাতাটা উদ্ধার করা না গেলে বাকিরাও এই অর্থহীন মৃত্যুর শিকার হবে। এবার সব বলো ওকে,’ নির্দেশ দিলেন তিনি।

কর্নেলের দিকে তাকালো রানা।

‘তেমন জটিল কোনো ব্যাপার নয়,’ বেশুরো গলায় বললেন কর্নেল। ‘সব ক’জন ডীপ-কভার এজেন্টের নাম আর ফোন নম্বর একটা ছোটো খাতায় লেখা আছে, আমরা সেটাকে টেলি-বম বুক বলি।’

‘কোড সংকেত সহ।’

‘হ্যাঁ। একই খাতা মোট তিনটে। একটা আছে কে. জি. বি. রেসিডেন্ট-এর কাছে, উনি আমেরিকায় কে. জি. বি.-র সমস্ত অপারেশন কন্ট্রোল করেন। খাতাটা আছে একটা অ্যাটাচি কেসে, তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করার ইকুইপমেন্ট সহ। দ্বিতীয়টা আছে রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের প্রাইভেট সেফে, রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স পাহারা দেয় সেফটাকে।’

‘শেষটা?’

ইতস্তত করতে লাগলেন কর্নেল বিকারেন। রানার ব্যাপারে এখনো তাঁর মনে দ্বিধা রয়ে গেছে। টেলি-বম এমন একটা গোপনীয় ব্যাপার, এর সাথে রাশিয়ার জীবন-মরণ প্রশ্ন জড়িত, রানার মতো বিদেশী একজন স্পাইকে সব কথা জানানো কি উচিত হচ্ছে? সব জ্ঞানার পর রানা যদি সাহায্য করতে রাজি না হয়?

কর্নেলকে ইতস্তত করতে দেখে মনে মনে রাগলেও জেনারেলের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। তাড়াতাড়ি নিজেই শুরু করলেন তিনি, ‘শেষ খাতাটা এখানে ছিলো। একটা বার্গলার-প্রুফ

ভন্টে, ওটায় কে. জি. বি.-র গুরুত্বপূর্ণ টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট রাখা হয়। সম্ভাব্য সব রকম আধুনিক অ্যালার্ম আর সিকিউরিটি ডিভাইস থাকা সত্ত্বেও ভন্ট থেকে কিছু ডকুমেন্ট চুরি গেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে টেলি-বম বুক।’

‘কিভাবে?’ রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো রানা।

জেনারেল কায়কোভস্কি হয় এতো বেশি ভয় পেয়েছেন নয়তো এতো বেশি রেগে গেছেন যে কথাই বলতে পারলেন না। জ্বলন্ত চুরুটের লালচে ডগার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন তিনি।

সরাসরি নয়, একটু ঘুরিয়ে রানার প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল বিকারেন, ‘খাতাটা কে চুরি করেছে আমরা তা আন্দাজ করতে পারি।’

‘কে?’

‘তার নাম নিকোলাই ডালচিমস্কি—এখানকার একজন ডকুমেন্টস এক্সপার্ট। আমাদের বিশ্বাস পালাবার সময় ওটা নিয়ে গেছে সে। এপ্রিল মাসের ঘটনা।’

‘হঠাৎ পালালো কেন?’

‘সম্ভবত বুঝতে পারে তার গ্রুপটা ধরা পড়তে যাচ্ছে...।’

‘সি. আই. এ.?’

‘না, স্ট্যালিনিষ্ট। জেনারেল সেক্রেটারী সহ আরো অনেক লোককে খুন করার প্ল্যান করেছিল ওরা।’

‘গুড গড!’

‘কয়েকটা পাসপোর্ট আর বিদেশে আমাদের একটা ব্যাংকের সিকিউরিটি ও অ্যালার্ম সিস্টেমের ড্রইং-ও নিয়ে গেছে ডালচিমস্কি।



নিয়ে গেছে মানে সে অদৃশ্য হবার পর থেকে ওগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাংকটা থেকে বেশ কিছু মার্কিন ডলারও ডাকাতি হয়েছে। ছ'জন গার্ডকে খুন করা হয় ওখানে।’

‘তারমানে নৈতিক কোনো বাধা নেই তার মনে,’ বললো রানা।  
‘কি চায় সে?’

‘জানায়নি। যোগাযোগ করেনি।’

‘আপনাদের ধারণা জানতে চাইছি।’

‘লোকটা পাগলা কুকুর হয়ে গেছে, মিঃ রানা,’ শুরু করলেন কর্নেল।

তাকে বাধা দিয়ে জেনারেল বললেন, ‘চিরকাল তাই ছিলো, কিন্তু আমরা দেখেও দেখিনি।’

‘সেটা মেয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে, তা-ও গুজবের মতো শোনাতো—কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারেনি।’

‘কি রকম?’ জানতে চাইলো রানা।

‘তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না,’ বললেন কর্নেল। ‘ডালচিমস্কি মেয়েদের ওপর নাকি অত্যাচার করতো। তার সহকারিণীরা কেউই তার সাথে বেশিদিন কাজ করতে পারতো না। স্যাডিস্ট ক্যারেক্টার বলতে পারেন।’

জেনারেল বললেন, ‘সেক্স ম্যানিয়াক।’

‘সে তাহলে পাসপোর্ট আর টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে...।’

‘সাথে করে নিয়ে গেছে টেলি-বর্ম খাতাটা,’ বললেন কর্নেল বিকারেন।

‘আমাদের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে আমেরিকায় রয়েছে সে, মিঃ রানা। ছটো ব্যাপারে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই, কারণ আমরা

জানি। ব্যাংক ডাকাতির পর টেলি-বমদের নামগুলো চেক করি আমরা, কমপিউটরের সাহায্যে। জানতে পারি, পয়লা জুনে একটা মার্কিন আমি কেমিক্যাল ও অরফেয়ার ঘাটিতে গুলি খেয়ে মারা যায় এলিস খেলার—মিশন কমপ্লিট করার পর। ওখানে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়াল এজেন্ট থাকার কথা, কিন্তু ছিলো না। তারপর খবর পেলাম অগাস্টার জেট ফাইটার বেসে বড়সড় একটা আগুন লেগেছে—যেদিন লিজা আইভারসন নিখোঁজ হয়।’

‘তারমানে আপনাদের হিউম্যান টাইম বোমাগুলোকে এক এক করে...।’

দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল। ‘হ্যাঁ, ফাটিয়ে দিচ্ছে।’

জেনারেলের দিকে তাকালো রানা। ভদ্রলোক চোখে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে আছেন ওর দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর প্রশ্নটা করলো রানা, ‘আপনারা ঠিক কি চান আমার কাছ থেকে?’

কঠিন একটা প্রশ্ন, সাথে সাথে জবাব দিতে পারলেন না জেনারেল কায়কোভস্কি। প্রথম থেকেই তিনি জানতেন, বি. সি. আই.-এর সাহায্য পেতে হলে তিনটে বাধা উপকাতে হবে তাঁকে। প্রথম বাধা ছিলো, বন্ধু মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে রাজি করানো। প্রায় একমাস ধরে তাঁর সাথে গোপনে এ-ব্যাপারে আলোচনা করেছেন তিনি। তারপর যখন সাহায্যের আবেদনটা প্রকাশ্যে জানানলেন, আচমকা বেঁকে বসলেন রাহাত খান। বি. সি. আই. চীফ অজুহাত দেখালেন, অন্য কোনো এজেন্টকে চাইলে ভেবে দেখতে পারি—যদিও কথা দিচ্ছি না—কিন্তু মাসুদ রানাকে হাতছাড়া করা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে নিয়ে আমার অন্য রকম প্ল্যান আছে। সবশেষে তিনি তাঁর রুশ বন্ধুকে

বললেন, ‘তুমি তো জানোই আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু হয়ে যাবার আগে কিছু কিছু দায়িত্ব ওকে বুঝিয়ে দিতে চাই আমি...।’

কথা শুনে জেনারেল কায়কোভস্কি বন্ধুর ওপর সাংঘাতিক চটে গেলেন। ‘এ তোমার একটা খোঁড়া অজুহাত, রাহাত। তুমি আমার সমস্যাটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছো না। বাইরের সাহায্য কেন দরকার হচ্ছে আমাদের, সেটা তুমি বুঝেছো কি?’

‘হ্যাঁ, স্ট্যালিনিষ্ট বিদ্রোহীরা যারা ধরা পড়েনি তাদের মধ্যে অনেক কে. জি. বি. এজেন্ট আছে বলে সন্দেহ করছো তোমরা,’ বললেন রাহাত খান। ‘তাদের পরিচয় তোমার জানা নেই, তাই বিশ্বাস করে এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টটা তাদের কারও ওপর দিতে পারছো না—এই তো? কিন্তু আরো তো মিত্র দেশ আছে তোমাদের, তাদের ইন্টেলিজেন্স।’

রাহাত খানকে থামিয়ে দিলেন জেনারেল, ‘তুমি প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছে। আমরা বি. সি. আই.-কে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কে. জি. বি. আজ যে বিপদে পড়েছে মাত্র ক’দিন আগে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসও সেই একই ধরনের বিপদে পড়েছিল—তোমরা উৎসাহের সাথে তাদের সাহায্য করেছো। করোনি?’

‘হ্যাঁ, মানে—করেছি।’

‘তোমরা আমেরিকাকে হর-হামেশা সাহায্য করছো—করছো না?’

‘হ্যাঁ...।’

‘রাহাত, স্বাধীনতা যুদ্ধে কে তোমাদের সাহায্য করেছিল?’

প্রাইভেট টেলিফোনের অপরপ্রান্তে রাহাত খান চুপ করে থাক-

লেন কিছুক্ষণ । তারপর তিনি জানতে চাইলেন, ‘রানা ছাড়া আর কাউকে হলে চলে না তোমাদের ?’

‘না ।’

‘ঠিক আছে, দেখি কতো দূর কি করতে পারি... ।’

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি জানতে চাইলেন, ‘ইয়েস অর নো ?’

চটে গেলেন রাহাত খান । বললেন, ‘ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে— না ? একটু সময় তো দেবে । বুঝতে পারছো না কেন, রানার নিজস্ব একটা মতামত আছে... ।’

‘তুমি অর্ডার করলে তার আবার কি বলবার থাকে ?’

‘কথাটা তোমার মুখে মানালো না, লুদভিক,’ ঝাঁঝের সাথে বললেন রাহাত খান । ‘বিশেষ করে রানা সম্পর্কে যখন অনেক কিছুই জানো তুমি । ওকে আমি হুকুম করতে পারি, হুকুম মানবেও সে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা সেরকম নয় । ওর ব্যক্তিগত মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি । তাছাড়া, হুকুম করবো কোন বুদ্ধিতে ? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এ এমন একটা অ্যাসাইনমেন্ট রানার যেখানে করার কিছুই থাকবে না । কোথায় কোন্ এক ম্যানিয়াক আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে রানা খুঁজে বের করবে কিভাবে, বিশেষ করে তোমরা যখন তেমন কোনো সূত্রও দিতে পারছো না ?’

‘বুঝলাম, তুমি সন্দেহ করছো, রানা অ্যাসাইনমেন্টটা নিতে রাজি হবে না,’ বললেন জেনারেল । ‘ঠিক আছে, ওকে তুমি শুধু মস্কোয় পাঠিয়ে দাও, রাজি করানোর দায়িত্ব আমাদের ।’

এভাবে প্রথম বাধাটা উপকালেন জেনারেল কায়কোভস্কি ।

দ্বিতীয় বাধা ছিলো কে. জি. বি. অফিসাররা। সবাইকে নিয়ে গোপন বৈঠকে বসলেন তিনি। প্রথমে আলোচনা হলো অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব কে. জি. বি. এজেন্টদের দেয়া উচিত হবে কিনা তাই নিয়ে। প্রায় সবাই একবাক্যে জানালো, এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয়। কারণ, হয়তো দেখা যাবে, যাকে বিশ্বাস করে কাজটা করতে দেয়া হয়েছে সে বিদ্রোহীদেরই একজন। সেক্ষেত্রে আরেকজন ডাল-চিমস্কির জন্ম দেয়া হবে মাত্র। না, যতো দিন না বিদ্রোহীদের সবার পরিচয় জানা যায় ততোদিন রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো অ্যাসাইনমেন্ট কে. জি. বি. এজেন্টদের দিয়ে করানো ঠিক হবে না।

এরপর আলোচনা হলো, বিদেশী কোন্ ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য চাওয়া যায় তাই নিয়ে। প্রথমেই, মৃত্ত কঠে, সরাসরি বি. সি. আই. এজেন্ট মাসুদ রানার নামে প্রস্তাব রাখলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। তুমুল হৈ-চৈ শুরু হলো। কে. জি. বি.-র প্রথম সারির কর্মকর্তারা সবাই মাসুদ রানার পরিচয় জানেন। তার সাহায্য নিতে কেউ তাঁরা রাজি নন।

কেন রাজি নন, এ-প্রশ্ন আর তুললেন না জেনারেল কায়কোভস্কি। মিত্র দেশের আরো চার-পাঁচ জন এজেন্টের নাম বললেন তিনি। একেক বার একেক জনকে নিয়ে আলোচনা হলো।

একজন আফগান এজেন্টের পক্ষে প্রস্তাব তুললেন কর্নেল বিকারেন। কর্নেল মুস্তাকভ জানালেন, এই আফগান যুবক জীবনে কখনো আমেরিকায় যায়নি। সাথে সাথে তার নাম বাদ পড়ে গেল।

পোলিশ এজেন্ট? আমেরিকায় বার কয়েক গেছে, বুদ্ধিমান, সাহসী, নির্লোভ—কিন্তু তার ইংরেজী তেমন চোস্ত নয়। বাদ।

চেকোশ্লাভ স্পাই ? সব দিক থেকে যোগ্য সে । ভালো ইংরেজী জানে, চেহারাও অনেকটা আমেরিকানদের মতো । আমেরিকায় গেছেও বেশ ক’বার । সবাই বললো, একে দিয়েই কাজ উদ্ধার হবে । রাশিয়ার হয়ে দু’একটা অ্যাসাইনমেন্ট আগে করেছে । তাকে বিশ্বাস করা যায় । কিন্তু জেনারেল কায়কোভস্কি সবাইকে হতাশ করলেন । জানালেন, তোমরা যার কথা আলোচনা করছো সে এখন হাসপাতালে । রোড অ্যাক্সিডেন্ট ।

বিখ্যাত এক যুগোশ্লাভ লন টেনিস স্টারকে নিয়েও আলোচনা হলো । কিন্তু আমেরিকায় খেলার মধ্যে রয়েছে সে, সেখান থেকে ডেকে আনলে লোকের সন্দেহ হবে । প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে তার ফাইনালে খেলার ।

আরো এক ঘণ্টা কাটলো, সবাই যখন হতাশ আর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নতুন করে আবার রানার নামটা তুললেন জেনারেল কায়কোভস্কি । বললেন, ‘ওর সাহায্য নিতে কার কি আপত্তি আছে শোনা যাক ।’

প্রথম আপত্তি জানালেন কর্নেল বিকারেন, ‘রানা আমেরিকান আর ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করে... ।’

‘তার কারণ আমেরিকা আর ব্রিটেন তার সাহায্য চায়,’ বললেন কে. জি. বি. চীফ । ‘আমরা বিশেষ চাই না, কিন্তু চাইলে পাই না, একথা সত্য নয় । বেশ কয়েকবার আমরা তার সাহায্য পেয়েছি অতীতে ।’

‘কিন্তু এ-কথা তো ঠিক যে ওদের হয়ে কাজ করতে করতে ওদের একজন হয়ে গেছে রানা,’ বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর । ‘আমরা তাকে গোপন কিছু জানালে সে হয়তো আমেরিকা বা ব্রিটেনের কাছে

ফাঁস করে দেবে ।’

‘রানার বিরুদ্ধে এ-ধরনের কোনো রেকর্ড আছে বলে শুনিনি । হয়তো আপনারা ভালো বলতে পারবেন ।’

অপেক্ষায় থাকলেন জেনারেল, কিন্তু কেউ কোনো রেকর্ডের কথা বলতে পারলেন না । ‘আর কি অভিযোগ ?’

কর্নেল মুস্তাকভ বললেন, ‘রাশিয়ার স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেছে রানা, রেকর্ড আছে ।’

‘কি শুনি ?’ আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল কায়কোভস্কি ।

‘রাশিয়া থেকে মিং-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে যার সে... ।’

‘তা না হলে ওটা ইসরায়েলিরা নিয়ে যেতো, সেটা ঠেকাবার জন্যে কাজটা করে রানা,’ ধমকের সুরে বললেন জেনারেল । ‘রেকর্ড পত্রে যে অভিযোগই থাক, তা সত্যি নয় । সে-সময় যিনি কে. জি. বি. চীফ ছিলেন তিনি তাঁর নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে সমস্ত দোষ রানার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন—আমার ধারণা ছিলো, এ-সব আপনারাও জানেন ।’

কর্নেল বিকারেন বললেন, ‘যে-সব কারণে অন্যান্য এজেন্টরা বাদ পড়লো, সেই একই কারণে মাসুদ রানাও বাদ পড়তে পারে । সে কোথায় আছে আমরা জানি না, এই মুহূর্তে নিজেদের কোনো কাজে ব্যস্ত কিনা তাও আমাদের জানা নেই... ।’

এতো সহজে দ্বিতীয় বাধাটা টপকাতে পারবেন, ধারণা ছিলো না জেনারেল কায়কোভস্কির । মূহু হেসে তিনি বললেন, ‘রাহাত খানকে আগেই আমি রাজি করিয়েছি । রানা কোথায় আমি জানি । ডাকলেই মস্কোয় চলে আসবে সে । কিন্তু কাজটা করতে রাজি হবে

কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রসঙ্গ ।’

রানাকে রাজি করানো, তৃতীয় এবং শেষ বাধা । এই মুহূর্তে সেই বাধার সামনেই পড়েছেন জেনারেল কায়কোভস্কি ।

রানার প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল বললেন, ‘আমরা চাই, ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করুন আপনি, মিঃ রানা ।’

‘খুঁজে বের করুন, এবং খুন করুন,’ হিংস্র ভঙ্গিতে যোগ করলেন কর্নেল বিকারেন ।

‘আর খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে দিন আমাদের ।’ পাকা চুলে আঙুল চালালেন জেনারেল । ‘সময় নেই, মিঃ রানা, সময় নেই । দেরি করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে ডালচিমস্কি !’

রানার চোখে পলক পড়ছে না ।

কর্নেল ভাবছেন, রানা যদি আমেরিকানদের হাতে ধরাও পড়ে, রাশিয়া অস্বীকার করে বলবে, তার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না ।

জেনারেল ভাবছেন, ডালচিমস্কি এভাবে যদি একের পর এক টেলি-বম ফাটাতে থাকে, আমেরিকা জানবে বিনা উস্কানিতে রাশিয়া তাদেরকে ধ্বংস করার প্ল্যান করেছে । পাণ্টা আঘাত হানবে তারা... ।

‘আপনারা আমাকে সংখ্যা জানাননি,’ বললো রানা । ‘আপনাদের ক’জন ডীপ-কভার এজেন্ট রয়েছে আমেরিকায় ?’

কর্নেল বিকারেন তাড়াতাড়ি বললেন, ‘অনেক... এই ধরুন ত্রিশ-চল্লিশ জনের মতো ।’

‘একশো ছত্রিশ জন, আনাতোলি,’ মুহূর্তেই স্মরণের সুরে বললেন জেনারেল । ‘গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে, একশো ছত্রিশ জন ।’



‘ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করতে পারলে এদের ব্যাপারে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না,’ শুরু করলেন কর্নেল বিকারেন। ‘টেলিফোনে কোড সিগন্যাল না পাঠালে ওরা কেউ বিপজ্জনক নয়...।’

‘একান্ত যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে ওদের নাম-ঠিকানা আপনাকে জানানো যেতে পারে।’ একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে ওর মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘আপনার উদারতার জন্যে ধন্যবাদ, জেনারেল,’ তিক্ত কণ্ঠে বললো রানা। ‘কিন্তু জানেন তো, অনেকগুলো রাজ্য নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দুশো বিশ মিলিয়ন মানুষ বাস করে তিন মিলিয়ন স্কয়ার মাইলের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে—বলতে পারেন, আপনাদের ডালচিমস্কিকে কোথায় আমি খুঁজবো?’

ওঁরা কেউ জবাব দিলেন না।

‘আপনারা বোধহয় ধরে নিয়েছেন আমি একজন জাহ্নকর, জেনারেল।’

প্রসঙ্গটা আপাততঃ কৌশলে এড়িয়ে গেলেন কে. জি. বি. চীক। হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘শুকনো আলাপ আর কতোক্ষণ, আনাতোলি?’ হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। ‘লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে? কাউকে ডাকো, লাঞ্চটা এখানেই সেরে নিই। ঠিক আছে, মিঃ রানা?’

ঝট করে রানার সামনে সিগারেটের একটা প্যাকেট ধরলেন কর্নেল বিকারেন। রানার প্রিয় ব্র্যাণ্ড। ‘ততোক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিন, মিঃ রানা।’

তবু রানা হাসতে পারলো না।

# পাঁচ

---

রানাকে মস্কায় পাঠাবার আগে মেজর জেনারেল রাহাত খান বলে দিয়েছেন, বড় কোনো বাধা না থাকলে কাজটা ওদের করে দিয়ো।

কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে জেনারেল আর কর্নেলের সাথে লাঞ্চ খেতে বসে গোটা ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখলো রানা। বড় কোনো বাধা এখন পর্যন্ত দেখছে না ও। কিন্তু তবু কাজটা নিতে মন চাইছে না ওর। বিশাল মরুভূমিতে একটা পিন হারিয়ে গেলে সেধে কে সেটা খোঁজার দায়িত্ব নিতে চায়?

ডালচিমস্কি যে সত্যি সত্যি গুরুতর একটা হুমকি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের একশো ছত্রিশটা সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করে দিতে পারে সে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কিভাবে, কোথেকে তাকে খুঁজে বের করবে রানা?

তারপর ভাবলো, সে যদি কাজটা না করে তাহলে কি হবে? বসের বন্ধু, কে. জি. বি. চীফ অসন্তুষ্ট হবেন। অন্য কারো ঘাড়ে চাপানো হবে অ্যাসাইনমেন্ট। তাকেও এই একই সমস্যায় পড়তে হবে—কোথায় খুঁজবে সে ডালচিমস্কিকে? খুঁজে বের করতে হলে

বহু লোককে ডালচিমস্কি এবং টেলি-বমের কথা বলতে হবে, এবং ভুল লোককে বললে এফ. বি. আই. বা সি. আই. এ. টের পেয়ে যাবে ব্যাপারটা। রুশ এজেন্ট যদি ধরা পড়ে, আমেরিকানরা তার কাছ থেকে ঠিকই একশো ছত্রিশ জনের নাম-ঠিকানা আদায় করে নেবে।

একশো ছত্রিশ জন নিরীহ মানুষ। তারা জানে না তারা ডীপ-কভার এজেন্ট। চোদ্দ বছর ধরে সুন্দর, শান্তিময় জীবনযাপন করছে সবাই। কেউ কেউ বিয়ে করেছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে। হঠাৎ টেলিফোনে একটা কোড সিগন্যাল পেয়ে হয়ে উঠবে মূতিমান বিভীষিকা, শুরু করে দেবে ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞ। তারা নিজেরাও প্রায় সবাই মারা পড়বে।

মনে মনে শিউরে উঠলো রানা। অন্তত এই একশো ছত্রিশ জনের কথা ভেবে কাজটা নেয়া উচিত ওর। এদের বাঁচানো সম্ভব হলে বড় একটা মানবিক কাজ করা হবে।

লাঞ্চার পর কফির কাপে চুমুক দিয়ে রানাই নতুন করে প্রসঙ্গটা তুললো, ‘আমেরিকায় আপনাদের অনেক এজেন্ট আছে, আমি কি প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নিতে পারবো?’

মনে মনে ভারি খুশি হলেও জেনারেল কায়কোভস্কির চেহারায় কোনো ভাব ফুটলো না। রানার কথাতেই বোকা গেছে, সে রাজি। ‘কিন্তু আমি যতোদূর জানি,’ অবাক সুরে বললেন তিনি, ‘আপনি একা কাজ করতে পছন্দ করেন, মিঃ রানা?’

‘তা করি,’ বললো রানা। ‘কিন্তু অল্প সময়ে ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করা আমার একার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে।’

‘দেশে বা দেশের বাইরে পরিস্থিতি এখনো নাজুক, মিঃ রানা।

স্ট্যালিনপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের কথা নিশ্চয়ই আপনি আপনার বসের মুখ থেকে শুনেছেন... ।’ অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল ।

কর্নেল বললেন, ‘কে. জি. বি. এজেন্টদের সাহায্য নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না । তারচেয়ে এফ. বি. আই.-এর সাহায্য চাওয়াও বোধহয় ভালো ।’ বোঝা গেল এটা তাঁর রাগ আর ক্ষোভের কথা ।

‘আমার বিশ্বাস আরো বেটার কোনো আইডিয়া আপনি পেয়ে যাবেন, মিঃ রানা,’ আস্থা প্রকাশ করলেন জেনারেল । ‘আমরা চাই না আপনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানুক । এবং আপনাকে সব ক’থা জানানোর আগে আমরা চাইবো, একটা দাঁতের ভেতর আপনি সায়ানাইড পিল রাখবেন ।’

‘কেন ?’

‘আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি, মিঃ রানা,’ আন্তরিকতার সাথে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি । ‘বিশ্বাস করি, আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়লেও সহজে আপনি মুখ খুলবেন না । কিন্তু সব মানুষেরই রেজিস্ট্র্যান্সের একটা সীমা আছে । ওদের ইন্টারোগেশন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানি । যে-কোনো মানুষকে ওরা কথা বলাতে পারে ।’

‘আপনারা চান ধরা পড়লে আমি আত্মহত্যা করবো ?’

‘চাই এবং জানি আপনি তা করবেন । জানি বলেই আপনার সাহায্য চেয়েছি আমরা, মিঃ রানা । সম্ভব হলে আজই অপারেশন করে আপনার একটা দাঁত তোলা যেতে পারে, তার জায়গায় নতুন একটা... ।’

‘সায়ানাইড পিল সহ কৃত্রিম একটা দাঁত আমার আছে,’ বললো

রানা ।

রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা ।  
তারপর মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল কায়কোভস্কি । ‘ওউ ।’

‘আপনি সরাসরি কে. জি. বি. রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করবেন,  
মিঃ রানা,’ বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর ।

‘অধীনে মানে ?’ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো রানা ।

তাড়াতাড়ি রানার দিকে আরেকবার সিগারেটের প্যাকেটটা  
বাড়িয়ে দিলেন কর্নেল বিকারেন । ‘মানে যোগাযোগ রাখবেন আর  
কি ! দরকার হলে আপনাকে তিনি পরামর্শ দেবেন, আপনি তাঁর  
কাছে রিপোর্ট করবেন... ।’

মাথা নাড়লো রানা । ‘আমি স্বাধীনভাবে কাজ করবো,’ শান্তভাবে  
বললো ও ।

কর্নেল এবং জেনারেল দৃষ্টি বিনিময় করলেন ।

‘আপনাদের জানার কথা, ফিল্ড কারো অধীনে আমি কাজ করি  
না,’ আবার বললো রানা । ‘আমার ওপর আপনাদের পুরোপুরি  
বিশ্বাস না থাকলে... কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলো  
ও ।

‘ব্যাপারটা ঠিক তা না, মিঃ রানা,’ বললেন বিকারেন । ‘ভেবে  
দেখুন না... ।’

‘ভেবে দেখার দরকার নেই, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে । আপনারা  
চাইছেন কে. জি. বি. রেসিডেন্ট আমার ওপর নজর রাখুক, আমাকে  
নিয়ন্ত্রণ করুক । কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থেই আমি কারো সাথে  
যোগাযোগ রাখতে চাই না ।’

‘প্লিজ, মিঃ রানা !’ আবেদনের সুরে বললেন কর্নেল । ‘আপনি

কতদূর এগোলেন, আপনার সাহায্য দরকার আছে কিনা, এ-সব আমাদের জানতে হবে না ?’

‘সেক্ষেত্রে মস্কো থেকে রেডিওর মাধ্যমে সরাসরি আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ।’

‘কিন্তু ভেবে দেখুন ...।’

‘ভেবে আপনারা দেখুন । আমি চাই না কে. জি. বি. রেসিডেন্ট জানুক আমি কোথায়, কখন, কি চেহারা নিয়ে আছি ।’

আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন ওঁরা । কর্নেলের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল ।

‘ঠিক আছে, তাই হবে,’ রানার প্রস্তাব কবুল করে বললেন কর্নেল ।

তার কথা শেষ হতে না হতে জেনারেল বললেন, ‘তবে, আমাদের একজন এজেন্ট আপনার সাথে থাকবে । প্লিজ, মিঃ রানা, আমাকে আগে শেষ করতে দিন । আপনার কোনো ব্যাপারে ভুলেও নাক গলাবে না সে । প্রয়োজনে যে-কোনো কাজে তাকে আপনি নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে পারবেন । মেয়েটা খুবই স্মার্ট এবং বিশ্বস্ত । একেবারে একা থাকবেন, একজন সঙ্গিনী থাকলে মন্দ কি ?’

এক সেকেণ্ড চিন্তা করে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘কিন্তু যদি দেখি আমার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাকে আমি বাদ দিতে পারবো তো ?’

‘অবশ্যই, অবশ্যই বাদ দিতে পারবেন,’ সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন জেনারেল । ‘বিশ্বস্ত, কিন্তু তবু তাকেও আপনি সব কথা বলবেন না—টেলি-বমের কথা তো নয়ই । জানি, একা কেন, এক হাজার

লোকের পক্ষেও কাজটা কঠিন। কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই, মিঃ রানা। ডালচিমস্কি এবং টেলি-বয় সম্পর্কে আপনাকে না জানালেই নয়, তাই জানাচ্ছি। আর কাউকে জানানোর খুঁকি আমরা নিতে পারি না।’

একটু অনামনস্ক হয়ে পড়লো রানা। বিড়বিড় করে বললো, ‘মিশনটা পাগলামি ছাড়া কি বলুন! রাজি হচ্ছি শুধু ওই একশো ছত্রিশ জনের কথা ভেবে...।’

তাড়াতাড়ি অণু প্রসঙ্গে চলে গেলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। আমাদের প্রিমিয়ারের কাছ থেকে টেলি-বয় বুকটা আনানো হয়েছে, মিঃ রানা। অণু কাগজ-পত্র সহ পাশের কামরায় আপনার জন্যে রাখা আছে সেটা।’

‘আর তিন নম্বর কপিটা?’ জানতে চাইলো রানা। ‘যেটা রেড আমি চীফের সেফে আছে? আপনারা বলেছেন, গ্রু-র লোকজন পাহারা দেয় ওটাকে।’

‘আপনি বোধহয় আসলে জানতে চাইছেন আমাদের মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ডালচিমস্কির ব্যাপারটা জানে কিনা, তাই না, মিঃ রানা?’

ছোট করে মাথা ঝাঁকালো রানা। গম্ভীর। ‘হ্যাঁ।’

খুব সাবধানে উত্তর দিলেন জেনারেল, ‘ওরা এখনো কেউ কিছু জানে না। জানার পর কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই আমাদের সাথে পরামর্শ করবে। মোট কথা, ওদের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবার কোনো দরকার নেই আপনার।’

‘কখন রওনা হচ্ছি আমি?’ চেয়ার ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘কাল সকাল পাঁচটায় আপনাকে হোটেল থেকে তুলে নেয়া

হবে ।’

পাশের কামরার দরজার দিকে এগোলো রানা, কর্নেল বিকারেন ওর পাশেই রয়েছেন । পিছন থেকে জেনারেল কায়কোভস্কি আবার বললেন, ‘সাথে ব্যাগ-ট্যাগ নেয়ার দরকার নেই, মিঃ রানা ।’

দরজার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালো রানা । ‘লাগেজ ছাড়া কেনেডি এয়ারপোর্টে নামলে লোকে সন্দেহ করবে না ?’

‘আপনি কেনেডি এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন না । গুডবাই, কমরেড, অ্যাণ্ড গুড হাষ্টিং ।’

দরজা খুলে ধরলেন কর্নেল, পাশের কামরায় ঢুকে পড়লো রানা ।

ডেস্কের কাছে ফিরে এসে কর্নেল বিকারেন জেনারেলকে বললেন, ‘কি যে ঘটতে যাচ্ছে জানি না । একেবারে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়া কি উচিত হচ্ছে ?’

‘ওকে দিয়ে কাজটা করাতে হলে,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন জেনারেল, ‘এছাড়া উপায় নেই । মেয়েটাকে সব কথা জানানোর ঝুঁকি সত্যি আমরা নিতে পারি না ।’

‘কিন্তু রানার গতিবিধি সম্পর্কে রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করতে পারবে না সে ?’

‘পারবে, তবে উচিত হবে না । আসলে নির্ভর করবে মেয়েটার ওপর ।’ নতুন একটা রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট ধরালেন জেনারেল । ‘কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা, আনাতোলি ।’

‘বলুন ।’

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থেকে জেনারেল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । ‘মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের সাথে আমরা কোনো পরামর্শ



করলাম না। গ্রু-র ( জি. আর. ইউ. ) নতুন চীফ টেলি-বম সম্পর্কে কতোটুকু কি জানে ঠিক বলতে পারছি না। তবে ডালচিমস্কি যে আমাদের খাতাটা নিয়ে পালিয়েছে, এ-কথা এখনো বোধহয় তার জানা নেই...।’

‘আমেরিকায় যা ঘটছে সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই রিপোর্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক। হয়তো নতুন বলেই তার সাথে টেলি-বমের সম্পর্কটা দেখতে পাচ্ছেন না।’

‘যতো নতুনই হোক, আরো দু’একটা ঘটনা ঘটলে ঠিকই টের পেয়ে যাবে। তখন যে কি ঘটবে তাই ভাবছি।’

‘যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে, জেনারেল কমরেড,’ বললেন কর্নেল। ‘এখন রানার ব্যাপারটা ভাবুন। ও কি পারবে? ধরুন, ডালচিমস্কিকে যদি ধরতে না পারে...।’

‘কাজটা কঠিন নয়, আনাতোলি, অসম্ভব—অস্তুত আমি তাই বিশ্বাস করি।’ চোখ বুজে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ‘সেজগ্গেই রানা রানা করে জান দিচ্ছিলাম। যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে। এ-ও আমার একটা বিশ্বাস। কোনো সূত্র নেই, কারো কোনো সাহায্য নেয়া যাবে না...,’ এদিক ওদিক মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি।

‘ট্রিপটা সম্পর্কে সব কথা ওকে বললেই বোধহয় ভালো হতো...।’

‘বলবে বৈকি, তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে...।’

‘কিন্তু আমাদের প্ল্যান যদি পছন্দ না করে? যদি বেকে বসে?’

‘বেঁকে বসবে না,’ এতোক্ষণে হাসি দেখা গেল জেনারেলের মুখে। ‘শুনলে না কি বললো? শুধু একশো ছত্রিশজনের কথা ভেবে

যেতে রাজি হয়েছে । ওর ডোশিয়ে পড়োনি ? মানবিক দিকগুলো খুব বড় করে দেখে... ।’

‘তাহলে তো ওর ঘাড়ে আমরা জোর করে রেসিডেন্টকে চাপিয়ে দিতে পারতাম !’

‘তা পারতাম না,’ বললেন জেনারেল । ‘এ-ধরনের ব্যাপারে আপোষ করা ওর ধাতে নেই ।’

গম্ভীর চেহারা নিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন কর্নেল বিকারেন । ‘আমি আমেরিকানদের কথাও ভাবছি, জেনারেল কমরেড ।’

‘হ্যাঁ, আমিও ওদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি । ঘটনাগুলো যে অ্যান্ড্রিডেন্ট নয়, আগে বা পরে ঠিকই ওরা বুঝে ফেলবে । তখন কি হবে ? কি করবে ওরা ?’

মোটামুটি তিন হাজার চারশো বাষট্টি মাইল দূরে—যদি পোলার রুট ধরে হিসেব করা হয়—টি এইট্টি-থ্রি নামে পরিচিত বিন্ডিঙের তিন তালায় বসে চুরুট ফুঁকছে মেজর জেফ অ্যাডামস । এ-ধরনের আরো অনেক বিন্ডিং আছে, সবগুলোকে টেমপো বলা হয়, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল এগুলো, তার মধ্যে আজও কয়েকটা খাড়া হয়ে আছে । ভার্জিনিয়ার এই টেমপোটা এয়ারফোর্স দখল করে আছে, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন-এর কয়েকটা ল্যাবরেটরি রয়েছে এখানে । জেনারেল কায়কো-ভস্কিরমতো মেজর অ্যাডামসও রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট চুরুট খায়, কিন্তু কিউবার এই চুরুট আমেরিকায় স্বাগত হয়ে আসে, ফলে রুশ জেনারেলের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিতে হয় আমেরিকান মেজরকে ।

আপনমনে মাথা ঝাঁকালো মেজর। নো-নাইন, সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

টাইমিং মেকানিজম দেখার পর জিনিসটা নিশ্চিতভাবে চিনতে পারা গেল। ফসফরাসের অবশ্য বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই, কারণ রুশ ব্লকের অনেক ইন্টেলিজেন্সই এ-ধরনের ডিভাইসে ফসফরাস কম্পাউণ্ড ব্যবহার করে। আসলে বিশেষ এই টাইমিং ডিভাইসটা শুধু মাত্র নো-নাইনেই ব্যবহার করা হয়। উনিশ শো আটান্ন সালে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো খ্যাটো হেডকোয়ার্টারে একটা মিটিঙে বসেছিল, সেই মিটিঙে এই স্যাবোটাজ ডিভাইসের নামকরণ করা হয় নো-নাইন। নো-র মানে হলো, মস্কোর পূর্ব দিকে নোগিনস্ক প্ল্যাণ্টে তৈরি করা হয়েছে অস্ত্রটা, আর নাইন শব্দটার অর্থ এই সিরিজে এর আগে আরো আটটা সংস্করণ আছে।

‘ব্যাপারটা আমি বুঝছি না,’ জেফ অ্যাডামস সরলভাবে স্বীকার করলো।

উনিশ শো সাতষট্টি সালের পর রাশিয়ার বাইরে কেউ এই নো-নাইন দেখেনি, ভিয়েতনাম যুদ্ধেও এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান হেড, মেরিল্যান্ডে নেভির এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল স্কুল রয়েছে, সেখানে শো-কেসের ভেতর এক জোড়া নমুনা দেখতে পাওয়া যায়, তাও স্রেফ ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে ওগুলো রাখা হয়েছে ওখানে।

‘আমি বুঝছি না, হয়তো অন্য কেউ বুঝবে,’ আপনমনে আবার বিড়বিড় করলো মেজর অ্যাডামস। ভাবলো, একটা রিপোর্ট লিখে পেণ্টাগনের এ-টু-তে পাঠিয়ে দেয়া যাক, ওখানে অনেক বড় বড়

মাথা আছে, তারা হয়তো রহস্যটা ভেদ করতে পারবে। কিংবা তারাও হয়তো তার মতো গালে হাত দিয়ে ভাববে, এ কিভাবে সম্ভব? অগাস্টার ফাইটার বেসে কয়েকটা নো-নাইন আসে কি করে? আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া ফুয়েল ট্যাংকের পাশেই পাওয়া গেছে ওগুলো—এলো কোথেকে?

## ছয়

---

ভোর পাঁচটায় রানাকে গাড়িতে তুলে নিলেন কর্নেল বিকারেন। কে. জি. বি. সাধারণত মস্কোভা ব্যবহার করে, তবে ছোটো একটা পোবেদা নিয়ে এলেন কর্নেল। রাজধানীর ঘুম ভাঙেনি, রাস্তা-ঘাট প্রায় নির্জন। এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পথে মাত্র দশ-বারোটা গাড়ি দেখলো রানা।

‘পুরো তালিকাটা মুখস্থ করেছেন, তাই না?’ প্রাক্তন পদাতিক জিজ্ঞেস করলেন। সাবধানী লোক তিনি, স্পীড লিমিটের চেয়ে পাঁচ কিলোমিটার কম গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন। সমস্ত ব্যাপারেই শুধু খোঁজ নিয়ে ক্ষান্ত হন না, আবার খোঁজ নেন।

‘হ্যাঁ। সবগুলো নাম, ঠিকানা, আর টেলিফোন নম্বর।’

‘গুড ।’ মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল । ‘সায়ানাইড পিলটা আরেক-বার চেক করে নিয়েছেন তো ?’

হাসি চেপে রানা বললো, ‘নিয়েছি । তবে আপনাদের এই কাজটা করতে গিয়ে মরার আশ্রয় আমার নেই ।’

‘দুঃখিত, তা ঠিক বোঝাতে চাইনি আমি, মিঃ রানা । আশা করি সে-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবে না । বঝতেই তো পারেন, আমরা খুব উদ্বেগের মধ্যে থাকবো । আপনার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকছে না । বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ঝুঁকির । আমেরিকানদের হাতে আপনি ধরা পড়তে পারেন । যদি ধরা পড়েনই, আমরা আশা করবো তালিকাটা ওরা পাবে না ।’

‘পাবে না,’ কথা দিলো রানা । ‘আমি জানি, তালিকাটা আমার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।’

তাড়াতাড়ি অস্থ প্রসঙ্গে চলে গেলেন বিকারেন, ‘মেয়েটা... মানে, খুব সুন্দরী । অন্য কিছু মীন করছি না, বলতে চাইছি, ওর সঙ্গে আপনার ভালো লাগবে । আমেরিকান মেয়ে এতো প্র্যাকটিকাল হতে পারে, ভাবা যায় না ।’

‘ভালো হতো যদি ওর সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য দিতে পারতেন...’

‘আপনাকে যা বলেছি, তার বেশি আমরা বিশেষ কিছু জানি না, মিঃ রানা,’ এয়ারপোর্টের দিকে ঝাঁক নিয়ে বললেন কর্নেল । ‘ওখানে পৌঁছে অবশ্য জানতে পারবেন, কিন্তু তাহলে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনাকে । মেয়েটার ডোশিয়ে শুধু তার কাছেই আছে ।’

সামনে ওরা হ্যাঙ্গারের ছাদ দেখতে পেলো ।

‘আমার সীটটা জানালার ধারে হলে ভালো হয়,’ অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে বললো রানা।

হেসে ফেললেন কর্নেল। ‘আপনার জন্তে তারচেয়ে ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিঃ রানা। আপনার পছন্দমতো যে-কোনো জানালার ধারে বসতে পারবেন।’

বড়সড় ইলিউশিন জেটে উঠে রানা আবিষ্কার করলো, কর্নেল ঠাট্টা করেননি। প্লেনে আর কোনো আরোহী নেই। গোটা প্লেনটা রানা আর ওর লাগেজের জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়েছে। দু’সারি সিটের মাঝখানের প্যাসেজে দুটো লেদার স্যুটকেস দেখলো রানা, সম্ভবত আমেরিকান কাপড়চোপড় আর অতিরিক্ত কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে ওগুলোয়। একটা স্যুটকেসের গায়ে দু’প্রস্থ টেপ দিয়ে এক্স অক্ষরটা তৈরি করা হয়েছে।

কেবিন লাউডস্পীকার ঘরঘর করে উঠলো, তারপরই একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘তিন মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করবো আমরা।’ চোখ তুলে তাকালো রানা। যেন হঠাৎ করে আবিষ্কার করলো, প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে কোথাও স্টুয়ার্ড বা স্টুয়ার্ডেস নেই। সম্পূর্ণ একা সে। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আয়োজনটা এমন ভাবে করা হয়েছে এয়ারপোর্টের কোনো কর্মী বা প্লেনের কোনো ক্রু যাতে ওর চেহারা দেখতে না পায়। সিকিউরিটি, সন্দেহ নেই।

সাবলীল ভঙ্গিতে টেক-অফ করলো জেট, একবার চক্রর দিয়ে পশ্চিম মুখো হলো। বিশ মিনিট পর আবার শোনা গেল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, ‘বারো নম্বর সিটে দুটো থার্মোস কনটেইনার আর একটা ফুড বক্স আছে।’

থার্মোস কনটেইনারে চা আর কফি পাওয়া গেল। ফুড বক্সে স্যাণ্ডউইচ আর সীল করা একটা এনভেলাপ। এনভেলাপের ভেতর থেকে বেরুলো আমেরিকান সিগারেট, ম্যাচ-বক্স, আর একটা চিঠি। কফি খেয়ে চিঠিটা পড়লো রানা। তথ্য এবং পরামর্শ-গুলো মনে গেঁথে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা, বারো নম্বর সিটের অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরালো চিঠিতে। সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো ও।

ঘুম ভাঙলো তিন ঘণ্টা পর স্পীকারের ঘর ঘর আওয়াজে।

‘আপনি এখন খেয়ে নিতে পারেন। আমাদের শিডিউল ঠিক আছে, নিচে নামতে শুরু করার এক ঘণ্টা আগে আপনাকে আমরা সতর্ক করবো। বর্তমান অলটিচুড একত্রিশ হাজার ফিট, বাতাসে অস্বাভাবিক কোনো আলোড়ন নেই।’

একজোড়া স্যাণ্ডউইচের সাথে এক কাপ কফি খেলো রানা। খালি কেবিনের চারদিকে তাকালো, কাঁধ ঝাঁকালো আপনমনে, তারপর সিট ছেড়ে টয়লেটের দিকে এগোলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার ঘর ঘর করে উঠলো স্পীকার, ‘এক ঘণ্টা...আর এক ঘণ্টা পর আমরা নিচে নামতে শুরু করবো।’

এক চিহ্নিত স্যুটকেসটা খুলে প্যারাসুট বের করলো রানা। পরিচিত মডেল, আগেও কয়েকবার ব্যবহার করেছে ও। দ্বিতীয় স্যুটকেস থেকে বেরুলো স্কুবা গিয়ার। নিশ্চয়ই ওর গায়ের মাপ মতো হবে। এ-সব ব্যাপারে কর্নেল বিকারেনের ওপর ভরসা করা যায়।

হাতঘড়ি দেখলো রানা। স্যুটকেস থেকে বের করে পাশের সিটে রাখলো প্যারাসুট। গা থেকে একটা করে কাপড় খুলে ভাঁজ কর-

লো, যত্ন করে রেখে দিলো সদ্য খালি স্যুটকেসে। পরনে যখন শুধু আঙুরপ্যান্ট, কেবিনের চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে হেসে ফেললো ও। এটাই বোধহয় প্রথম এবং শেষ রেগুলার অ্যারোফ্লট ফ্লাইট, মস্কো থেকে মনট্রিঅল পর্যন্ত মাত্র একজন আরোহীকে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পরিচ্ছদটাও কোমর থেকে নামিয়ে ফেললো, দিগম্বর হয়ে নাচের ভঙ্গিতে পা ফেললো বার কয়েক। স্কুবা গিয়ার পরে একটা সিগারেট ধরালো। ঠিক মতোই ফিট করেছে, কোনো অংশই রাশিয়ায় তৈরি নয়। লেবেলে ইটালিয়ান কোম্পানীর নাম লেখা রয়েছে, সারা দুনিয়ায় ওরাই স্কুবা গিয়ার সরবরাহ করে, সবচেয়ে বড় খরিদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

‘নিচে নামতে আর ত্রিশ মিনিট। ত্রিশ। বিশেষ অলটিচ্যুডে দশ মিনিট উড়বো আমরা। দশ।’

খাটি এয়ারলাইনের ভাষা। সহজ করে সরাসরি কিছু বলা হয় না। সন্দেহ নেই, নর্থ আটলান্টিক বরাবর আঠারো শো ফিট কমানিয়াল ফ্লাইটের জ্ঞে বিশেষ অলটিচ্যুড বটে, কিন্তু কথাটা অণ্ড ভাবেও বলা যেত। একটা প্লাস্টিক ব্যাগে কোন্ট পয়েন্ট থ্রি-টু ভরে নিলো রানা, গিঁট দিয়ে মুড়লো মুখটা, তারপর সেটা আরেক-টা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরলো। দ্বিতীয় ব্যাগের মুখ একই ভাবে বন্ধ করে গোটা প্যাকেটটা শোল্ডার-পাউচে ঢুকিয়ে দিলো, বেল্ট টেনে বন্ধ করলো পাউচের গলা। এরপর ওয়াটার প্রুফ ডাইভার ওয়াচটা পরলো হাতে।

ভাগ্যে কি আছে কেউ জানে না। বিসমিল্লাতেই পটল তুলতে পারে মাসুদ রানা। অনেকগুলো যদি-র ওপর নির্ভর করেছে ওর আমেরিকায় পৌঁছানো।



যদি প্যারাস্যুট ঠিকমতো খোলে ।

যদি হারনেসের সাথে আটকানো মিনি ট্রান্সমিটারটা কাজ করে ।

যদি ওরা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পারে ।

প্ল্যানটা হলো, বড়সড় প্লেনটা আঠারো শো ফিট পর্যন্ত নামবে, তারপর যতোটা সম্ভব স্পীড কমিয়ে রানাকে লাফ দেয়ার সুযোগ করে দেবে পাইলট । দরজাটা তার দিয়ে আটকানো আছে, কাজেই কয়েক ফিটের বেশি খুলবে না, রানা লাফ দেয়ার পর দু'জন ক্রু যাতে ঠেলে আবার বন্ধ করতে পারে সেটা । দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে আবার ওপরে উঠতে শুরু করবে প্লেন, ত্রিশ হাজার ফিট উঠে বাকি পঁচাত্তর মাইল পেরিয়ে পৌঁছে যাবে কানাডিয়ান উপকূলে । মিলিটারী এয়ারক্রাফট হলে রানার জন্যে লাফ দেয়া সহজ হতো, কিন্তু মন্টি অলে রেড এয়ারফোর্সের একটা দূর পাল্লার মিলিটারী ট্রান্সপোর্ট বা বম্বারের উপস্থিতি বিপুল মাকিনী এবং কানাডিয়ান কোতূহলের উদ্বেক করতো । কাজেই ঝুঁকিটা রানার ওপর দিয়ে যাচ্ছে—প্লেনের লেজে বাড়ি খেয়ে পটল তুলতে পারে ও ।

‘নামতে আর পাঁচ মিনিট । কেবিন প্রেশার কমতে যাচ্ছে ।’

হাত দিয়ে বুক স্পর্শ করলো রানা, ভুয়া পরিচয়-পত্র ইত্যাদি সহ ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটটা নিতে ভুল করেনি । যে দরজাটা ব্যবহার করবে তার কাছাকাছি একটা সিটে বসলো ও । অনুভব করলো, প্রায় ডাইভ দিয়ে নিচে নামছে প্লেন । কানের পাশে ঝাঁ ঝাঁ একটানা শব্দ হলো—বদলে যাচ্ছে কেবিন প্রেশার ।

‘বিশেষ অলটিচ্যুডে নেমেছি আমরা...লেভেল অবস্থায় রয়েছি ...কোর্স আর শিডিউল ঠিকঠাক আছে ।’

‘ধন্যবাদ,’ বিড়বিড় করে বললো রানা, কিছু একটা বলতে পেরে অকারণেই খুশি হয়ে উঠলো মনটা।

প্রতি মুহূর্তে স্পীড কমছে প্লেনের। লাফ দেয়ার সময় প্রায় হয়ে গেছে। দ্রুত, দক্ষ হাতে প্যারাসুট পরলো ও; হারনেস আর ট্র্যাপগুলো কয়েকবার করে পরীক্ষা করে নিলো। খালি কেবিনটা আরেকবার, শেষবার দেখে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো ও। হাতল ধরে ঘোরালো ধীরে ধীরে।

দুই তৃতীয়াংশ খুলে গেল দরজা। তীব্র বাতাস বিরামহীন হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাত করছে ওকে। ঘড়ির ওপর আরেকবার চোখ বুলালো রানা।

এখনই সময়।

ঠোঁট নড়ে উঠলো, লাফ দিলো ও। লেজের সাথে ধাক্কা খেলো না। পাঁচ পর্যন্ত গুনলো। টান দিলো রিপ-কর্ডে। একটা ঝাঁকি খেলো, হুস করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে, সেই সাথে খুলে গেল প্যারাসুট।

নিচে কোল পেতে আছে সাগর। সাগরের রঙ কালচে-সবুজ। ঝপাৎ করে পড়লো রানা। ছাঁকা খেলো—হিমশীতল। রাবার স্যুট ভেদ করে কাঁপিয়ে দিলো হাড়। পা ছুঁড়ে চারদিকে পানি ছিটাতে লাগলো রানা। বিষম খেলো, লোনা স্বাদে ভরে গেল মুখের ভেতরটা, কোনো রকমে চেপে রাখলো বমি বমি ভাবটাকে। থক থক করে কাশলো বার কয়েক।

মিনি ট্রান্সমিটারের বোতাম টিপলো রানা। রিসিভারে ওর লোকেশন ধরা পড়বে। রিপের রেঞ্জ পনেরো মাইল, এর মধ্যে ওরা থাকলে হয়। স্কুবা গিয়ার পরে থাকলে কি হবে, এই কনকনে শীতে

বিশ মিনিটও বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

পুলকের এটা ঢেউ খেলে গেল সারা শরীরে। ওই তো, আধ মাইল দূরে রয়েছে ওরা—শুধু কোনিং টাওয়ারটা দেখা যাচ্ছে। রুশ সাবমেরিন। নিউক্লিয়ার। পানি কেটে এগিয়ে আসছে ওর দিকেই।

সত্যি রুশ তো ?

ওটা আরো কাছে আসার পর কোনিং টাওয়ারে এক জোড়া মাথা দেখতে পেলো রানা। মানুষের আকৃতি, কিন্তু অবয়ব দানবের। আরো কাছাকাছি আসার পর বোঝা গেল, ওদের চোখে বায়নোকিউলার রয়েছে। শীতে হি হি করছে রানা, ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের সাথে ডেকে উঠে এলো শরীরটা। মইটা কোনিং টাওয়ারের গা ঘেঁষে মাথার দিকে উঠে গেছে। মই বেয়ে খানিক দূর উঠতে হলো রানাকে, লোক দু'জন ওকে ধরে ফেললো।

রানাকে টাওয়ারে উঠিয়ে এনে এক পাশে সরে দাঁড়ালো ওরা, হ্যাচ কাভার সরালো। মই বেয়ে সাবমেরিনের ভেতরে নামলো রানা।

খোলের ভেতরটা গরম। তবু কাঁপুনি থামানো গেল না।

‘আপনি সুস্থ ?’ একজন প্রশ্ন করলো।

রানা কিছু বলার আগেই অপর লোকটা হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে মাইক্রোফোন/টেলিফোনে বললো, ‘আরোহী নিরাপদে পৌঁছেছে। হ্যাচ বন্ধ।’ প্রায় সাথে সাথে ডাইভ দিলো সাবমেরিন। একটু পর রানা যখন ক্যাপটেনের হাত থেকে ধূমায়িত কফির কাপ নিচ্ছে, ওদের বাহন তখন আটলান্টিকের সারফেস থেকে নব্বই

ফিট নিচে নেমে এসেছে।

রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরভ ব্যাপারটা দেহিতে জানলেন, কিন্তু খুব বেশি দেহিতে নয়। তাঁর মস্ত একটা গুণ, এক ঢিলে একাধিক পাখি মারতে পারেন, এবং চট করে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পান বলে অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম সব রেডি করে ফেলেন। ব্যাপারটা নিয়ে তিন মিনিট ভাবলেন তিনি, তারপরই কে. জি. বি.-র বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্রেমলিনে ডাক পড়লো, আরো আধ ঘণ্টা পর বেজার চেহারা নিয়ে হাজির হলেন জেনারেল কায়কোভস্কি আর কর্নেল বিকারেন। রেড আর্মি চীফ মার্শাল লিউ ওনায়েভ ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

মার্শাল ওনায়েভ মিষ্টভাষী নন, তাঁর ছল ফোটানো মন্তব্য আর বদ মেজাজকে ভয় পায় না এমন লোক সেনাবাহিনী বা ইন্টেলিজেন্সে নেই। ওঁদের ওপর ভয়ানক খেপে আছেন ভদ্রলোক। এমনকি অফিস কামরায় ঢোকান পর ওঁদের তিনি বসতে পর্যন্ত বললেন না।

‘টেলি-বম,’ কক্শ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি।

কে. জি. বি. অফিসাররা একযোগে মাথা ঝাঁকালেন, বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

‘স্কীমটা রাম-ছাগলের মাথা থেকে বেরিয়েছিল,’ গম গম করে উঠলো মার্শালের কণ্ঠস্বর। তিনি মাথা নাড়তে, চোখের চশমায় ঝিক করে উঠলো বিকেলের রোদ।

‘মার্শাল কমরেড, তখনকার রেড আমি চীফ অভ স্টাফ স্কীমটা অনুমোদন করেছিলেন,’ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায় ! কিংবা খবর নিলে জানতে পারবেন, বুড়ো বয়েসে নাতনীর বয়েসী কারো সাথে প্রেম করছিলেন। খানিক আগে প্রিমিয়ারের সাথে আমার কথা হয়েছে। আমার সাথে একমত হয়েছেন তিনি। কিন্তু তার আগে শুনতে চাই, এই বিপর্যয় কাটাবার জন্তে আপনারা কি করতে চাইছেন?’

‘বেঙ্গিমানকে ধরার জন্তে অত্যন্ত যোগ্য একজন এজেন্টকে পাঠানো হয়েছে...।’

‘যোগ্য এজেন্ট ? কি করে বুঝলেন সে স্ট্যালিনিষ্ট বিদ্রোহীদের একজন নয় ? ভেবেছেন কোনো খবরই আমরা রাখি না ? অস্বীকার করতে পারবেন, কে. জি. বি. চুরমার হয়ে গেছে ?’

‘সে কে. জি. বি. এজেন্ট নয়,’ ঠাণ্ডা গলায় জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন। ‘বি. সি. আই. এজেন্ট মাসুদ রানা...।’

‘অর্থাৎ তার সম্পর্কে আপনারা কিছুই জানেন না। তার ওপর আপনাদের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই।’ তারপরই বজ্রকণ্ঠে হংকার ছাড়লেন মার্শাল ওনায়েভ। ‘কি চান কি আপনারা ? দেশটাকে বিক্রি করে দেবেন ?’

জেনারেল কায়কোভস্কি চুপ করে থাকলেন।

ওঁদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন মার্শাল। তারপর হঠাৎ পিস্তলের মতো আঙুল তাক করলেন কর্নেল বিকারেনের দিকে। ‘বিকা...বিকারেন, তাই না ? সম্ভবত পঁয়ষট্টি সালের দিকে আপনি আমাদের একজন ক্যাপটেন ছিলেন, ঠিক ?’

‘মার্শাল কমরেডের স্বরণশক্তি...।’

‘বাস, বাস। আপনি ভালো একজন সৈনিক ছিলেন, বিকারেন। এখানে রাম-ছাগলদের সাথে করছেনটা কি?’

কাঁধ ঝাঁকালেন বিকারেন। ‘ইন্টারন্যাশাল সিকিউরিটি, কমরেড মার্শাল।’

‘স্ট্যালিনিষ্ট বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রটা আপনিই উদঘাটন করেন, হ্যাঁ,’ মনে পড়লো মার্শালের। ‘প্রশংসা করতে হয়।’

‘টেলি-বম যাদের মাথা থেকে বেরিয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম, কমরেড মার্শাল।’

‘আপনার উচিত ছিলো আমিতে থেকে যাওয়া,’ মন্তব্য করলেন মার্শাল ওনায়েভ।

‘মা চেয়েছিলেন আমি ডাক্তার হই,’ বললেন বিকারেন। ‘কিন্তু রোগ-শোকের চেয়ে অনেক বড় শত্রু মনে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদকে, তাই আমি সৈনিক হই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধ হতে দেরি হচ্ছে দেখে এসপিওনাজে ঢুকে পড়ি...।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মার্শাল ওনায়েভ। হঠাৎ করে হাত ঝাপটা দিয়ে ওঁদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। ‘শুনুন, আমরা আসলে আমেরিকার সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চাইছি। সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করা না গেলে পৃথিবীর বুকে শান্তি বা শ্রায় বিচার আসবে না, এ-কথা এখন আর পার্টির কেউ বিশ্বাস করে না। তাদের সাথে আমরা ব্যবসা করবো, সাংস্কৃতিক দল বিনিময় করবো, মহাশূণ্ণে যৌথ উদ্যোগে অভিযানে বেরুবো, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি করবো, আবার একই সাথে তাদেরকে ধ্বংস করার পায়তারা করবো, এ হয় না। ওরা আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে রাজি আছে, আমরা যদি

ওদেরকে শান্তিতে থাকতে দেই। কিন্তু আপনাদের টেলি-বম সব ভুল করে দিতে যাচ্ছে। যেভাবে হোক, থামান ওটা।’

‘আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, কমরেড মার্শাল,’ আন্তরিকতার সাথে বললেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘কিন্তু আপনাদের সাধ্য কতোটুকু সবারই তা জানা। আরো ছ’-একটা ঘটনা ঘটলেই আমেরিকানরা জানতে পারবে কে এ-সব করাচ্ছে। তারপর কি হবে ভারতে পারেন? ওরা যদি পাল্টা আঘাত হানে, ওদের দোষ দিতে পারবেন? এবং সেই পাল্টা আঘাতটা কি ধরনের হবে আন্দাজ করতে পারেন?’

বসকে বাঁচাবার জন্যে মার্শালের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন কর্নেল বিকারেন, ‘কমরেড মার্শাল, আমরা আশা করছি...।’

এমনভাবে চিৎকার করে উঠলেন মার্শাল, যেন গায়ে কোথাও আগুন ধরে গেছে। ‘আপনারা জাতির কলংক! আপনারা অযোগ্য! টেবিলে ঘুসি মেরে প্রিমিয়ার বলেছেন, যে-ই এর জন্যে দায়ী হোক, তার তিনি বারোটা বাজাবেন। কান খুলে শুনুন—প্রিমিয়ার আমাকে অর্ডার দিতে বলেছেন, এই মুহূর্তে টেলি-বম থামাতে হবে। তার কেটে দিন। জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলুন। ক’জন মরবে তাতে কিছু এসে যায় না।’

হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল কায়কোভস্কি।

‘আপনি ওকে ব্যাখ্যা করে বলুন, বিকারেন,’ গর্জে উঠলেন মার্শাল।

‘রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ এবং প্রিমিয়ারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে আর কোনো উপায় না থাকলে শেষ ব্যবস্থা হিসেবে টেলি-

বম এজেন্টদের নাম খরচের খাতায় লিখে রাখা যেতে পারে ।’

‘আপনি সিরিয়াস নন,’ প্রতিবাদের সুরে বললেন কায়কোভস্কি ।

‘সিরিয়াস ।’

‘একশোর বেশি ছুঁলভ এজেন্ট, আমাদের নাগরিক, যুদ্ধের সময় অমূল্য উপকারে আসবে—আপনি তাদের মেরে ফেলতে বলছেন ?’

‘কায়কোভস্কি, আপনি হয়তো আপোষহীন দেশপ্রেমিক, আপনি হয়তো নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্ট,’ বললেন মার্শাল ওয়ানেভ ।

‘কিন্তু আপনি সমরবিশারদ নন । বললেন, যুদ্ধের সময় । কোথায় যুদ্ধ ? এ-বছর, আগামী বছর, সম্ভবত এ যুগে আমেরিকার সাথে আমাদের যুদ্ধ বাধছে না । আমরা সবাই যদি স্মৃতির পরিচয় দেই, আগামী পঞ্চাশ বছরেও যুদ্ধ বাধার কোনো কথা নয় ।’

জেনারেল কায়কোভস্কির দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো, জানালা দিয়ে তাকিয়ে অনেক দূরে কিছু দেখার চেষ্টা করলেন । কিন্তু ক্রেমলিনের গম্বুজ আকৃতির ছাদ ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না ।

‘জেনারেল কায়কোভস্কি, সে-সময় টেলি-বম আইডিয়াটার গুরুত্ব ছিলো,’ স্বীকার করলেন মার্শাল । ‘কিন্তু পরিস্থিতি বদলাবার সাথে সাথে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । আপনি আপনার ভীপ-কাভার এজেন্টদের ফিরিয়ে আনতে পারেন কি ?’

জেনারেল ইতস্তত করতে লাগলেন, কর্নেলের পেশী শক্ত হয়ে গেল ।

‘হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়,’ কায়কোভস্কি মিথ্যে কথা বললেন ।

‘দ্রুত ?’ ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন মার্শাল ।

‘যদি প্রয়োজন হয়,’ আবার মিথ্যে বললেন জেনারেল । অপা-



রেশনটাকে বেঈমান বা আমেরিকান অনুপ্রবেশকারীদের কবল থেকে বাঁচাবার স্বার্থে টেলি-বম প্ল্যানে কোনো বোতাম রাখা হয়নি, যেটা টিপে এজেন্টদের নিউট্রাল করা যাবে। একটাই কোড সিগন্যাল শেখানো হয়েছে তাদের, টেলিফোনের মাধ্যমে সেটা পেল ধ্বংস-যজ্ঞ শুরু করে দেবে তারা। দ্বিতীয় কোনো কোড সিগন্যাল তারা শেখেনি।

‘ওদের ফিরিয়ে আনুন। যতোটা সম্ভব সাবধানে, কেউ যাতে কিছু টের না পায়,’ বললেন মার্শাল। ‘এটা আমার অফিশিয়াল অর্ডার।’

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল।

‘আমি আশা করবো, যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ওদেরকে আপনারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। তানা হলে...তানা হলে কি হবে সেটা আর বললাম না। আপনিও জানেন, আমিও জানি। এই মুহূর্তে ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবতে চাই না।’

কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ ওঁরা কোনো কথা বললেন না। জেনারেলের অফিস কামরাটা হপ্তায় ছ’বার আড়িপাতা যন্ত্র আছে কিনা দেখার জন্যে চেক করা হয়।

‘ওঁকে আপনার মিথ্যে বলা উচিত হয়নি, জেনারেল কমরেড।’

‘জানি,’ তিক্ত হেসে বললেন কায়কোভস্কি। ডেস্ক লাইটার তুলে চুরুট ধরালেন একটা। ‘কিন্তু আমি নির্ভর করছি রানার ওপর। ও যদি ডালচিমস্কিকে ধরতে পারে, তাহলে আর...।’

‘মার্শাল ওয়ানেভ জানতে পারলে আপনার অসুবিধে হবে...।’

‘হয়তো। কিন্তু ওপর মহলে আমারও লোকজন আছে। দরকার

হলে বড় ভাইকে দিয়ে প্রিমিয়ারকে ধরবো...।’ কর্নেল বিকারেন জানেন, জেনারেলের বড় ভাই-ও একজন মার্শাল। ‘কিন্তু যাই বলো, এ-ধরনের একটা কথা বলা উচিত হয়নি মার্শালের। ওরা আমাদের নিজেদের এজেন্ট। ওদের আমরা মেরে ফেলবো?’

‘চাইলেও কি তা সম্ভব!’

‘ওদের পক্ষে সম্ভব,’ বিড়বিড় করে বললেন জেনারেল।

‘মানে?’

‘তুমি বুঝতে পারোনি? মার্শালকে উসকে দিয়েছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স—গ্রু। ইচ্ছে করলে ওরা আমেরিকায় লোক পাঠাতে পারে। আমেরিকায়, আমেরিকার আশপাশে ওদের কমাণ্ডো ইউনিট আছে—ছদ্মবেশে। এজেন্টদের তালিকা দিয়ে আততায়ীদের পাঠালে কি করার থাকবে আমাদের?’

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুললেন কর্নেল, ‘কিন্তু মার্শালের কথাও ঠিক। প্রতি মুহূর্তে এজেন্টগুলো দানব হয়ে উঠছে। বড় বেশি বুকের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, জেনারেল। লোকসান যদি হয়-ই, তা সেটা যতো বড়ই হোক, আমাদের মেনে নিতে হবে।’

‘তুমিও তাহলে ওদের দলে!’ হতাশ ভঙ্গিতে বললেন জেনারেল।

‘প্লিজ, জেনারেল, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করছি।’

‘আমরা ইচ্ছে করলে দু’এক হপ্তা সময় নিতে পারি...,’ শুরু করলেন জেনারেল।

তাকে বাধা দিয়ে কর্নেল জানতে চাইলেন, ‘কিন্তু ডালচিমস্কি যদি সময় না দেয়?’

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অটল মূর্তির মতো বসে

থাকলেন ওঁরা । অবশেষে প্রথমে নড়লেন জেনারেল, দেরাজ খুলে ভদকার একটা বোতল বের করলেন তিনি । তাঁর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেল । এই প্রথম অফিসে ভদকা খেতে দেখছেন তিনি জেনারেলকে ।

‘এসো,’ তিক্ত হাসির সাথে বললেন কায়কোভস্কি । ‘মাসুদ রানার নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য কামনা করি আমরা । এখন সে-ই আমাদের একমাত্র ভরসা ।’

পাশের কামরায় অপেক্ষা করছিলেন জেনারেল ইগর কুদরভ । জেনারেল কায়কোভস্কি এবং কর্নেল বিকারেন বিদায় নেয়ার পরপরই তাঁকে নিজের অফিসে ডেকে নিলেন মার্শাল ওনায়েভ ।

খুব সংক্ষিপ্ত এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হলো ওঁদের মধ্যে । আলোচ্য বিষয় হিসেবে টেলি-বম্ যতোটা না গুরুত্ব পেলো তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেলো মাসুদ রানা ।

রাশিয়া থেকে মিং-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল রানা, সেই ঘটনায় রুশ সেনাবাহিনী এবং মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের যে-সব অফিসাররা অপমান বোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল কুদরভ । এতোদিন প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি, আজ হঠাৎ ভাগ্যগুণে সুযোগ এবং ক্ষমতা দুটোই তাঁর হাতে এসে গেছে ।

কিন্তু তিনি কৌশলী মানুষ, হঠাৎ করে মুখ খুললেন না । প্রথমে তিনি মার্শালের বক্তব্য শুনলেন ।

মার্শাল থামতে জেনারেল কুদরভ বললেন, ‘ডাहा মিথ্যে কথা বলেছেন জেনারেল কায়কোভস্কি, মার্শাল কমরেড । টেলি-বম্

এজেন্টদের ফিরিয়ে আনার কোনো পথ রাখা হয়নি, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। আর, ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্তে যাকে ওঁরা পাঠিয়েছেন—মাসুদ রানা—সে তো রাশিয়ার এক নম্বর শত্রু।’

সাদা ভুরু কুঁচকে মার্শাল ওনায়েভ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তার-মানে?’

‘এ তো সেই লোক, যে আমাদের মিং-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে-ছিল,’ বললেন জেনারেল। ‘রাশিয়ার মুখে চুনকালি দিয়েছিল, মনে নেই আপনার? ছনিয়ার সবার চোখে আমরা ছোটো হয়ে গিয়ে-ছিলাম। তাছাড়া...।’

‘তাছাড়া?’

সবজান্তার হাসি হাসলেন জেনারেল কুদরভ। ‘আমার কাছে ভয়ংকর একটা খবর আছে, মার্শাল ওনায়েভ। শুনলে যে-কেউ আঁতকে উঠবে।’

মার্শাল কর্কশ সুরে বললেন, ‘নাটকের অংশটুকু বাদ দেয়া যায় না?’

‘বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, মার্শাল, মাসুদ রানা আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে।’

ঠাণ্ডা চোখে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মার্শাল ওনায়েভ। ‘জানেন তো, তথ্যে যদি ভুল থাকে...।’

‘জানি, মার্শাল কমরেড,’ মৃদু হেসে বললেন জেনারেল। ‘এবং জানি কার সামনে বসে কথা বলছি আমি। আমার খবরের উৎস খোদ সি. আই. এ.। ওখানে আমার এজেন্ট আছে। সে নিঃসন্দেহ হয়ে তারপর জানিয়েছে আমাকে—আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে রানা। আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি।’

‘প্রমাণ, জেনারেল কুদরভ ? মাসুদ রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ?’

পকেট থেকে একটা টেলেক্স পেপার বের করলেন জেনারেল কুদরভ। ‘এরচেয়ে ভালো প্রমাণ এই মুহূর্তে আপনাকে আমি দিতে পারবো না। এটা এসেছে মন্টিঅল থেকে, আমাদের রেসিডেন্ট এজেন্টের কাছ থেকে। সি. আই. এ. থেকে আমার এজেন্ট রেডিও মারফত যা জানিয়েছে, রেসিডেন্ট হুবহু তাই টেলেক্স করে পাঠিয়েছে আমাকে।’ পেপারটা মার্শালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

পড়লেন মার্শাল। ‘মাসুদ রানার সাথে আমেরিকানদের যোগাযোগ হয়েছে। আর কিছু জানতে পারিনি। চ্যাপেল।’

‘কে এই চ্যাপেল ? মন্টিঅল এজেন্ট ?’

‘না। সি. আই. এ.-তে আমার লোক।’

টেলেক্স মেসেজটা আবার পড়লেন মার্শাল ওনায়েভ। তাঁর কপালের পাশের একটা শিরা তড়াক তড়াক করে বার কয়েক লাফালো। তারপর তিনি মাথা ঝাঁকালেন। ‘হ্যাঁ, পরিস্থিতি গুরুতর।’

‘রানা টেলি বমগুলোর নাম-ঠিকানা জানে বলেই আমার বিশ্বাস,’ বললেন জেনারেল কুদরভ। ‘অর্থাৎ ডালচিমস্কি একা নয়, বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে রানাও।’

হু’জনেই একমত হলেন, রানার অপরাধ : নিষিদ্ধ তথ্য জেনে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে রানা রাশিয়ার জন্যে মস্ত একটা হুমকি। হু’জন এমন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, ওঁরা যেন মাসুদ রানার বিচার করতে বসেছেন। বি. সি. আই. এজেন্ট আর ডালচিমস্কিকে একই চোখে দেখলেন ওঁরা। এরপর আর রায় নিয়ে কেউই দ্বিধায় ভুগলেন না।

মৃত্যুদণ্ড ।

কিভাবে কার্যকরী করা হবে তাও বিস্তারিত আলোচনা হলো ।  
তিনটে দল পাঠানো হবে । প্রথম দল দণ্ড কার্যকরী করতে ব্যর্থ হলে  
দ্বিতীয় দল চেষ্টা করবে, দ্বিতীয় দল ব্যর্থ হলে তৃতীয় দল ।

একই সাথে একশো ছত্রিশ জনের বিচারও হয়ে গেল । রায় সেই  
একই ।

মৃত্যুদণ্ড ।

আততায়ীদের চারটে দল পাঠানো হবে ।

আরেকটা দল যাবে ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্তে ।

ঠিক হলো, রানাকে মারার জন্তে মস্কো থেকে লোক পাঠানো  
হবে । ফলে আমেরিকায় পৌঁছুতে কিছুটা সময় নেবে তারা ।

তবে একশো ছত্রিশ জনের দণ্ড কার্যকরী করার জন্তে আততায়ী  
গ্রুপগুলো মেক্সিকো থেকে ঢুকবে আমেরিকায় । আগামী কয়েক  
দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে তারা ।

মনে মনে আনন্দে ডিগবাজি খেলেন জেনারেল কুদরভ । মার্শাল  
ওনায়েভকে দিয়ে মাসুদ রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিয়ে-  
ছেন তিনি । প্রতিশোধের স্বপ্নটা তাঁর পূরণ হতে যাচ্ছে ।

# সাত

---

আটলান্টিকের দিকে মুখ করে থাকা লং আইল্যান্ডে একাধিক হ্যাম্পটন রয়েছে। ব্রিজ হ্যাম্পটন, সাউথ হ্যাম্পটন, ওয়েস্ট হ্যাম্পটন, আর ইস্ট হ্যাম্পটন। লং আইল্যান্ডের সবখানে ধনকুবেরদের বসবাস, তবে তাদের মধ্যে যারা গুণে-মানে শ্রেষ্ঠ তারাই ঠাঁই পেয়েছে ইস্ট হ্যাম্পটনে। রাস্তায় লেটেষ্ট মডেলের রোলস-রয়েস, ক্যাডিলাক আর মার্সিডিজ ছাড়া গাড়ি খুব কমই দেখা যায়। উঠতি বড়লোক, যারা জাঁকজমক আর বিলাসিতায় গা ভাসাতে চায়, তাদের জুড়ে ইস্ট হ্যাম্পটন মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ বিশেষ। বিজ্ঞাপন সংস্থার মালিক, নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট, টিভি প্রযোজক, গার্মেন্টস কোম্পানীর ডিরেক্টর, সংবাদপত্রের মালিক, বেস্ট সেলার বইয়ের লেখক—বেশিরভাগই মধ্যবয়স্ক এবং লম্পট, ইস্ট হ্যাম্পটনে এক টুকরো জমি বা ছোট্ট একটা বাড়ি কেনার জুড়ে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করতে রাজি।

গ্রীষ্মকালে ইস্ট হ্যাম্পটন সমুদ্রসৈকতে সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহীদের মেলা বসে যায়। তাজা পুঁই ডগার মতো লকলকে যুব-

তীরা প্রতিযোগিতায় নামে, কে কার চেয়ে কতো কম কাপড় রাখতে পারে গায়ে। এবারের গ্রীষ্মে, তেসরা জুলাইয়ের এই শনিবারে, দুঃসাহসিনীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে—সমুদ্র স্নানে মত্ত হাজার হাজার পুঁই ডগার মধ্যে অনেককেই দেখা যাচ্ছে টপলেস। ভিড়ের মধ্যে খুঁজলে ছুঁচারটে বটমলেসও বোধহয় পাওয়া যাবে। ধন্য বলতে হয় ইস্ট হ্যাম্পটনের সজনে ডাঁটা সদৃশ তরুণদের, যৌবনের এই উন্মুক্ত প্রদর্শনী দেখে তারা মুগ্ধ হলো, কিন্তু উদভ্রান্ত বা উন্মাদ হলো না। কোথাও কোনো হাঙ্গামা বা হট্টগোল মেই, কেউ শিস দিলো না বা অশ্লীল কোনো মন্তব্য ছুঁড়লো না। ইস্ট হ্যাম্পটনে শুধু যে বিত্ত আর বৈভবের সমাবেশ ঘটেছে তাই নয়, এখানে রুচি আর সৌন্দর্যবোধেরও চর্চা হয়।

নীল আকাশে ঝলমল করছে সোনার চাকতি সূর্যটা। মিষ্টি রোদ আর টানা বাতাস দেহ-মনে পুলক জাগিয়ে তোলে। বালুকাবেলায় কোথাও এক টুকরো ময়লা পড়ে নেই। সৈকতে কেউ কোনো কাজ নিয়ে আসেনি, অথচ সবাই খুব ব্যস্ত। একটা মেয়ে হয়তো ছাতার নিচে মাথা দিয়ে সারা দেহে রোদ পোহাচ্ছে, যুবকরা তার শরীরের কোন্ অংশটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকছে সেই হিসেব নিয়ে ব্যস্ত সে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে আরেক সুন্দরী, সে গুণছে ঘাড় ফিরিয়ে ক'জন লোক তার দিকে তাকালো। অনেকেই দল বেঁধে সাগরে নেমেছে, পরস্পরের দিকে পানি ছুঁড়তে ব্যস্ত তারা। অনেক ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় ডুব দিচ্ছে পানিতে—বলাই বাহুল্য, উদ্দেশ্য ডুবে ডুবে পানি খাওয়া। বড় বড় ঢেউ আর তীব্র শ্রোত উপেক্ষা করে কেউ কেউ সাঁতরে অনেক দূর চলে গেছে, ছোটো ছোটো বোট পাঠিয়ে উদ্ধার করা হচ্ছে তাদের।



পুরুষরা অনেকেই বাঘ বা সিংহের মুখোশ পরে ঘুর ঘুর করছে মেয়েদের আশপাশে—ধরে নেয়া যায়, এদের কারো বয়সই পঁয়-তাল্লিশের কম নয়।

পাঁচটা বাজতে সামান্য ক’মিনিট বাকি থাকতে স্কুবা গিয়ার পরা একটা শরীর পানির ওপর মাথাচাড়া দিলো সৈকত থেকে ষাট গজ দূরে। কেউ তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলো না, কারণ কমপ্রেসড-এয়ার ট্যাংক সহ ওয়েট স্যুট পরা লোক ইন্সট হ্যাম্পটন সৈকতে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। স্কুবা ডাইভার নিজের চারদিকে তাকালো, টুপ করে ডুব দিলো, তারপর তীর থেকে বিশ গজ দূরে আবার মাথা তুললো পানি থেকে।

‘রবিন! ওহ্ রবিন! ন’হ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! কোথায় ছিলে তুমি?’ মেয়েটার বয়স হবে বাইশ কি তেইশ, মিষ্টি কণ্ঠস্বর, পাকা আপেলের মতো গায়ের রঙ। শরীরটা গোলগাল, কিন্তু মেদহীন। পরনে মিনি-বিকিনি, দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে পুরুষকে প্ররোচিত করার একটা ভাব। আনন্দে উদ্ভাসিত সুন্দর অবয়ব থেকে প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মায়াভরা চোখে শীতল বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক। বালির শেষ প্রান্তে, পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, রাবার স্ট্রাট পরা লোকটার দিকে কৃত্রিম রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ‘ফর গডস সেক, রবিন, উঠে এসো পানি থেকে! কই, এলে!’

আড়াই ভঙ্গিতে পানি থেকে উঠে এলো স্কুবা ডাইভার, পা থেকে রাবার ফিন আর মুখ থেকে ফেসমাস্ক খুলে ফেললো। সুদর্শন যুবক সে, সুঠাম স্বাস্থ্য, ঠোঁটের কোণে ভুবন ভোলানো হাসি।

‘রবিন, রুথম্যানরা রেগে বোম্ হয়ে যাবে,’ অভিযোগের সুরে

বললো মেয়েটা। ‘পরপর তিন দিন দেরি করলাম আমরা, আজ ওরা নির্ধাৎ আমাদের বিষ খাওয়াবে।’

‘মার্টিনিতে আর্সেনিক ? উহু’, ওটা রুথম্যানদের স্টাইল নয়।’ সাগর থেকে উঠে আসা যুবক মাথা নাড়লো। ‘এরপর তুমি হয়তো বলবে মিসেস রুথম্যান ক্রেপটোম্যানিয়ায় ভুগছে।’ মেয়েটার কজ্জি চেপে ধরলো সে। ‘চলো।’

‘উফ, বরফ ! ছাড়ো !’ ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পা চালালো মেয়েটা। তিন গজ এগিয়ে থামলো। ঝুঁকলো সে, স্ট্র-পার্সটা তুলে নিলো বালি থেকে।

সাগর থেকে উঠে আসা মাসুদ রানা আন্দাজ করলো, ওই পার্সেই শর্ট-রেঞ্জ ট্রান্সমিটারটা আছে, গাইড করে তীর থেকে দেড় মাইলের মধ্যে নিয়ে এসেছিল সাবমেরিনকে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না ও। পরে অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো ঘটছে, যেমন প্ল্যান করেছিলেন কর্নেল বিকারেন। সৈকত থেকে রাস্তায় উঠে এলো ওরা, একধারে সাদা মার্বেল পাথরে কালো রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে—ইজিপ্ট’স লেন। খানিকটা হেঁটে মেরুন কালারের একটা মাস্টাং কনভার্টিবল-এর সামনে থামলো মেয়েটা।

‘প্রভু, আবার বলো না যে নিজের বাহনটাকেও চিনতে পারছো না,’ বিদ্রূপ করলো সে।

‘এমন কি সেবাদাসীর নামটা পর্যন্ত ভুলে গেছি আমি।’

‘হুইলের পিছনে উঠে বসলো মেয়েটা। বাঁ হাত তুলে তিন প্যাচ দেয়া সোনার আংটিটা দেখালো রানাকে। ‘প্রাণাধিক, আমি তোমার ছুঃখিনী সহঃখিনী লিলি—লিলিয়ান—আমাকে চিনতে পারছো না, নাথ ?’

মাস্টাঙে উঠে মেয়েটার পাশে বসলো রানা। ‘লিলিয়ান ? সহ-ধমিনী ? ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এতোক্ষণে মনে পড়েছে, প্রিয়ে ।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও । ‘স্বর্গে বেশ আরামেই ছিলাম । হঠাৎ কি কুমতি হলো, অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে রাজি হয়ে গেলাম । এই মর্ত্যে কারো কোনো উপকারে আসবো কিনাজানি না, তবে তোমার মতো সুন্দরী ভার্যা পাশে থাকলে সময়টা বোধহয় একেবারে মন্দ কাটবে না ।’

খিলখিল করে হেসে উঠলো মধুকণ্ঠী লিলিয়ান । ‘শুনে ধন্য হলাম । কিন্তু পুরুষমানুষ তো, আদিএবং অকৃত্রিম রোমিও – মধুলোভী চঞ্চল ভ্রমর—আমার কি সাধ্য যে তোমাকে বাঁধতে পারি । তবে আমি আছি, সর্ব অঙ্গে যৌবন আর জ্বালা নিয়ে আমি আছি ।’

পুরনো, বিশাল একটা ভবনকে পাশ কাটালো গাড়ি—মেইডস্টোন ক্লাব । রাস্তার দু’পাশে সার সার কাঁচমোড়া বাড়ি, প্রতিটি বাড়ির সামনে চোখ জুড়ানো বাগান । ইস্ট হ্যাম্পটনের ক্ষুদে শপিং এরিয়া পেরিয়ে এসে গাড়ির গতি কমলো একটু, বাঁক নিয়ে ঢুকলো রুট টোয়েনটি-সেভেনে । রুট টোয়েনটি-সেভেনেই, নিউ ইয়র্কের দিকে আরো দশ মাইল এগিয়ে, একটা হোটেলে রুম ভাড়া নিয়েছে লিলিয়ান । সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার জন্তে চমৎকার পরিবেশ । চেয়ারে আর বিছানায় ফোম-রাবার, ড্রেসিং-টেবিল আর শোকেসে ফরমিকা । এয়ার কন্ডিশনিঙের বদৌলতে ঘরের তাপমাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে পাঁচ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা ।

‘বউ পেলাম, বিছানা জুটলো, এবার কিছু আহার পেলো... ।’

‘শরাব ?’ চোখে প্রত্যাশা নিয়ে রানার দিকে তাকালো লিলি । ‘স্কচ লাইফ ?’ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টেবিলের ওপর রাখা লম্বা একটা শান্তিদূত-১

বোতলের দিকে তাকালো সে ।

‘ভদকা হলে ভালোই হতো, লিলিয়ান,’ ওয়েট স্যুট খুলতে শুরু করে বললো রানা ।

‘লিলি ।’ কাগজের তৈরি একটা কাপে পানি আর হুইস্কি মিশিয়ে রানার হাতে দিলো লিলিয়ান । ‘অতীতের কথা ভুলে যেতে হবে তোমাকে, ডিয়ার হাসব্যাণ্ড । ভদকার তুমি শুধু নামই শুনেছো, জীবনে কখনো জিভে ঠেকাওনি ।’

‘আপাদমস্তুক আমেরিকান ?’

‘অবশ্যই । শুধু কি আমেরিকান ? আমার স্বামী কখনো কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না—ট্রাফিক আইন মেনে চলে, নিয়মিত ট্যাক্স দেয়, বউকে নিয়ে উইক এণ্ডে থিয়েটারে যায়...,’ হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল লিলি, রানার খালি গা দেখে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকলো ।

‘মানে ? কি হলো ?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলো রানা ।

‘বোধহয় আমার নজর লেগে গেল,’ জোর করে হাসলো লিলি । ‘মেড ইন তাসথেন্ড ? মাশাল্লা, শরীর বটে একথানা ! দেখেই কেমন যেন ধড়ফড় করে উঠলো বুকের ভেতরটা ।’

‘সোনা বউরা কক্ষনো বেয়াড়া প্রশ্ন করে না ।’ ধড়ফড় রানার বুকটাও করে উঠলো, কিন্তু চেহারায় তার কোনো প্রতিফলন ঘটলো না । দুই চুমুকে কাপটা খালি করে টেবিলে রাখলো । ‘ঠাণ্ডায় হি হি করছি, কিছু কাপড় পেলে গরম হতে পারতাম...’

এক হাতে কাপ, অপর হাত দিয়ে ক্লজিটের হাতল ধরে টান দিলো লিলিয়ান । নীল আর বাদামি রঙের দুটো স্যুট রয়েছে ভেতরে, পাশে হলুদ ব্লেজার, আর তিনটে শার্ট । ক্লজিটের মেঝেতে

ভাঁজ করা কালো লোফার-এর ওপর এক সেট আগারওয়্যার, আর এক সেট মোজা ।

‘রেডিওতে ওরা তোমার সাইজ জানিয়ে দিয়েছে,’ ব্যাখ্যা করলো লিলি । ‘আশা করি আমার পছন্দ খুব একটা কনজারভেটিভ নয় ।’

‘তা নয় । হাতে টাকা এলে শহর থেকে আরো কিছু কাপড় কিনে নেয়া যাবে ।’

স্ট্র-ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে দামী একটা ওয়ালেট বের করলো লিলিয়ান । ‘পাঁচ হাজার ডলার আছে—একশো ডলারে আড়াই হাজার ।’

ওয়ালেট খুলে টাকার বাঙিলটা বের করলে রানা । গুণলো ।

‘নিজের বউকেও তুমি বিশ্বাস করো না ?’

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না, নিজেকে শক্ত করে বুকের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো পাউচটা ধরে টান দিলো রানা । উফ্ করে উঠলো ব্যথায় । প্লাস্টিক প্যাকেট থেকে সমস্ত ডকুমেন্ট বের করে এক এক করে ওয়ালেটে ভরলো ও । ‘ড্রাইভার’স লাইসেন্স, আমেরিকান এক্সপ্রেস, আর ব্যাংকআমেরিকার্ড । পাসপোর্ট । রু ক্রস, আর রু শীল্ড । এ. এ. এ. । এয়ারট্রাভেল কার্ডস । আর এটা হলো—রেড ক্রস ব্লাড ডোনার’স কার্ড ।’

সবজাত্তার হাসি হেসে লিলিয়ান বললো, ‘আমি তো বলেইছি, আমার স্বামী আদর্শ পুরুষ । কোনো কাজে খুঁত রাখতে জানে না ।’

কাপে পানি আর হুইস্কি মিশিয়ে চুমুক দিলো রানা । চিন্তিত । ‘অস্ত্র, লিলি । আমার একটা অস্ত্র দরকার । আমারটা সাবমেরিনে রয়ে গেছে । ওয়েট স্ট্রাটের ভেতরে করে আনলে বেচপরকম ফুলে থাকতো... ।’

তালায় চাবি ঢুকিয়ে দেবাজ খুললো লিলি। ভেতর থেকে চকলেট রঙের এয়ারব্যাগ বেরুলো। এক সেকেন্ড পর রানার দিকে ছোট্ট একটা পয়েন্ট টুট রিভলভার বাড়িয়ে দিলো সে, সাথে ফিট করা সাইলেন্সার।

‘সত্যি তুমি লক্ষ্মী বউ ।’

রানাকে বাধা দিয়ে হাত তুলে বাথরুমটা দেখালো লিলিয়ান।  
‘যাও, আগে গা থেকে লবণ ধুয়ে এসো।’

মাথা নাড়লো রানা। ‘লেডিস ফাস্ট’।’

বাথরুমের দরজা বন্ধ হতে সিগারেট ধরালো রানা। পানির শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তারপর প্রথমে সার্চ করলো লিলিয়ানের ব্যাগ, সবশেষে ঘরটা। রুটিন, অবহেলা করা চলে না। রানা যখন ক্ষুদ্রে মাইক্রোফোন, আড়িপাতা যন্ত্র বা লুকানো ক্যামেরা খুঁজছে, রুগ সাবমেরিন তখন একটা কোড মেসেজ ট্রান্সমিট করছে মস্কোর উদ্দেশে, ‘রোমিও সময়মতো পৌঁছেছে।’ মেসেজটা একে-বারেই সংক্ষিপ্ত, কি বা কোথেকে পাঠানো হলো নিখুঁতভাবে জানার কোনো উপায় নেই, তবে অন্তত দু’জন লোক জানার চেষ্টা করলো। তারা ইউ. এস. নেভি পেট্রল প্লেনের টেকনিশিয়ান। এধরনের প্লেন-গুলোয় হাজার পাউণ্ড ওজনের ইলেকট্রনিক্স গিয়ার থাকে, থাকে অগুণতি ‘ব্র্যাক বক্স,’ যেগুলোর নাম পর্যন্ত ক্লাসিফায়েড। ট্রান্সমিটারটা কোথায় তা তারা বুঝতে না পারলেও, টেকনিশিয়ানদের ধারণা হলো, নরফোকের আটলান্টিক ফ্লিট হেডকোয়ার্টারের ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা ব্যাপারটা শুনলে খুশি হতে পারে। বিদেশী একটা সাবমেরিন, লং আইল্যান্ডের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এসেছিল, খুব একটা হালকা ব্যাপার কি ?

জায়গা মতো পৌছে গেল খবরটা ।

ভিজ়ে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো লিলিয়ান ।  
পরনে শুধু হালকা নীল প্যাৰ্জি, বুক আর তলপেটের কাছে ছ'হাতে  
ধরা শুকনো কাপড়চোপড় । নিলিপ্ত চেহারা, একপাশে সরে অপেক্ষা  
করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো । 'অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো  
না, এই মুহূৰ্তে দেখার কিছু নেই... ।'

'টিপিকাল আমেরিকান ট্যুরিস্ট আমি, দেখার কিছু নেই বললে  
শুনবো কেন ?' গলা লম্বা করে বললো রানা ।

'শো শুরু হবে মাঝরাতেৰ পর,' আশ্বাস দিলো লিলিয়ান ।  
'টিকেট যোগাড় করতে পারলে... কথা অসমাপ্ত রেখে কাঁধ  
ঝাকালো সে ।

'আরে, তাই তো ! ভুলেই গিয়েছিলাম, আমেরিকায় সব কিছু  
পরসা দিয়ে কিনতে হয় ।'

'হ্যাঁ, এটা সোভিয়েত রাশিয়া নয় । ওখানে তো বিয়ের প্রথম  
দিনই নব-দম্পতিকে সরকারী উপহার হিসেবে সাজানো-গোছানো  
একটা অ্যাপার্টমেন্ট দিয়ে দেয়া হয়, সারাটা জীবনের জন্যে  
ওখানে তারা সুখের নীড় বাঁধতে পারে । সামান্য কিছু ভাড়া দিতে  
হয়, ভাড়াটা পনেরো বছর আগে বেঁধে দেয়া হয়েছে, তারপর আর  
বাড়েনি ।'

'আক্ষরিক অর্থেই সৰ্বহারাদের স্বৰ্গ,' মন্তব্য করলো রানা ।

'আমেরিকাও স্বৰ্গ, তবে বুর্জোয়াদের ।

'এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, তুমি কোথাকার  
কি ?' জিজ্ঞেস করলো রানা ।

‘আদর্শ স্বামীরা স্ত্রীদের সব কথা জানতে চায় না,’ ঠাণ্ডা গলায় বললো লিলিয়ান। ‘শুধু এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকো, আমি আমেরিকান কমিউনিস্ট।’ হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলো, ‘কে. জি. বি. ছয় নম্বর রুল-টা যেন কি?’

‘যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনফিলট্রেশন এরিয়া ছেড়ে চলে যাও।’

‘জানো, তবু তুমি দেরি করছো?’

বাথরুমে ঢুকলো রানা, গোসল সেরে বেরিয়ে কাপড় পরছে এই ফাঁকে বিল মেটাবার জন্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লিলিয়ান। মোটেল ক্লার্ককে রানার চেহারা দেখতে দেয়ার কোনো মানে হয় না, না দেখলে পরে কাউকে চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে না।

পাঁচটা চল্লিশ। রাস্তায় যানবাহন কম। মাস্টাং নিয়ে নিউ ইয়র্কের দিকে যাচ্ছে ওরা।

‘এ-ধরনের গাড়ি আগেও তুমি চালিয়েছো,’ অনুমান করলো লিলিয়ান।

‘বাহান্ন ধরনের গাড়ি চালিয়েছি, ট্রেনিঙের অংশ,’ বললো রানা।

‘আর আটত্রিশ ধরনের বোট, হেলিকপ্টার।’

‘হালকা প্লেনগুলোকে ধরলে উনত্রিশ...।’

‘তোমার আসল দক্ষতা হ্যাণ্ডগান আর স্মল আর্মসে।’

‘সবচেয়ে বিরক্তিকর টেলিভিশন শো-গুলো...।’

‘প্রতি ছ’মাসে ছাব্বিশ ঘণ্টা ভিডিও ক্যাসেট দেখতে হয়,’ সহাস্যে বললো লিলিয়ান। ‘আমেরিকান, ব্রিটিশ, জার্মান, আর ফ্রেন্স জনপ্রিয় সিরিজগুলো একটাও বাদ যায় না। ওই চার দেশের সমস্ত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ তোমাকে রপ্ত করতে হয়েছে। মেডিক্যাল শো-গুলো কেমন লাগে?’ রানা সম্পর্কে কিছু না জান-



লেও এ-সব তথ্য লিলিয়ানের পক্ষে দেয়া সম্ভব, কারণ সব কে. জি. বি. এজেন্টকেই প্রায় একই ধরনের ট্রেনিং নিতে হয়।

‘উফ, নিদারুণ একঘেয়ে...!’ মাথা নাড়তে নাড়তে বাঁক নিলো রানা, রাস্তার পাশে রোড-সাইন দেখা গেল—রিভারহেড অ্যাণ্ড নিউ ইয়র্ক।

‘তুমি একজন সাক্ষা কমিউনিষ্ট, রবিন। সমাজতন্ত্রের জগ্নে অনেক ত্যাগ আছে তোমার।’

চেহারা ম্লান হয়ে গেল রানার। ‘সত্যি যদি দেশের জগ্নে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম, জীবন ধন্য হতো। বাদ দাও, বুঝলে। আমি কাজের কথা ভাবতে চাই।’

‘ভাবো, কে তোমাকে নিষেধ করেছে?’

‘কিন্তু কি ভাববো?’ অসহায় দেখালো রানাকে। ‘কি জানি আমি?’

চুপ করে থাকলো লিলিয়ান।

‘গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে তুমি কিছু জানো?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘আমি তোমার বাধ্য স্ত্রী, এরই মধ্যে ভুলে গেছো? আমার কিছু জানার নেই, রবিন।’

মাথা ঝাঁকালো রানা, তিন ইঞ্চি মাথা ঘুরিয়ে দেখলো লিলিয়ান হাসছে। ‘মজা পাচ্ছে, নাকি বিদ্রূপ করছো? শোনো, সব কথা জানার সত্যিই দরকার নেই তোমার। গোটা ব্যাপারটা ভয়ংকর, মিশনটাও ভয়ংকর। নিরেট গর্দভ ছাড়া এ-ধরনের মিশন নিয়ে কেউ আসে না।’

‘আমি জানি তুমি ঠিকই বলছো, হানি।’

কিন্তু রানা হাসলো না। ‘আর শোনো, আমার ভেতর যথেষ্ট উৎসাহ নেই, গোপনে এ-ধরনের কোনো অভিযোগ করতে যেয়ো না। আমার সাথে যতোকণ থাকছো, কোথাও কারো সাথে যোগাযোগ রাখা চলবে না। কাজটা যে প্রায় অসম্ভব, মস্কায় সেকথা আমি বলে এসেছি। ওদের কোনো বিকল্প ছিলো না বলে ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।’

কথা না বলে পায়ের ওপর পা তুলে দিলো লিলিয়ান, ফলে মিনি-স্কাট হাঁটুর ওপর আরো খানিক উঠে এলো। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো রানা, এ-ধরনের ব্যাপার কখনোই ওর চোখ এড়ায় না।

‘আমার সাথে তোমাকে ওরা ভিড়িয়ে দিলো, কারণটা কি জানো?’ লাল একটা ফেরারি-কে ওভারটেক করলো রানা।

‘সম্ভবত আমি খুব হাসতে পারি, তাই,’ মিটিমিটি হেসে বললো লিলিয়ান। ‘আমার আরো অনেক গুণ আছে। পুরুষদের মন ভোলাতে পারি। নাচতে পারি, নাচাতে পারি। আনআর্মড কমবাটে ট্রেনিং নেয়া আছে, ভালো পিস্তল চালাতে জানি। জুডো শিখেছি, কারাতে শিখেছি। তোমার যা যা প্রয়োজন সব আমি মেটাতে পারবো।’

‘সস্তা হয়ে যাচ্ছে না?’

‘নির্ভর করে ব্যাপারটাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তার ওপর। আমি একজন আমেরিকান কমিউনিষ্ট, সোভিয়েত রাশিয়ার আদর্শে বিশ্বাসী। যদি দেখি তোমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাচ্ছে, সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে আমি বাধা দেবো। তার আগে পর্যন্ত আমি তোমার অনুগত...।’

‘বুঝেছি। শোনো, এই মিশন সম্পর্কে একটা কথা তোমাকে

বলা যেতে পারে। আমার কাজ একজন লোককে খুঁজে বের করা। আমাদের লোক। সশস্ত্র, এবং সম্ভবত উন্মাদ।’

রাস্তার ধারের ফলকে লেখা রয়েছে লং আইল্যান্ড এক্সপ্রেসওয়ে আর চার মাইল সামনে।

‘উন্মাদ?’

‘বিপজ্জনক, ম্যানিয়াক, বেঈমান। কমিউনিজমের পরম শত্রু। বিশ্বশান্তির জন্তে বিরাট একটা হুমকি। অসম্ভব একটা দানব।’

‘কোথায় সে?’ চোখ পিট পিট করলো লিলিয়ান। ‘ওয়াশিংটনের কাছাকাছি কোনো সি. আই. এ. সেফ হাউসে?’

‘না, সে একাই খেলছে। কোথায়?’ রাস্তার ওপর চোখ রেখে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। ‘কেউ জানে না। টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, শিকাগো, লস এঞ্জেলস, মিশিগান, যে-কোনো রাজ্যে হতে পারে। কিংবা হয়তো আমেরিকাতেই নেই, মন্ট্রি়ালের কোনো হোটেলে বসে তা দিচ্ছে গোঁফে।’

অসম্ভব নয়। কানাডার সাথে আমেরিকার ডাইরেক্ট ডায়াল সিস্টেম রয়েছে, উত্তর সীমান্ত এলাকার হাজার হাজার বৃদ্ধের যে-কোনো একটা থেকে টেলিফোন করতে পারে ডালচিমস্কি। পানির মতো সহজ একটা কাজ ষাট কি সত্তর ডলার খুচরো পয়সা পকেটে থাকলে অনায়াসে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে লোকটা। অবশ্য যদি সন্ধ্যার পর ফোন করে, দিনে বেশি পয়সা লাগবে।

‘তোমাকে কি ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে?’ হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘তোমাকে সাহায্য করতে হবে। কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। কে. জি. বি. রেসিডেন্ট তোমাকে বলতে বলেছেন, গোটা কে. জি.

বি. অ্যাপারটাস...।’

‘ভুলে যাও : ওদের সাহায্য নেয়া সম্ভব নয়।’

লিলিয়ানের জোড়া ভুরু ধনুকের আকৃতি নিলো। ‘তুমি কি বলতে চাও এখানে আমাদের কে. জি. বি. নেটওয়ার্কে আমেরিকান কাউন্টার এসপিওনাজ অনুপ্রবেশ করেছে?’

‘সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায়? রেসিডেন্ট ক’জন লোককে নিয়ে কাজ করছে? পাঁচ শো? এক হাজার? যেখানে এতোগুলো লোক জড়িত, সেখানে তোমাকে ধরে নিতে হবে ছ’একজন নিশ্চয়ই পেনি-ট্রেট করেছে।’ ছুঁই হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। ‘ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে মীন করছি না, প্রিয় বধূ।’

‘তোমাকে সবচেয়ে ভালো লাগে যখন নোংরা কথা বলো, ডিয়ার রবিন। আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিলো এমন একজন কেউ আমার জীবনে আসবে...।’

‘কিন্তু আমরা স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছি না। আসল কথা হলো, তোমার লোকদের সাহায্য নেয়া যাচ্ছে না।’

‘তুমি চাও, কথাটা আমি রেসিডেন্টকে জানাই?’

‘গোটা ব্যাপারটাকে খুব হালকাভাবে নিচ্ছে তুমি। একটু আগে ললাম, কারো সাথে যোগাযোগ করা চলবে না। এটা এক নম্বর নির্দেশ। ছ’নম্বর নির্দেশ, যখন যা করতে বলবো তখুনি তাই করবে, কোনো প্রশ্ন করবে না।’

‘যথা আজ্ঞা, হুজুর।’

‘যদি বুঝি আমার কথা শুনছো না, সাথে সাথে বাদ দেয়া হবে তোমাকে।’

‘এবং তোমার কথা আমাকে ভুলে যেতে হবে...।’

‘সে দায়িত্ব পালন করবে মাথায় একটা বুলেট।’

একদৃষ্টে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো লিলিয়ান।  
‘এতো কঠিন তুমি হতে পারো, রবিন ? বিশেষ করে মেয়েদের  
সাথে ?’

‘চকলেট আর ফুল আসবে পরে,’ কথা দিলো রানা। ‘তার আগে  
নিজেকে বিশ্বস্ত আর অনুগত বলে প্রমাণ করো। মেয়েদের ব্যাপারে  
আমি শুধু নরম নই, উদারও। সেজ্ঞেই তো আমাদের নেতা  
আমাকে মহিলা সদস্য বাড়াবার দায়িত্ব দিয়েছেন।’

‘নেতা ?’

‘তুমি জানো না আমি একজন রেজিস্টার্ড রিপাবলিকান ?’ হাত  
বাড়িয়ে গাড়ির রেডিওটা অন করলো রানা। ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রা গেয়ে  
উঠলো, ইউ মেক মি ফীল সো ইয়াং। রানার গায়ে হেলান দিলে  
লিলিয়ান। ঘাড় ফিরিয়ে মুহূর্ত হাসলো রানা।

রানা হাসছে, কিন্তু মস্কোয় কর্নেল বিকারেন সেই যে ভুলে গেছে  
তারপর থেকে আর হাসতে পারছেন না। নিজের অফিসে গোমর  
মুখে বসে আছেন তিনি, ডালচিমস্কি যদি সফল হয় তাহলে মার্কি  
মিসাইলের প্রথম ঝাঁকটা এই মস্কোতেই প্রথম আঘাত হানবে  
কর্নেলের সামনে তিনটে মেসেজ রয়েছে, তিনটেই এই মাত্র দি-  
গেছে লেফটেন্যান্ট কুরাডিন। প্রথম মেসেজে বলা হয়েছে, ইস্ট  
হ্যাম্পটনের তীরে নিরাপদে পৌঁছেছে “রোমিও”। দ্বিতীয় মেসেজ  
একটা ছঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে— লাক ডু ফ্র্যামবিউতে, টোরান  
ন্যাভাল কমিউনিকেশন সেন্টারে টেলি-বম আক্রমণ। তৃতীয়  
মেসেজটা শুধু ছঃসংবাদ নয়, ভয়ংকর ছঃসংবাদ। মিলিটারী ইন্টেলি-  
জেন্সে কে. জি. বি.-র নিজস্ব চর আছে, তার কাছ থেকে এসে

খবরটা। গ্রু-র চারটে কমাণ্ডো গ্রুপ মেক্সিকো থেকে মার্কিন যুক্ত-  
রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। শুধু তারিখ নয়, কোন্ রাজ্যের  
কোন্ এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে তারা তাও জানানো হয়েছে। কমাণ্ডো  
গ্রুপগুলোর উদ্দেশ্য—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে টেলি-বমগুলোকে  
অকেজো করে দেয়া।

তারমানে একশো ছত্রিশ জন রুশ এজেন্টকে খুন করতে চাইছে  
মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স।

কর্নেল বিকারেনের মাথায় আগুন ধরে গেল। সেই সাথে অসহায়  
বোধ করলেন, কি করবেন বুঝতে পারছেন না। পনেরো মিনিট  
কাটলো উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে। গ্রু-র সাথে আলোচনা  
করে লাভ নেই। রেড আমি চীফ অভ স্টাফ মার্শাল ওনায়েভের  
পরামর্শ এবং নির্দেশ পেয়েই কাজ করছে মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স।  
মার্শাল ওনায়েভ নিজস্ব নীতিতে চলেন, কে. জি. বি.-র কথা তিনি  
কানে তুলবেন না। এ-ব্যাপারে সম্ভবত প্রিমিয়ারের অনুমতিও নেয়া  
মাছে তাঁর।

কিন্তু তাই বলে কে. জি. বি. তার একশো ছত্রিশ জন দুর্বল  
এজেন্টকে এভাবে হারাতে পারে না। এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের  
হায়ে চলে যায়নি। মাসুদ রানাকে সময় দেয়া দরকার, সূচু একটা  
মাধান তার দ্বারা সম্ভব হলেও হতে পারে। ডালচিমস্কি ধরা পড়লে  
এই একশো ছত্রিশ জন আর হুমকি থাকে না। অস্ত্র রানা ব্যর্থ না  
ওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার।

লাল টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন কর্নেল বিকারেন।  
কনারেল লুদভিক কায়কোভস্কির সাথে জরুরী বৈঠক করা দরকার।  
গ্রু-র গ্রুপগুলো সম্পর্কে রানাকে জানাতে হবে। দরকার হলে

গ্রুপগুলোর অস্তিত্ব এফ. বি. আই.-কে জানিয়ে দিতে পারে রানা। প্রতিটি গ্রুপে পাঁচজন করে থাকলে মোট বিশজন, একশো ছত্রিশ জনকে রক্ষার বদলে বিশজনকে যদি হারাতে হয়, তাতে ক্ষতি কি ?

## আট

---

‘সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটে থাকি আমি,’ কুইনস-মিডটাউন টানেল থেকে ব্যস্ত ম্যানহাটনে বেরিয়ে এলো মাস্টাং, রানার কনুই ধরে একটু চাপ দিয়ে বললো লিলিয়ান।

‘করো না, করতে।’ থার্ড এভিনিউ-এ ঢুকবে রানা, ট্রাফিক আলো বদলাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

‘আমার অ্যাপার্টমেন্টে তুমি থাকতে চাও না ?’

‘সম্ভব হলে তোমার শহরেই থাকতে চাই না।’

‘কারণ ?’ চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

‘কি ভুল-ভাল করে রেখেছো আমি জানি ? জোর করে বলতে পারো, গত তিন মাস ধরে মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের কোনো শাখা তোমার ওপর নজর রাখছে না ?’

‘ভুলে যেয়ো না আমি একজন প্রফেশনাল...।’

‘প্রফেশনালরা ভুল করে না?’

ঠোট ফুলিয়ে বসে থাকলো লিলিয়ান।

‘এমনও হতে পারে,’ শান্তভাবে আবার বললো রানা, ‘হয়তো কে. জি. বি. রেসিডেন্ট-ই তোমার ওপর নজর রাখছে। আমি কোনো বুঁকি নিতে পারি না।’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলিয়ান। ‘সান্ত্বনা এইটুকু যে স্বামী আমার অত্যন্ত সাবধানী লোক।’

কিছু বলতে গিয়েও বললো না রানা, একটা স্টেশন ওয়াকেনকে এড়াবার জন্যে গাড়ির স্পীড কমালো।

‘সুখের নীড় তাহলে কোথায় আমরা...।’

‘ইস্ট ফিফটি-সিক্সথ্-এ, হোটেল স্যাভয়।’

‘গ্যাস স্টেশন থেকে তাহলে ওখানেই ফোন করেছিলে?’

মাথা ঝাঁকালো রানা। দশ মিনিট পর হোটেল স্যাভয়ের আটশো আঠারো নম্বর কামরায় পৌঁছে গেল ওরা। সময় নষ্ট না করে স্যুটকেস খুলে কাপড় বের করলো রানা, ক্লজিটের ভেতর ওয়ার্ড-রোবে সাজিয়ে রাখলো। লিলিয়ান কি ভাবছে বুঝতে পেরে বললো, ‘দিনারের পর তোমার জামা-কাপড় আনার ব্যবস্থা করা যাবে। রোজ গার্ডেনের স্টেক খুব ভালো, চলো আগে ওখানে যাই।’

রেস্টোরান্টটা সেকেন্ড এভিনিউয়ে। চলতি হাওয়ায় যার নাম লিলিয়ান সে তার নিজের জন্যে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলো। স্পাই শিরোমণি মাসুদ রানা হতাশায় ভুগছে, কারণ মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে না কোথেকে বা কিভাবে শুরু করবে কাজটা, তাই সিদ্ধান্ত নিলো অ্যালকোহল স্পর্শ করবে না। তবে সঙ্গিনীকে যুক্তি দেখালো, ‘ভদকার অভাব আর কিছুতে কি মেটে!’



রানা লক্ষ্য করলো, রাত যতো বাড়ছে ততোই উৎফুল্ল হয়ে উঠছে লিলিয়ান। চেহারায়, দৃষ্টিতে, কথায়—আশ্চর্য একটা আনন্দ, আশ্চর্য একটা উত্তেজনা। মানেটা কি? এ সবের মানেটা কি?

আদিম প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে। নরম চোখে বারবার লিলিয়ানের দিকে তাকাচ্ছে রানা। একবার ভাবলো, আমি যে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, ও কি তা টের পাচ্ছে?

যেহেতু স্বামী-স্ত্রী, একটাই ভাড়া নেয়া হয়েছে ঘর। নিজেকে তিরস্কার করলো রানা। শালা!

আর লিলিয়ান ভাবছে, ওর আর কি দোষ, সব দোষ পরিবেশের! যখন রাশিয়ায় ছিলো, এ-ধরনের কুচিন্তা ওকে স্পর্শই করতে পারেনি। কিন্তু এখন যে আমেরিকায় রয়েছে, সেখান ফ্রি সোসাইটি, কাজেই লোভ-লালসার পাখা তো গজাবেই। আহা বেচারী, বিদেশ-বিভূঁইয়ে একা এসেছে, পাশে একটা মেয়ে থাকলে রিয়াকশন তো হবেই। তবে হাবভাবে যতোই আদি রসের বাড়াবাড়ি থাকুক, হয়তো শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে। আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে ওর পদস্থলন ঘটান সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল লিলিয়ানের। ভাবলো, আমি ওকে কোনো সুযোগ দিতে চাই না, কিন্তু ও যদি সুযোগ নিতে চেষ্টা না করে, আমি বুঝবো আমার নারীত্বকে অপমান করা হলো। মনে মনে স্বীকার করলো সে, মেয়েরা বড় জটিল।

‘তুমি বিবাহিত?’ ভরপেট খেয়েদেয়ে রাত এগারোটায় রেস্টোরান্ট থেকে বেরুলো ওরা, গাড়িতে চড়ার সময় যত্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

‘হ্যাঁ,’ সংক্ষেপে জবাব দিলো রানা। চারদিকটা ভালো করে দেখে

নিতে ব্যস্ত ।

জোর করে হাসলো লিলিয়ান । ‘কি নাম তার ? কেমন দেখতে সে ?’ শরীরের ভেতর রক্তশোত মন্ত্র হয়ে পড়লো । শিরশিরে অনুভূতিটা আর নেই ।

জবাব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলো রানা । ‘এখনো আশি ডিগ্রীর কম নয়,’ জুলাইয়ের তাপমাত্রা আন্দাজ করলো ও ।

‘হিউমিডিটি আরো বেশি হবে । উত্তর দেবে না ?’

গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা । ‘তুমি জানো ।’

‘আরে না ! তোমার সম্পর্কে তেমন কিছুই আমাকে জানানো হয়নি...’ পরমুহূর্তে রানার কথা বোধগম্য হলো, পুলকের আতিশয্যে অবশ হয়ে গেল লিলিয়ানের সারা শরীর । ‘ঠাট্টা করো না তো ?’

‘না ।’

‘কাউকে ভালোবাসো ?’

‘না ।’

‘কেউ তোমাকে ?’

‘একজন বাসতো, সে বেঁচে নেই !’ মুহূর্তের জন্যে রেবেকার কথা মনে পড়লো রানার । ‘আরেকজন ভালোবাসে, কিন্তু সে অণু রকম ভালোবাসা ।’ মনটা কেমন যেন হয়ে গেল রানার—বেঁচে আছে, কিন্তু ওর জীবন থেকে যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে সোহানা ।

রানার বিষণ্ণ চেহারা দেখে এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়ালো না লিলিয়ান । ওর গাড়ি চালানো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো, ‘আমেরিকায় আগেও তুমি এসেছো ।’

‘বেশ ক’বার ।’

উত্তর দিকে আরো খানিক এগিয়ে বাঁক নিয়ে থার্ড এভিনিউয়ে

ঢুকলো রানা, তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে সিক্সটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটে চলে এলো।

রেস্তোরায় ডিনার খাওয়ার সময় লিলিয়ান বলেছিল ছশো চুরাশি নম্বর ওয়েস্ট সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটে থাকে সে, রিভারসাইড ড্রাইভের মুখ থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, তিন তালার একটা অ্যাপার্ট-মেন্টে। সেন্ট্রাল পার্ক ধরে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘ছশো চুরাশি, তাই না?’

‘হ্যাঁ। কেন?’

‘প্রথমে বাড়িটার সামনে দিয়ে ছ’তিনবার আসা-যাওয়া করবো, কেমন?’

‘সত্যি তুমি ধরে নিচ্ছে আবার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

‘হ্যাঁ,’ সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো রানা।

কাঁধ ঝাঁকালো লিলিয়ান। ‘আমি তোমার সাথে তর্ক করতে যাচ্ছি না।’

‘হানিমুনে বেরিয়ে কোন্ মেয়েই বা তা করে?’

আপ সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট থেকে সেভেনটি থার্ডে চলে এলো মাস্টাং, তারপর রিভারসাইড ড্রাইভের পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে এসে সেভেনটি-সিক্সে ঢুকলো। পর পর আরো ছ’বার চক্কর দিলো রানা। তারপর ওয়েস্ট এণ্ড এভিনিউ আর সেভেনটি ফিফথ্-এর মোড়ে নামিয়ে দিলো লিলিয়ানকে। ‘ঠিক পনেরো মিনিট সময় নেবে তুমি’ বললো ও। ‘একটা কি ছোটো স্যুটকেস, তার বেশি নয়। এগারোটা পঁচিশে বাড়িটার বাইরে থাকবো আমি। ঠিক আছে?’

মাথা ঝাঁকালো লিলিয়ান। যার যার হাত ঘড়ি চেক করলো

ওরা। সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটের দিকে ফিরে যাচ্ছে লিলিয়ান, গাড়িটা ব্রডওয়ে-তে তুলে নিয়ে এসে পার্ক করলো রানা। পরচুলা পরা একজোড়ো কলগার্ল ওকে দেখে এগিয়ে আসছিল, ঘন ঘন মাথা নেড়ে তাদেরকে হতাশ করলো ও। আমেরিকার সবগুলো বড় শহরের যে-কোনো রাস্তায় এদেরকে দেখা যাবে, খদ্দেরের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে। দেহ দানই এদের পেশা। রাশিয়ায় যা কল্লনাও করা যায় না।

মেয়ে দুটো মোড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, উল্টোদিকের পথ ধরলো রানা। দুশো চুরাশি নম্বর বাড়িটা দূর থেকেই দেখা গেল, রাস্তার দু'পাশে চোখ বুলিয়ে কোনো ডেলিভারি ভ্যান বা টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক আছে কিনা দেখে নিলো ও। কারো ওপর নজর রাখার জন্যে সাধারণত এ-ধরনের বাহনই ব্যবহার করা হয়। নেই—কিন্তু তার মানে এই নয় যে সত্যি কেউ নজর রাখছে না। রানা লক্ষ্য করলো, আশপাশের প্রায় প্রতিটি বাড়ির দোরগোড়ায় একটা করে খিলান, খিলানের ভেতরটা অন্ধকার। ওই অন্ধকারে, বা কোনো বাড়ির ছাদেও কেউ থাকতে পারে। কে জানে, হয়তো দুশো চুরাশি নম্বরের কোনো জানালা দিয়ে রাস্তার ওপর চোখ রাখছে কেউ। জ্যাকেটের বোতাম খুলে ফেললো রানা।

একটা কিশোরকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো ও। নিগ্রো, হাভাতে। ত্রিয়মান চেহারা, গায়ে নোংরা কাপড়। উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে হাঁটতে ডাস্টবিনের সামনে থামলো। উকি দিয়ে দেখছে তুলে নেয়ার মতো কিছু আছে কিনা ভেতরে। ছানয়ার অন্ততম ধনী দেশ এমনকি আমেরিকাও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না।

আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, কিশোরের আগমন শুভ-লক্ষণ নয়। ডাস্টবিনের ভেতর খুঁকে রয়েছে, সিধে হবার নাম নেই। সন্দেহটা আরো বাড়লো রানার। ছোকরা কাউকে সিগন্যাল দিচ্ছে না তো ?

অন্ধকার একটা খিলান থেকে রাস্তার আলোয় বেরিয়ে এলো দু'জন। নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। মেয়েটার বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, ছেলেটার বিশ কি বাইশ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে। সম্ভবত দু'জনেই মাতাল, স্থির ভাবে দাঁড়াতে পারছে না। এতো দীর্ঘ চুমো খেলে ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরুবে না ?

হেসে ফেললো রানা।

আর ঠিক তখনই ডাস্টবিনের ভেতর থেকে মাথা তুলে সিধে হলো নিগ্রো কিশোর। ঘাড়ে ঠাণ্ডা ধাতব স্পর্শ পেলো রানা। পিছন থেকে কর্কশ কণ্ঠে আদেশ এলো, 'সাবধান ! নড়ো না !'

'বেশ,' ফিসফিস করে বললো রানা। 'কি চাও ?' বেশ বুঝতে পারছে, ঘাড়ে ওটা ঠেকে আছে ছোরার চওড়া ফলা।

'ঘড়ি আর ওয়ালেট,' পিছন থেকে বললো ছিনতাইকারী। মদের গন্ধ পেলো রানা। 'আগে ওয়ালেটটা। আস্তে করে বের করো পকেট থেকে, পিছন দিকে ফেলো।'

'তুমি ভুল করছো,' শান্তভাবে বললো রানা। লক্ষ্য করলো, নিগ্রো ছেলেটা ঘন ঘন রাস্তার দু'পাশে তাকাচ্ছে। পুলিশের গাড়ি আসতে দেখলে সঙ্গীকে সাবধান করে দেবে সে।

'চোপ শালা ! যা বলছি কর্ !'

সদ্য রাশিয়া থেকে এসেছে বলেই সম্ভবত, সমাজতান্ত্রিক আর

পুঁজিবাদী ছুনিয়ার পার্থক্যটা বড় বেশি চোখে রাখছে রানার। পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে সারা বছরে গোটা রাশিয়ায় দশ কি বারোটোর বেশি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি, প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে এবং দৃষ্টান্তমূলক সাজা পেয়েছে। আর আমেরিকায়? যে-কোনো বড় শহরের প্রতিটি রাস্তায় প্রতিদিন কয়েক ডজন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে, সর্বস্ব খোয়াচ্ছে নিরীহ পথচারী, বাধা দিতে গেলে আহত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে, প্রায় ক্ষেত্রেই অপরাধী ধরা পড়ে না। আর তৃতীয় বিশ্বের কথা চিন্তা না করাই ভালো। সেখানে অনেক দেশেই ছিনতাই হচ্ছে পুলিশের সাইড বিজনেস।

তিন সেকেন্ডের মধ্যে এ-নব চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়, ইতিমধ্যে পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে ফেলেছে ও।

‘পিছন ফিরবে না, ওটা ফেলে দিয়ে ছ’পা সামনে বাড়ানো!’

ওয়ালেট ফেলে দিলো রানা, রুদ্ধশ্বাসে বললো, ‘পুলিশ!’ বিদ্যুৎবেগে আধ পাক ঘুরলো, দেখলো ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে রাস্তার ওপারে নিখোঁ কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। রানার চালাকিটা বুঝতে পারার আগেই আধমণ ওজনের একটা ঘুসি খেলো চ্যাপ্টা নাকে। অপর হাতটা দিয়ে তার বুকে ধাক্কা দিয়েছে রানা, ছিটকে গেল দেয়ালের দিকে, শক্ত ইটের সাথে ঠুকে গেল মাথা। ছোরাটা নর্দমায় পড়ে ডুবে গেল। নিজের জায়গা ছেড়ে রানা নড়লো না, শুধু ঝুঁকে তুলে নিলো ওয়ালেটটা। ‘ভাগো,’ শান্ত গলায় বললো ও। ‘বললাম না, ভুল করছো!’

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে সিঁধে হলো লোকটা। চল্লিশের কম নয় বয়স, হাড়িসার চেহারা। টলমল পা ফেলে চলে

যাচ্ছে। কেন যেন মায়া লাগলো রানার। রাস্তার ওপারে তাকালো ও। কিশোরটাকে কোথাও দেখা গেল না। ব্যর্থ লোকটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা মর্মবেদনায় ছেয়ে গেল মনটা, লোকটার দিকে পিছন ফিরলো ও।

সেভেনটি-সিক্সথ্ স্ট্রীটের বাড়িগুলোর জানালা, দোরগোড়া, আর পার্ক করা গাড়িগুলোর ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলালো রানা। রিভারসাইড ড্রাইভের মোড়ে বাঁক নিচ্ছে একটা ট্যাক্সি। ড্রাইভের দিকে শান্ত ভাবে এগোলো ও। উত্তর দিকে বাঁক নিয়ে সেভেনটি-সেভেনথ্ ঘুরে ব্রডওয়েতে মাস্টাঙের কাছে ফিরে এলো। ষাট বছরের এক বুড়োর সাথে দর কষাকষি করছে পরচুলা পরা সেই মেয়ে দুটো। দুটো শব্দ কানে এলো রানার—‘জমজমাট পার্টি’। মাস্টাঙের দরজা খুললো ও।

ঠিক এগারোটা পঁচিশে ঘ্যাচ্ করে দুশো চুরাশি নম্বর ওয়েস্ট সেভেনটি-সিক্সের সামনে থামলো গাড়ি। রূপালি জরির কাজ করা কালো একটা ঢোলা পোশাক পরে বেরিয়ে এলো রহস্যময় নারী। হাইহিলের খটাখট পরিচিত আওয়াজ আর হাঁটার ভঙ্গি দেখে চিনতে কোনো অসুবিধে হলো না।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো রানা, ‘কেউ মারা গেছে?’

‘মানে?’ অবাক হলো লিলিয়ান।

রানা কিছু বললো না।

‘কি হলো? হঠাৎ...’, পরমুহূর্তে রানার কথা বোধগম্য হলো, সেই সাথে গম্ভীর হয়ে গেল লিলিয়ান। বললো, ‘তুমি বড় অদ্ভুত মানুষ, রবিন। অদ্ভুতভাবে কথা বলো। বুঝতে সময় লাগে।’

‘বুঝতে যদি পেরে থাকো তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে

না কেন ?’

চোখ জোড়া হেসে উঠলো লিলিয়ানের। ‘কালো কাপড় পরলাম কেউ মারা গেছে বলে নয়। তবে তুমি ঠিকই ধরেছো—শোকই প্রকাশ করছি আমি, আগাম।’

‘মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বলতে চাও ?’

‘কাজ শেষ হলে মস্কোয় ফিরে যাবে তুমি, জীবনে আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। শোকে কাতর হবার মতো একটা ব্যাপার নয় ?’

‘তা বটে,’ মুখে বললো বটে রানা, কিন্তু মনে মনে ভাবলো, মেয়েটার ট্রেনিঙে খুঁত রয়ে গেছে। অতি নাটুকে হয়ে ওঠার প্রবণতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আরো একটা ব্যাপার পরীক্ষার হয়ে গেল, নিজেকে বড় বেশি চালাক মনে করে। মেয়েদের মন সত্যি বড় জটিল। পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে উঠতে এখনো সময় নেবে এই মেয়ে।

একটা বুকস্টলের সামনে গাড়ি থামিয়ে কয়েকটা পেপারব্যাক কিনলো রানা, ঘুম আনার জন্যে ওষুধের কাজ দিতে পারে। আরেক বার গাড়ি থামালো একটা সুপারমার্কেটের সামনে। একা নেমে গেল রানা, ফিরে এলো হাতে এক গোছা গোলাপ নিয়ে। লিলিয়ানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, ‘আজ রাতের জন্মে আমার তরফ থেকে তোমাকে উপহার।’

স্যাভয়ের নরম বিছানায় ওই গোলাপ দু’জনের মাঝখানে কাঁটা হয়ে থাকলো। বিছানার ঠিক মাঝখানটায় ফুলগুলো রেখে এক ধারে শুয়ে পড়লো লিলিয়ান, রানা তখন চেয়ারে বসে বই পড়ছে। রাত একটার দিকে বই বন্ধ করলো ও। আলো নিভিয়ে বিছানায় উঠলো।



ফুলগুলো সরালো না। তখনো জেগে ছিলো লিলিয়ান, কিন্তু রানাকে বুঝতে দিলো না। ফুল ফুলের জায়গায় থাকবে বুঝতে পেরে একটু পর ঘুমিয়ে পড়লো সে। ক্ষীণ একটু আশাহত হলেও, দেহ-মনে কোনো টেনশন ছিলো না। ঘুমটা হলো নিবিড়।

রানা অবশ্য আরো অনেকক্ষণ জেগে থাকলো। এর আগের কোনো অ্যাসাইনমেন্টে এতোটা অসহায় বোধ করেনি ও। বুঝতেই পারছে না কোথেকে শুরু করবে কাজটা। এই পেশায় প্রথম যখন টোকে তখন প্রায়ই একটা ভয় অস্থির করে তুলতো ওকে, অ্যাসাইনমেন্ট না ব্যর্থ হয়। সেই পুরনো ভয়টা আজ অনেক দিন পর ফিরে এসেছে মনে। কোথায় ডালচিমস্কি? কোথায় তাকে খুঁজবে সে? কাউকে কিছু বলা চলবে না, কারো সাহায্য নেয়া যাবে না, তাহলে কিভাবে শুরু করবে?

কারো না কারো সাহায্য নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিলো রানা। খানিকটা স্থির হলো মন। ঘুম এলো।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো মাথার চূলে আঙুলের আলতো স্পর্শে। ভান করে পড়ে থাকলো রানা। একটু পর নরম ঠোঁটের স্পর্শ পেলো কপালে। গোপনে আদর করে বিছানা থেকে নেমে গেল লিলিয়ান। রানার সারা শরীরে ভালোলাগার মিষ্টি একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। তবু সেই সাথে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো, হয়তো আরো ঘনিষ্ঠ না হয়ে পারা যাবে না, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে আমাকে।

বাথরুম থেকে বেরুলো লিলিয়ান, এই সময় নক হলো দরজায়। ব্রেকফাস্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওয়েটার। তার সামনেই রানার বুকে হাত রেখে নাড়া দিলো লিলিয়ান, ‘আর কতো ঘুমাবে,

ডিয়ার !’

চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার ওপর উঠে বসলো রানা।  
ফুলগুলো চেপ্টে গেছে, কার চাপে কে জানে।

ব্রেকফাস্টের শেষ দিকে, কফি খাবার সময়, রানার দৃষ্টি লক্ষ্য করে  
লিলিয়ান বললো, ‘তুমি কাজ করছো।’

‘সারাক্ষণ।’

‘চোঁঠা জুলাই, ন্যাশনাল হলিডে-তেও, রবিন?’ তাজা ফুলের  
সমস্ত কোমল ভাব ফুটে রয়েছে লিলিয়ানের চেহারায়। হঠাৎ রানা  
উপলব্ধি করলো, জীবন সুন্দর তার কারণ জীবনে যৌবন আছে।

‘সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার এটা একটা কৌশল,’ উত্তরে  
বললো রানা।

‘তারমানে কি কাজটায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে?’

‘এইটুকু—কারো সাহায্য নিতে হবে, এই সিদ্ধান্তটা নিতে  
পেরেছি।’

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে লিলিয়ান বললো, ‘পুরস্কার ঘোষণা  
করছো না কেন?’

‘কাকে দেবো? চিন্তা করো না। দু’এক দিনের মধ্যে পথ একটা  
ঠিকই পেয়ে যাবো। কে জানে, উল্লুকটা হয়তো ছুটি উপভোগ  
করছে। হয়তো সৈকতে রোদ পোহাচ্ছে, কিংবা মেয়েদের সাথে  
টেনিস খেলছে। কিংবা হয়তো বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে আছে  
ফিলাডেলফিয়ার কোনো ব্রথলে। উন্মাদটার পক্ষে সবই সম্ভব।’

নিকোলাই ডালচিমস্কি এই মুহূর্তে রোদও পোহাচ্ছে না, টেনিসও  
খেলছে না। বেভারলি-উইলশায়ার হোটেলের লাক্সারি স্যুইটে

রয়েছে সে; আত্মপ্রেমে মগ্ন ! ভিজ়ে গা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা শুকনো তোয়ালে । এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরিয়েছে সে । আয়নায় একদৃষ্টে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিদ্রূপের হাসি হাসলো লোকটা । ওরা কেউ তাকে এতোদিন চিনতে পারেনি । সে নিজেই কি নিজেকে চিনতে পেরেছিল ? জানতো, তার শিরায় শিরায় ধ্বংসের উন্মাদনা সুপ্ত হয়ে আছে ?

আয়নায় প্রতিফলিত নগ্ন শরীরটার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ডালচিমস্কি । মনে মনে স্বীকার করলো, আমি একটা অতিকায় বনমানুষ । অতিকায়, কিন্তু মেদবহুল নয় । লালচে-কালো লোমে ঢাকা, লোমের গোড়াগুলোয় সোনালি একটু ভাব । বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে আপনমনে হাসলো, তাকে এই অবস্থায় দেখে ভয় পাবে না-ই বা কেন মেয়েরা !

তার ভেতর যে পশুত্বের পরিমাণ আর সবার চেয়ে বেশি, এটা অনেক বছর আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে ডালচিমস্কি । এমন একটা ছকে বাঁধা, বিধিবদ্ধ সমাজে বড় হয়েছে সে যেখানে যে-কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়তে হয় । ছোটোবেলা থেকেই অপরাধপ্রবণ হলেও, বয়স একটু বাড়ার সাথে সাথে অপরাধ গোপন করার কৌশল শিখে ফেলে সে । এ-ব্যাপারে তাকে পথ দেখায় তার বাবা ।

তার বাবা অসম্ভব বদরাগী ছিলো । বাবার সেই রাগ নগ্নভাবে প্রকাশ পেতো । বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অব্থা মাকে মারধর করা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । ছেলেমেয়েদের গায়ে বাবা তখনো হাত তুলতো না, শুধু চোখ রাঙাতো আর দাঁত চাপতো । কিন্তু অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মা যখন চলে গেল, নতুন

শিকার হিসেবে ছেলেমেয়েদের বেছে নিলো বাবা ।

সেই অল্প বয়েসেই নিজের ছোটো ছই বোনকে ছ'চোখে দেখতে পারতো না ডালচিমস্কি। ওদের অপরাধ ছিলো, ওরা তাকে এড়িয়ে চলতো, তার ব্যাপারে নিলিপ্ত থাকতো । সে নাকি নোংরা, তার গায়ে নাকি উকুন, পা না ধুয়ে বিছানায় ওঠে, পকেটে রুমাল রাখে না, ইত্যাদি হাজার রকম অভিযোগ । মা চলে যাবার পর ডালচিমস্কি লক্ষ্য করলো, তার চেয়ে বোন ছোটোর ওপরই বাবার বেশি রাগ । ডালচিমস্কি ন্যাড়া ছিলো, কাজেই বাবা তার কান ধরতো । কিন্তু বোন ছোটোর ছিলো লম্বা চুল, সেই চুল ধরে হিড়হিড় করে ওদের টেনে আনতো বাবা । ডালচিমস্কি মার খেলে চৈচিয়ে পাড়া মাথায় করতো, কিন্তু তার চোখে কেউ কখনো পানি দেখেনি । বোন ছোটো মার খেয়ে অঝোরে কাঁদতো, কিন্তু কোনো শব্দ করতো না । শব্দ না করায় আরো উৎসাহ পেতো বাবা ।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে এক টিলে ছই পাখি মারার একটা সুযোগ দেখতে পেলো ডালচিমস্কি । বাবা বাড়িতে ফিরলেই বোনদের নামে সত্যি-মিথো অভিযোগ করতো সে । বাবা তাকে সাহায্যকারী হিসেবে পেয়ে খুশিই হলো । কিছু দিন পর দেখা গেল ঝাড়ি ফিরেই বাবা ডালচিমস্কিকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, আজ কে কি অপরাধ করেছে, কার পড়া হয়নি, কাঁচের গ্লাসটা কার হাত থেকে পড়ে ভাঙলো, নোংরা কাপড়গুলো ধোয়া হয়নি কেন, ইত্যাদি । ছই বোনের কে শাস্তি পাবে, সেটা নির্ভর করতো ডালচিমস্কির ওপর । বাবা কার ওপর নির্যাতন চালাবে সেটা ঠিক করে দিতো সে । বাবা যখন বেত দিয়ে বোনদের একজনকে বেদম পেটাতো, অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চকর আনন্দে শিহরিত হতো ডালচিমস্কি ।

বোনেরা তাকে ঘরের মতো ভয় করতে শুরু করলো। এটা লক্ষ্য করে নতুন আরেক ধরনের উল্লাস বোধ করতো ডালচিমস্কি। সে উপলব্ধি করলো, মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালালে বিপদ হবার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ মুখ বুজে সহ্য করাই ওদের স্বভাব। সম-বয়েসী বন্ধুদের চোটপাট দেখাতে গিয়ে উল্টো শিক্ষা পেয়েছে সে, তারা মারমুখো হয়ে তেড়ে আসে।

শুধু বাড়িতে নয়, স্কুলেও একই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে সফল হলো ডালচিমস্কি। নিজেকে সে মেয়েদের সাথে লাগতে যেতো না, তাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য ছেলেদেরকে খেপিয়ে তুলতো। এভাবেই তার কৈশোর কাটলো। যৌবনে আর কলেজে পা দিয়ে স্বমুখি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো ডালচিমস্কি। সে না চাইতেই মেয়েরা তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। আর হবে না-ই বা কেন? হাজার লোকের ভিড়ে সবচেয়ে লম্বা দেখায় তাকে। সুদর্শন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সব রকম খেলাধুলোয় কলেজের গর্ব। মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিতে শুরু করলো ডালচিমস্কি। প্রথমে নরম আচরণ করে কাছে টানে, তারপর বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার চেষ্টা চালায়। নিজের ভেতর যে পশুত্ব আছে, তার স্বরূপ এই সময় ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। সেই সাথে নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে সে। প্রতিবার একটা করে মেয়েকে বেছে নেয় ডালচিমস্কি। ঘনিষ্ঠ হবার পর নিজের ঘরে নিয়ে আসে তাকে। প্রথম প্রথম মেয়েটা বুঝতে পারে না তাকে আদর করা হচ্ছে নাকি নির্যাতন করা হচ্ছে। মেয়েটা ভাবে, প্রেম আর ভাবাবেগের গভীরতা খুব বেশি, তার সাথে যোগ হয়েছে গায়ে অসুরের শক্তি—সেজন্যেই কি এই বাড়াবাড়ি? কিন্তু কিছু দিন যাবার পর তার ভুল ভাঙে। প্রথমে ডালচিমস্কি আদর

দিয়ে শুরু করলেও, দিনে দিনে আদরের মাত্রা কমতে থাকে, বাড়তে থাকে নির্যাতনের মাত্রা। এমন সব কুরুচিপূর্ণ আদর করে সে, মেয়েটা বুঝতে পারে একটা সেক্স ম্যানিয়াকের খপ্পরে পড়ে গেছে সে। লোক লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারে না, তবে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে পারে, কারো কারো বেশ দেরি হয়ে যায়। তবে ডালচিমস্কির এ-ব্যাপারে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। একজন যেতে না যেতে আরেকজন স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয়। কাজেই অত্যাচার চালাবার জন্যে মেয়ের কখনো অভাব হয় না তার।

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে ডকুমেন্টস তৈরির ওপর একটা দু'-বছরের কোর্স কমপ্লিট করে ডালচিমস্কি। পররাষ্ট্র দফতরে তিন বছর চাকরি করে, বিদেশের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রগুলো রক্ষণাবেক্ষণই ছিলো প্রধান দায়িত্ব। এই চাকরি করার সময়ই ডকুমেন্টস কিভাবে জাল করতে হয় তার কৌশল আয়ত্ত করে সে। এরপর তাকে বিদেশে পাঠানো হয়, বিভিন্ন দূতাবাসে চীফ ডকুমেন্টস এক্সপার্টের সহকারী হিসেবে কাজ করে সে। ব্রিটেনে দু'বছর, ফ্রান্সে দেড় বছর, জার্মানীতে এক বছর, এবং আমেরিকায় এক বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে যোগ দেয় কে. জি. বি.-তে।

পলিটিক্স নিয়ে আগ্রহ বা মাথাব্যথা, কোনোটাই ছিলো না ডালচিমস্কির। কিন্তু স্ট্যালিনপন্থী কিছু লোক মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতার কথা কিভাবে যেন জেনে ফেলে। দলে ভেড়ার জন্যে প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে। ডালচিমস্কি সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে, এই সময় তার পদোন্নতি ঘটে। তাকে জানানো হয়, স্ট্যালিনপন্থীরা চেয়েছে বলে তার এই পদোন্নতি হয়েছে। প্রস্তাবটা

আবার দেয়া হয় তাকে, সেই সাথে বলা হয় মেয়েদের ওপর তার দুর্বলতার কথা সংশ্লিষ্ট মহলের জানা আছে। আরো বলা হয়, ডাল-চিমস্কি রাজি হলে দলে মেয়ে সদস্য বাড়াবার দায়িত্বটা তাকেই দেয়া হবে। সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রাজি হয়ে গেল ডালচিমস্কি।

মাথার ওপর প্রভাবশালী একটা মহলের ছত্রছায়া পেয়ে বেপ-রোয়া হয়ে উঠলো পিশাচটা। দু'জন পুরুষ সহকারী ছিলো তার, তাদেরকে সরিয়ে মেয়ে সহকারী নিলো। প্রথম বছরে ছ'টা মেয়েকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করে পাঠালো সে, তাদের বদলে নতুন মেয়েরা কাজে যোগ দিলো। এক বছর পর আবার আমেরিকায় পাঠানো হলো তাকে। স্ট্যালিনপন্থী নেতারা এবার তার কাঁধে বড় একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। বিদেশে যারা কে. জি. বি. এজেন্ট আছে তাদেরকে দলে ভেড়াতে হবে, কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন এমন বিদেশী লোকদের কাছেও তুলে ধরতে হবে স্ট্যালিনবাদের আদর্শ। ছ'মাস পর দেশে ফিরলো ডালচিমস্কি, তার সাফল্য দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো স্ট্যালিনপন্থী নেতারা। বিশেষ করে কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতি আছে এমন কিছু আমেরিকান মেয়েকে স্ট্যালিনবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে সে।

স্ট্যালিনপন্থীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিলো ডালচিমস্কি, পালাতে হবে। এ ধরনের পরিস্থিতি যে দেখা দিতে পারে, সে ধারণা তার আগে থেকেই ছিলো। কাজেই পালাবার রাস্তা তৈরি ছিলো তার। আমেরিকায় থাকতে হলে প্রচুর মার্কিন ডলার দরকার হবে, তাই নির্দিষ্ট একটা ব্যাংকের ভন্ট থেকে টাকা লুঠ করার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সাথে নিলো

সে। আর নিলো কে. জি. বি. র মূল্যবান দলিলগুলোর একটা—  
টেলি-বম খাতা।

তার ভেতরে যৌন-বিকৃতি আছে, এটা ডালচিমস্কি জানতো।  
ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে দু'জনকে খুন করার সময় জানলো তার  
ভেতরে একজন খুনীও বাস করে। ওদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে  
এমন অদ্ভুত উল্লাস বোধ করে সে, নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়। রাজ-  
নৈতিক আদর্শের কারণে নয়, শ্রেফ অকারণ প্রতিশোধ নেয়ার উন্মা-  
দনা থেকে, আর নিজেকে রক্ষার জন্যে কবচ হিসেবে কাজে লাগবে  
মনে করে দেশ ছেড়ে পালাবার সময় টেলি-বম বুকটা সাথে করে নেয়  
সে। তারপর, বিপজ্জনক এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে নিরাপদ বোধ  
করার পর সে উপলব্ধি করলো, ঘটনাচক্রে ছুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতা-  
বান লোক হয়ে পড়েছে সে। ব্যাপারটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলো  
ডালচিমস্কি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, উল্লাস আর পুলক তাকে  
উন্মাদ করে তুলছে। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একশো চল্লিশটা  
প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে পারে সে, পারে ধুলোর সাথে মিশিয়ে  
দিতে, যেগুলোর বেশিরভাগই সামরিক স্থাপনা—এই চিন্তাটা  
পাগল করে তুললো তাকে। ছুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটার  
নাম ডালচিমস্কি। আমি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারি।

ডেনভারে প্রথম টেলিফোনটা শ্রেফ কৌতুক করার জন্যে করলো  
ডালচিমস্কি। দেখি তো কি হয়, এই রকম একটা ভাব কাজ করেছিল  
তার ভেতর। টেলি-বম এলিস খেলার ইউ. এস. আমি কেমিক্যাল  
বেসে গিয়ে তিনজন লোককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলো, তারপর  
ডিনামাইট ভর্তি ট্রাক নিয়ে ধাক্কা খেলো এম. নামে চিহ্নিত বিল্ডিং-  
টার সাথে। এই ঘটনার পরপরই ডালচিমস্কি উপলব্ধি করলো, তার



ভেতরে ধ্বংস করার একটা প্রবণতা রয়েছে। ইউ. এস. আমি কেমিক্যাল বেস বিক্ষোবিত হওয়ার খবর শুনে অভূতপূর্ব পুলক অনুভব করলো সে, যে পুলকের কাছে নারী-সন্তোগের চরমানন্দও কিছু নয়।

ডালচিমস্কি জানে, তাকে খুঁজে বের করার জন্যে কে. জি. বি. লৌক পাঠাবে আমেরিকায়। ছনিয়ার বুক থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে চেষ্টার কোনো ক্রটি করবে না রাশিয়া। কিন্তু তার হাতে রয়েছে সকল মারণাস্ত্রের সেরা মারণাস্ত্র, টেলি-বম বুক—ছোট্ট একটা খাতা—তাকে রক্ষা করার জন্যে সেটাই কি যথেষ্ট নয় ?

তারপর আবার ফোন করলো ডালচিমস্কি। একটা উদ্দেশ্য ছিলো, যারা তাকে ধরতে আসবে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া। দ্বিতীয় কারণটা ছিলো, আবার সেই পুলক অনুভব করার উদগ্র বাসনা।

এভাবে একের পর এক টেলি-বম বিক্ষোবণ ঘটতে থাকলে ফলাফল কি দাঁড়াবে ডালচিমস্কির তা ভালো করেই জানা আছে। প্রথম প্রথম মার্কিন ইন্টেলিজেন্সগুলো কিছু বুঝতে না পারলেও আরো ছ'একটা ঘটনা ঘটলেই তারা আসল ব্যাপার টের পেয়ে যাবে। রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করেছে, আমেরিকাকে তারা ধ্বংস করতে চায়, ঠিক এই উপসংহারে পৌঁছবে। তারপরই শুরু হবে আসল খেল। রাশিয়ার ভেতর স্যাবোটাজ চালাবার কোনো না কোনো আয়োজন নিশ্চয়ই মার্কিন সরকারও করে রেখেছে। পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করবে তারা। কিংবা তারা হয়তো রাশিয়ার এ-ধরনের হঠকারী আচরণে এমন রাগাই রাগবে, পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু করে দিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।

সত্যতা একদিন বিলীন হবেই, ছনিয়া অনন্তকাল টিকবে না,

মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য, সেই ধ্বংসের কারণ যদি আমি হই, তাহলে মন্দ কি ! কয়েক যুগ ধরে আশংকা করছে মানুষ, এই বৃষ্টি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো, কিন্তু বাধেনি । বিশ্বযুদ্ধ বাধলে কি ঘটবে কেউ তা জানে না, মানুষ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে । সে যদি যুদ্ধটা বাধিয়ে দিতে পারে, মানবজাতিকে অনিশ্চয়তার কবল থেকে রক্ষা করা হবে । উপরি পাওনা, নিজের জীবদ্দশায় পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞটা চাক্ষুষ করা হবে । এই সব যুক্তি খাড়া করে ডালচিমস্কি, আর মনে মনে পুলকিত হয় । তারপর নিজেকে প্রশ্ন করে, আমি কি পাগল ? নাকি পশু ?

নিজের ভেতর থেকে উত্তর আসে, মানুষ মাত্রই পশু কিন্তু মানুষ তা স্বীকার করে না ।

আমি নিজেকে চিনেছি । নিজের পরিচয়টা অস্বীকার করি না ।

আমি পশু ।

একটা পশুর যে আচরণ করার কথা আমি ঠিক তাই করছি ।

এ ধরনের চিন্তা ভাবনার ফলে মানবজাতির অনিষ্ট করার জন্যে নিজের কাছ থেকে একটা লাইসেন্স পেয়ে গেছে ডালচিমস্কি । তার কোনো অপরাধবোধ নেই । মানুষকে সে ভালোবাসে না ।

কাল রাতে শিকাগোতে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি একটা মোটеле ছিলো ডালচিমস্কি । ভালো ঘুম হয়নি, বারবার শুধু মনে হয়েছে ছুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান আর বিপজ্জনক লোকটা তৃতীয় শ্রেণীর একটা মোটеле রাত কাটাতে কেন ! সকাল হতে না হতে তাই বেভারলি-উইলশায়ারে স্যুইট ভাড়া নিয়েছে সে । এই হোটেলের গল্প আগেই শুনেছিল, ইচ্ছেও ছিলো সুযোগ পেলে এখানে একবার উঠবে । গল্পটা মিথ্যে নয়—হোটেলের লবি, লাউঞ্জ আর স্যুইমিং

পুলে সারাক্ষণ সুন্দরী মেয়েদের ভিড় লেগে আছে। এখন অবশ্য কাজের কথা ভাবছে সে, তা না হলে সুন্দরী দেখে একটা মেয়েকে পটিয়ে-পাটিয়ে ঘরে আনতে পারতো। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ডালচিমস্কি অনুভব করলো, উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে।

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়ে গা মুছে কাপড় পরে নিলো ডালচিমস্কি। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো, সবুর করো বাছা, মজা করার আরো অনেক সময় পাবে। এখুনি তো আর ছুনিয়াটা ধ্বংস করে দিচ্ছে না তুমি।

একটা কথা ভেবে খারাপ হয়ে গেল মনটা। বেভারলি-উইল-শায়ারে মাত্র একটা দিন থাকতে পারবে সে। কিন্তু মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই, নিরাপত্তার খাতিরে নিয়ম মেনে চলতে হবে তাকে—চব্বিশ ঘণ্টার বেশি একটানা কোথাও তার থাকা চলবে না।

সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে কে. জি. বি. কর্তৃপক্ষ জেনে ফেলেছে টেলি-বম খাতাটা চুরি গেছে। কে চুরি করেছে তা-ও তারা জানে। ঘেমে গোসল হচ্ছে ব্যাটারা, আপনমনে হাসতে হাসতে ভাবলো সে। যতোই সময় পেরোবে ততোই দিশেহারা বোধ করবে তারা, ততোই অসহায় বোধ করবে। ক্রেমলিন কর্তৃপক্ষের আরাগ্নি হারাম হয়ে যাবে।

হোটেলের কফিশপে নেমে এসে ভরপেট নাস্তা সারলো ডালচিমস্কি। তারপর সুইমিং পুলের কিনারায় একটা চেয়ারে বসলো কিছুক্ষণ। অর্ধনগ্ন নারী-দেহ আবার তাকে উত্তেজিত করতে শুরু করায় ওখান থেকে সরে এলো সে। সাড়ে দশটা বাজে। একটু হাঁটার জন্যে হোটেল থেকে বেরিয়ে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললো—

নিজেকে কষ্ট দেয়ার কোনো মানে হয় না, কিছুই যখন ভালো লাগছে না, আরেকটা টেলিফোন করা যাক।

এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে দশ মিনিট পর একটা বৃন্দ দেখতে পেলো ডালচিমস্কি। চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো সে, কাঁচের দরজাটা বন্ধ করলো সযত্নে। প্রথমে পকেট থেকে এক-গাদা খুচরো পয়সা বের করে কাউন্টারের ওপর সাজালো। তারপর ছোটো একটা কালো নোটবুক বের করলো। এটাই সেই সর্বনেশে খাতা। নম্বর আর নাম দেখে নিয়ে ডায়াল করতে যাবে, এই সময় টোকা পড়লো দরজায়।

চমকে উঠে ঘাড় ফেরালো ডালচিমস্কি।

পানপাতা আকৃতির একটা মুখ, তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। হাসিতে মুক্তো ঝরছে। জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনার কি দেরি হবে, মিস্টার?’

ডালচিমস্কির মনে হলো, মেয়েটা ইচ্ছে করলে নায়িকা হতে পারে। চেহারায় কোনো খুঁত নেই, গায়ের চামড়া আর দাঁত নিষ্কলংক। ফোন নাহয় পরে করা যাবে, তারচেয়ে মেয়েটার সাথে আলাপ জমানো যায় কিনা দেখা যাক। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করলো সে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুললে চলবে কেন। নামটা সই না করে মেয়ে-টেয়ের কথা ভাববে না সে। মৃদু হেসে উত্তর দিলো, ‘না, এই এক মিনিট।’

‘ধন্যবাদ,’ বলে একটু দূরে সরে গেল মেয়েটা।

তার দিকে পেছন ফিরে দ্রুত ডায়াল করলো ডালচিমস্কি।

সেদিন সন্ধ্যা ছ’টায় পাশে ‘সহধমিনী’-কে নিয়ে কালার টিভিতে আইউইটনেস নিউজ দেখছিল রানা। মার্কেটিং সেরে হোটেল

স্যাভয়ের এই কামরায় খানিক আগে ফিরেছে ওরা। প্রথমে দেখানো হলো চ্যানিউট, ক্যানসাসে সেদিন-বিকেল কি ঘটেছে। ক্যানসাস টেলিফোন কোম্পানীর মেইন সুইচিং পয়েন্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো। গোটা রাষ্ট্রের টেলিফোন নার্ড সেন্টার বলা হয় ওটাকে। একের পর এক কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটেছে ওখানে। এক উপকূল থেকে আরেক উপকূল পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ সম্ভব করে তোলে যে সার্কিটগুলো তার সবগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে। অন্যান্য আরো কয়েক ডজন কী লাইন কোনো কাজ করছে না। রাষ্ট্রের তিনটে অন্যতম বিশাল টেলিভিশন নেটওয়ার্কের টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। টেলিফোন কোম্পানীর চার ধারে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তিরিশটার মতো রোডব্লক খাড়া করা হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষী এবং পুলিশ বিভাগের সদস্যদের জানানো হয়েছে, নীল মটরসাইকেল আরোহী কাউকে দেখামাত্র আটক করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, ঘটনাস্থল থেকে নীল মটরসাইকেল আরোহী একজন লোককে পালাতে দেখা গেছে। নিজস্ব সংবাদদাতার সর্বশেষ রিপোর্ট এইমাত্র এসে পৌঁছুলো। থাইয়ার শহর থেকে তিন মাইল দূরে এক খামার বাড়িতে স্টেট পুলিশ ঘেরাও করে রেখেছে লোকটাকে।

‘সবচেয়ে ভালো হয় লোকটা যদি সুইসাইড পিল খায়,’ বিড়বিড় করে বললো রানা। ‘তা না হলে গুলি খেয়ে মরুক। ধরা পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।’

রানা রেগে গেছে বুঝতে পেরে বিস্মিত হলো লিলিয়ান, তবে রাগের কারণ বুঝতে না পারলেও কোনো প্রশ্ন করলো না। তার জানা নেই অন্তর্ঘাতক ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন রুশ সেনাবাহিনীতে

আর্টিলারির একজন ক্যাপটেন ছিলো, যদিও সেটা অনেক দিন আগের কথা। এবার টিভির পর্দার কাছ থেকে খামার বাড়িটাকে দেখানো হলো, অদৃশ্য একজন বক্তা ব্যাখ্যা করলো, ঘটনাস্থল ক্যানসাস থেকে রিপোর্ট করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ক্যামেরা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন স্টেট আর লোকাল পুলিশকে দেখা গেল বৃত্তাকারে ঘিরে আছে খামার বাড়িটাকে। দ্রুত জুম করলো ক্যামেরা, সদর দরজার পাশে একটা জানালা দেখানো হলো কাছ থেকে। ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটে গেল, কেঁপে উঠলো চোখের পাতা। ঝড়ের বেগে কথা বলে চলেছে রিপোর্টার। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা, কিন্তু জানালার ভেতর কিছু দেখতে পাবার আগেই আরেক দিকে ফিরলো ক্যামেরা। ক্যামেরা ফেরার আগে রানা শুধু দেখলো জানালার পর্দা ঝাঁকি খেলো। তারপরই শোনা গেল পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ।

কয়েক সেকেন্ড আগে লোকটার মৃত্যু কামনা করলেও, কি ঘটছে বুঝতে পেরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল রানার চেহারা, ছ'হাতে মুখ ঢাকলো ও।

‘রবিন!’ ফিসফিস করে ডাকলো লিলিয়ান। কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে একটা সিগারেট ধরালো রানা, সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো।

‘তুমি নিশ্চয়ই এই লোকটাকে খুঁজতে আসোনি, রবিন?’ জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

মাথা নাড়লো রানা। লিলিয়ানকে বলা চলে না, বেচারী অসহায় একটা শিকার। আরো একজন। বলা চলে না, পুলিশ যদি লোক-

টাকে মেরে ফেলে, সবার জন্যেই তা ভালো হবে। জীবিত ধরা পড়লে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে লোকটাকে। তার ওপর নির্যাতন চালানো হবে, এক সময় সব কথা ফাঁস করে দেবে সে। আমেরিকানরা জানবে, রাশিয়ানরা তাদের সাথে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে।

তারপর কি ঘটবে ভাবতেও ভয় হয়।

ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন জীবিত ধরা পড়লে সবচেয়ে খুশি হবে ম্যানিয়াক ডালচিমস্কি। সে-ও হয়তো এই মুহূর্তে টিভির সামনে বসে দৃশ্যটা দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে।

এবার রানা ঠিকই ভেবেছে। বেভারলি-উইলশায়ারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে একুশ ইঞ্চি কালার টিভির পর্দার দৃশ্যটা চাক্ষুষ করছে ডালচিমস্কি। ক্যানসাস রিপোর্ট শেষ হতে সেট অফ করে দিলো সে, কাপড় বদলে বেদিং স্যুট পড়লো। পূর্বদিকের ফ্লাইটধরার আগে হাতে আধ ঘণ্টার মতো সময় বেশি আছে, একটু সঁাতার কাটার সুষোগ হাতছাড়া করা চলে না।

সকালের মধ্যে মস্কোয় পৌঁছে যাবে খবরটা।

ঘেমে নেয়ে উঠবে সবাই। হাহ্-হা !

# নয়

---

‘একটা প্যাটার্ন না থেকেই পারে না,’ ফিফথ এভিনিউ, একটা বুক-স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কথাটা যেন নিজেকেই শোনালো রানা।

‘কিসের প্যাটার্ন?’

লিলিয়ানের কথা রানা শুনতে পেলো না। জাপানী রেস্টোরান্ট থেকে বেশ কিছুক্ষণ হলো বেরিয়েছে ওরা। কখনো হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, কখনো কোনো দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, মাঝে মধ্যে টুক-টাক কেনাকাটাও চলছে। বার কয়েক মূহু চেপ্টা করেছে লিলিয়ান, কিন্তু রানার অন্যমনস্ক ভাবটা দূর করতে পারেনি। রানা যেন মন দিয়ে শুধু নিজের চিন্তা-ভাবনাগুলোই শুনছে।

‘লোকটার মন আমি বুঝি। বেজন্মাটা সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে। তার একটা প্ল্যান না থেকেই পারে না?’

খুক্ খুক্ করে কাশলো লিলিয়ান।

‘তালিকা আর শিডিউল তৈরি করা তার পেশার একটা অংশ ছিলো...প্যাটার্ন একটা থাকতেই হবে।’ আবার বললো রানা।

‘তুমি কি ক্যানসাসের ওই লোকটার কথা...?’



‘যদিও প্যাটার্নটা কি হতে পারে বুঝতে পারছি না,’ বললো রানা, ওর ধারণা লিলিয়ানের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে ও। ‘নাস্তি কিছু একটা হবে, নাস্তি অ্যাণ্ড ট্রিকি—কিন্তু কি সেটা?’

‘হ্যাপি বার্থডে!’ আচমকা উল্লাসে চেষ্টা করে উঠলো লিলিয়ান।

চোখ পিটপিট করলো রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো লিলিয়ানের দিকে। ‘তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?’

‘ভাবলাম অবাক কিছু একটা বলি। দেখে তো মনে হচ্ছিলো না তুমি জানো পাশে কেউ আছে।’

‘সরি...ক্যানসাসের ওই লোক? তার কথা ভেবে ছশ্চিন্তা করো না। এতোক্ষণে ওরা তাকে সম্ভবত মেরে ফেলেছে, কিংবা সে নিজেই হয়তো আত্মহত্যা করেছে। অথচ শুধু শুধু। বেচারার জন্যে দুঃখ হয়, কিন্তু করার কিছু নেই। প্রশ্ন হলো, তাকেই যে বেছে নেয়া হলো...কেন? হয়তো খাতা খুলে যার নামটা প্রথম চোখে পড়ছে তাকেই ফোন করেছে। হয়তো আসলে কোনো প্যাটার্নই নেই। কিংবা হয়তো প্যাটার্ন একটা থাকলেও, সেটাকে ঠিক প্যাটার্ন বলা যায় না।’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলো রানা। রয়াকে সাজানো বই-পত্রের দিকে মনোযোগ দিলো।

‘আমি তোমাকে একটা বই উপহার দিতে চাই,’ ফিসফিস করে বললো লিলিয়ান।

‘সেক্স ইন মিডনাইট?’ একটা বইয়ের নাম পড়লো রানা।

‘ওরে আমার সবজ্ঞান্টা!’ মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসলো লিলিয়ান। বইটা শপিং ব্যাগে ভরে হাতে ঝুলিয়ে নিলো সে। দাম চুকিয়ে ওখান থেকে সরে এলো ওরা। রাস্তায় লোকজন কম, যুবক-যুবতীরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটছে। জড়িয়ে ধরার মতো একজন রানার শান্তিদূত-১

পাশেও রয়েছে । কিন্তু উৎসাহ নেই ।

‘প্ল্যানটা হয়তো আমাকে বদলাতে হতে পারে,’ বললো রানা, বাক নিয়ে দক্ষিণ দিকে এগোলো ও, ফিফটি-সিক্সথ স্ট্রীট ধরে ।

‘তোমার একটা প্ল্যান আছে তাই আমার জানা ছিলো না ।’

‘ডলার দরকার । পঞ্চাশ হাজার ।’ কি যেন ভেবে কৌতুক অনুভব করলো রানা । ‘পারবে যোগাড় করতে ?’

অনেক টাকা, তিন সেকেন্ড ইতস্তত করলো লিলিয়ান । তারপর বললো, ‘একটাই উৎস, রেসিডেন্ট । কিন্তু আমি যতোটুকু বুঝেছি, তুমি চাও না আমাদের এখানকার কারো সাথে আমি যোগাযোগ করি ।’

‘তা চাই না, কিন্তু টাকাটা আমার দরকার । তোমার পরিচয় আমেরিকানদের কাছে যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে তো গেছে, দ্বিতীয়বার কিছু ফাঁস হবার থাকছে না । পঞ্চাশ হাজার, বিশ আর পঞ্চাশ ডলারের নোট ।’

ট্রাফিক সিগন্যালে যানবাহন থেমে আছে, ছুটে রাস্তা পেরোলো ওরা ।

‘রেসিডেন্টের সাথে কিভাবে আমার যোগাযোগ হয় শোনো,’ রানাকে বললো লিলিয়ান । ‘সোমবারে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ পাই আমি, কোড করা মেসেজ । আমার কিছু বলার থাকলে একই জায়গায় আমার মেসেজ রেখে আসি ।’ রাস্তার ধারে মেয়েদের একটা টেইলারিং শপ দেখে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলো সে । ‘কাল যদি ওখানে মেসেজ রেখে আসি, মঙ্গলবারে হয়তো আমি টাকাটা সংগ্রহ করতে পারবো ।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালো রানা । ‘এ-ধরনের

যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপজ্জনক। কিন্তু তবু আমাদের বুঁকিটা নিতে হবে। ওখানে মেসেজ রেখে আসার পর, টাকাটা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে তুমি। অন্য কোনো হোটেলে উঠবে। টাকা পাবার পর স্যাভয়ে ফোন করে মিঃ ম্যাট ইসটনের নামে একটা মেসেজ রেখে দেবে। তুমি ফোন করার দু'ঘণ্টা পর ঠিক এই জায়গা থেকে দক্ষিণ দিকে ফিফথ্ এভিনিউয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করবে। সোজা ক্যাথেড্রাল পর্যন্ত যাবে তুমি...কি যেন নাম ওটার ?'

‘সেন্ট প্যাট্রিক ?’

‘হ্যাঁ। ক্যাথেড্রালে ঢুকে দশ মিনিট প্রার্থনা করবে। ওখানে যদি আমাকে না দেখো, পশ্চিম দিকে হাঁটা ধরে খারটি রকফেলার প্লাজা পর্যন্ত যাবে, আইস স্কেটিং-রিং পেরিয়ে। এন. বি. সি. বিল্ডিংয়ের আশপাশে সারাক্ষণ প্রচুর লোকজন থাকে, ওটাই তোমার দ্বিতীয় চেক-পয়েন্ট। লক্ষ্য রাখবে কেউ তোমার পিছু নিয়েছে কিনা। যদি নেয়, ওই ভিড়ের মধ্যে তাকে তুমি খসাতে পারবে।’

‘ওখানে আমি আমার হারানো স্বামীকে খুঁজে পাবো ?’

‘না। ফরটি-এইটথ্ বা ফরটি-নাইনথ্, দুটোর কোথাও মেট্রো-পোল বার দেখতে পাবে—টপলেসের জন্যে বিখ্যাত। ওরা আবার পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভেও অংশগ্রহণ করে। ওখানে।’

‘আমি চাই না আমার স্বামী কেন, পাম কোর্টে থাকলেই তো পারো !’

‘টপলেস পর্যন্ত সহিতে পারবো, কিন্তু বটমলেস... হাত জোড় করে মাফ চাওয়ার ভঙ্গি করলো রানা।’

‘এ মা, ছি, ওখানেও...জানতাম না তো !’

‘বিশ্বাস না হয় তো চলো এখুনি একবার ঢুঁ মেরে আসি,’  
প্রস্তাব করলো রানা ।

হঠাৎ গন্তীর হয়ে গেল লিলিয়ান । ‘না । আমি ঘরে যাবো ।’

‘ওহ্-হো,’ হেসে উঠে বললো রানা, ‘ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি  
একটা বই কিনেছো ।’

রানার হাতের উন্টে পিঠে একটা রাম চিমটি কাটলো লিলি-  
য়ান । ‘ওটা তোমাকে উপহার দেয়া হয়েছে, হাঁদারাম ।’

জোরে পা চালালো লিলিয়ান, তার পাশে থাকার জন্যে রানাও  
হাঁটার গতি দ্রুত করলো । ‘সোমবারে কোথায় তুমি মেসেজ পৌঁছে  
দেবে ?’

‘সেটা আমার মাথাব্যথা ।’

‘আহা, আমাকে জানালে দোষের কিছু নেই... ।’

‘ভুলে যেয়ো না, তুমি অস্থায়ী । আমাদের লোকাল অপারেশন  
সম্পর্কে সব কথা তোমার জানার দরকার নেই ।’

‘নাকি ভাবছো আসল স্কুবা ডাইভার না-ও হতে পারি আমি ?’  
মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো রানা ।

চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলো লিলিয়ান । হাঁটার গতি  
শ্লথ হয়ে পড়লো, ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে একবার দেখেও নিলো  
রানাকে । তারপর মাথা নাড়লো ।

‘কেন, সাগরে কোথাও লোক-বদল ঘটতে পারে না ?’ চ্যালেঞ্জ  
করলো রানা । ‘কে. জি. বি. এজেন্টের সলিল সমাধি ঘটেছে ? আমি  
আমেরিকান ?’

‘সম্ভব, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ।’

পার্ক এভিনিউয়ে এসে পাকিং লটে থামলো ওরা। হাঁটবে বলে মাস্টাওটা এখানে রেখে গিয়েছিল। দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলো লিলিয়ান, এক সেকেণ্ড পর তাকে অনুসরণ করলো রানা।

মনে মনে রানার প্রশংসা করলো লিলিয়ান। পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই লক্ষ্য করেছে সে, সারাক্ষণ নিজের চারপাশে নজর রাখছে ও, কিন্তু হাবভাবে সেটা প্রকাশ পায় না। পাশে রয়েছে অথচ অনেক সময় ওর অনেক আচরণের অর্থ বোধগম্য হয় না, পরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তাৎপর্যটুকু ধরা পড়ে। কোনো সন্দেহ নেই, এই লোক কে. জি. বি.-র একটা সম্পদ।

রানা ভাবছে অন্য কথা। হঠাৎ করেই, প্রায় বিদ্যুৎ চমকের মতো, নিজের একটা ক্রটি লক্ষ্য করেছে ও। কাজটা কিভাবে শুরু করবে এখনো ঠিক করতে পারেনি, এ তার এক ধরনের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা মেনে না নিয়ে উপায় নেই, মেনে নিয়েছেও। ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে, জানে ও। সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক আছে, তবে অস্বস্তিবোধ করছে না, করার দরকারও নেই। ক্রটিটা হলো, স্ট্যালিনপন্থী কে. জি. বি. এজেন্ট বা রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের তরফ থেকে কোনো বিপদের আশংকা করছে না ও।

অথচ করা উচিত।

মনে পড়লো, কর্নেল বিকারেন ওকে বলেছেন, টেলি-বমের একটা খাতা রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের কাছে আছে, সেটা পাহারা দেয় গ্রু-র প্রহরীরা। তারমানে ডালচিমস্কি আমেরিকায় যা করছে তার তাৎপর্য মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স ঠিকই বুঝতে পারবে। হয়তো এরই মধ্যে বুঝেও ফেলেছে তারা। হয়তো কে. জি. বি.-র কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে বসেছে। এখন জানে, ডালচিমস্কিকে ধরার

জন্যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানাকে পাঠানো হয়েছে আমেরিকায় ।

রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে এমন অনেক লোক আছে যারা ছ'চোখে দেখতে পারে না ওকে, জানে রানা । তাদের প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে সহজেই অনুমান করা যায় ।

নিজের নিরাপত্তার জন্যে কৌশল বদল করতে হবে ওকে । এতোক্ষণ শুধু পিছন দিকে নজর রাখছিল, এখন থেকে সামনেও নজর রাখতে হবে ।

ভাগ্যিস কিছু একটা ঘটার আগেই ক্রটিটা দেখতে পেয়েছে সে !

স্ট্যালিনপন্থী বা স্ট্যালিনপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল কে. জি. বি. এজেন্ট এবং রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, এরাই তার আসল শত্রু হয়ে দেখা দিতে পারে । সি. আই. এ. বা মার্কিন কোনো ইন্টেলিজেন্সকে আপাততঃ ভয় না পেলোও চলবে ।

তারপর ভাবলো, এ-ধরনের একটা চিন্তা হঠাৎ করে আমার মাথায় এলোই বা কেন ? সামনে কোনো বিপদ নেই তো ?

খুক্ করে কাশলো লিলিয়ান, তারপর বললো, 'পুতুলটা কিন্তু যান্ত্রিক নয় ।'

বাস্তবে ফিরে এলো রানা । ধীরে ধীরে হাসি ফুটলো মুখে । 'সে আমি বইটা উপহার পেয়েই বুঝেছি ।'

ছ'জনের কেউই জানে না, শেষ পর্যন্ত কি গতি হবে বইটার ।

গাড়ি রেখে হোটেলের গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা । 'আজ যে ফুল কিনলে না ?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান ।

'কারণটা অবভিয়াস নয় ? ছ'জনের মাঝখানে আজ কোনো কাঁটা চাই না ।'

হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলো লিলিয়ান ।

রাত বেশি হয়নি, তবু স্যাভয়ের রিসেপশনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগলো । রিসেপশনে ঢোকান সময় একটু পিছিয়ে পড়লো রানা, কারণ জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছে লিলিয়ান ।

সোফায় সুন্দরী একটা মেয়ে বসে আছে, উন্টোদিকের সোফায় বসে তিনজন মধ্য বয়স্ক লোক নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে । আরেক ধারে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে আছে ওভারকোট পরা এক প্রোড়, খবরের কাগজ পড়ছে । এই সময় খবরের কাগজ পড়ছে, একটু অস্বাভাবিক নয় ? রিসেপশন কাউন্টারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটোখাটো এক লোক ।

এলিভেটরের সামনে পৌঁছে গেছে লিলিয়ান । ঢোকান সময় উপস্থিত সবাই ওদের দিকে একবার করে তাকিয়েছে । কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ তাকিয়ে নেই ।

কাউন্টারের পাশ ঘেঁষে এগোলো রানা । এলিভেটরের সামনে, বিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলিয়ান ওর দিকে পিছন ফিরে । এগারো তালায় রয়েছে এলিভেটর, নামছে নিচের দিকে ।

হঠাৎ রানার ইচ্ছে হলো দাঁড়িয়ে পড়ে । জিনিসটা কি জানে না, কিন্তু বেমানান কিছু একটা লক্ষ্য করেছে ও । রিসেপশনে ঢোকান সাথে সাথে । কি ?

প্রোড় লোকটা খবরের কাগজ পড়ছে ?

না । অন্য কিছু ।

এলিভেটরের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ও । ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর । কি ?

ঘামতে শুরু করলো রানা।

পিছনে পরিচিত পায়ের আওয়াজ থেমে যেতে ঘাড় ফেরালো লিলিয়ান। দেখলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে রানা, ফিরে যাচ্ছে রিসেপশনের দরজার দিকে।

কি ? একই প্রশ্ন রানার মনে। ঠিক করেছে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসবে, নতুন করে আসার সময় হয়তো চিনতে পারবে জিনিসটা।

কাউন্টার ঘেঁষে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালো রানা, খুশি হয়ে উঠলো মন। কাউন্টারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটো-খাটো, সুবেশী লোকটা। হাতে ক্ষুদে একটা রেডিও। ছোট্ট এবং সস্তা। স্যাভয়ের অভিজাত পরিবেশের সাথে একেবারেই বেমানান। রেডিওটা কানের কাছে ধরে একমনে যন্ত্রসঙ্গীত শুনছে লোকটা।

সকৌতুকে রানার দিকে তাকালো সে। কিন্তু সিধে হলো না। সবিনয়ে হাসলো রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে বো করলো। ‘সুন্দর তো !’ বলে অপ্রত্যাশিতভাবে হাত বাড়িয়ে রেডিওটা প্রায় ছিনিয়ে নিলো, কিন্তু হাসিটুকু ম্লান হলো না।

‘এ কি অভদ্রতা !’ ঝট করে সিধে হয়ে প্রতিবাদ জানালো লোকটা।

এলিভেটরের কাছ থেকে রানাকে লক্ষ্য করছে লিলিয়ান। সে একা নয়, সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

লোকটার কথা রানা যেন শুনতে পায়নি। চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে রেডিওটা। ‘মেড ইন জাপান। জাপানীরা ছাড়া এতো সুন্দর জিনিস আর কারাই বা তৈরি করবে !



ক'টা ব্যাণ্ড, স্যার ?' চামড়ার কেসে আঙুল বুলাচ্ছে ও, যেন আদর করছে ।

কয়েক কদম এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো লিলিয়ান । রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে না । রানা হয়তো চাইছে না এর মধ্যে নাক গলাক সে ।

মনে মনে লজ্জা পাচ্ছে রানা । ছি, ছি—এ-ধরনের একটা সিন ক্রিয়েট করা উচিত হয়নি । না তাকিয়েও লক্ষ্য করলো, সবাই বিরক্ত হয়েছে ওর আচরণে । রিসেপশনিষ্ট মেয়েটা টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব ।

লোকটা বললো, 'ক'টা ব্যাণ্ড তা জেনে আপনার কি দরকার ? দিন, আমার জিনিস ফিরিয়ে দিন আমাকে !'

শব্দ করে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা । দু'জন পুরুষ, আর একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে ।

'হুঃখিত,' শ্রান কণ্ঠে বললো রানা 'উচিত ছিলো আপনার অনু-মতি নিয়ে.... ।'

রেগেমেগে রানার দিকে পিছন ফিরলো লিলিয়ান ।

হোঁ দিয়ে রেডিওটা নিতে গেল লোকটা । কিন্তু রানা ছাড়লো না । চামড়ার কাভারের নিচে, রেডিওর এক কিনারায়, ছোট্ট একটু জায়গা ফুলে আছে ।

ঝট্ করে এলিভেটরের দিকে তাকালো রানা । ঠিক এই সময় রেডিওটা নেয়ার জন্যে আবার হোঁ দিলো লোকটা । ফোলা জায়-গাটার ওপর আঙুল চেপে রেখেছিল রানা, চাপ পড়লো তাতে ।

বিস্ফোরিত হলো এলিভেটর ।

## দশ

---

মনে হলো গোটা হোটেলটাই বিধ্বস্ত হয়েছে। বিক্ষোভের ধাক্কা দিয়ে উঠলো রানা, কিন্তু ছিটকে পড়লো রেডিওর মালিক ছ'হাত দিয়ে ওর বুকে ধাক্কা দেয়ায়। স্লো-মোশন ছায়াছবির মতো ঘটতে লাগলো ঘটনাগুলো। সাদা আর কালো ধোঁয়ায় এলিভেটরের সামনে লিলিয়ান সহ আরো তিনজন ঢাকা পড়ে গেল। ঘন ধোঁয়ার ভেতর দরজা আকৃতির একটা আগুন দেখতে পেলো রানা, বুঝলো এলিভেটরের ক্যারিজ্জ জ্বলছে। মেঝেতে ছিটকে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে ও, পকেট থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তলটা, কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ হলো—ধাক্কা খেয়ে যেখানে পড়েছিল রানা সেখানকার মেঝের ছাল তুলে দেয়ালে গিয়ে লাগলো বুলেটটা। এলিভেটরের সামনে থেকে আহতদের গোঙানি ভেসে এলো।

রিসেপশন হলের দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফেরালো রানা, মেঝেতে কনুই রেখে পিস্তলের ট্রিগার টিপলো। সুবেশী লোকটার কোটের প্রান্ত ঝাঁকি খেলো, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

শূন্যে একটা খবরের কাগজ উড়তে দেখলো রানা। প্রোড লোকটা

দরজার কাছে পৌঁছে, হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে কাগজটা। গুলি করতে যাবে রানা, ওর ঘাড়ের ওপর আছাড় খেলো কে যেন। দরজার চৌকাঠে লাগলো বুলেট। বাইরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

ঝট্কা দিয়ে শরীরটাকে সরাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। নরম একটা শরীর।

‘চলো, পালাই!’ ফুঁপিয়ে উঠলো লিলিয়ান।

তাকে ধরে দাঁড় করালো রানা। এতোক্ষণে হাতের শপিং ব্যাগটা ফেল দিলো লিলিয়ান। এক হাতে তার কজ্জি ধরলো রানা, আরেক হাতে শপিং ব্যাগটা তুললো। ব্যাগের মুখ গলে মেঝেতে পড়ে গেল বইটা।

শপিং ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, এক হাতে পিস্তল, অপর হাতের ভাঁজে লিলিয়ানকে নিয়ে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এলো রানা। হোটেলের চওড়া গেট দেখা গেল দূরে, কালো একটা মাসিডিজ তীর বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

গ্যারেজ থেকে মাস্টাং নিয়ে বেরিয়ে এসে ওরা দেখলো, তিনজন আহত মানুষকে ধরাধরি করে রিসেপশন থেকে বের করা হচ্ছে। এই তিনজনই এলিভেটর থেকে নেমেছিল।

‘কোথায় লেগেছে তোমার?’

‘কোথাও না,’ বললো লিলিয়ান, চোখ মুছলো রুমাল দিয়ে। আহতদের দিকে তাকালো সে। কারো আঘাতই মারাত্মক নয়, তবে তিনজনই খোঁড়াচ্ছে। শুধু একজনের নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে দেখা গেল। ‘আমার সামনে ওরা ছিলো বলে...আমি শুধু ছিটকে পড়ে যাই...রবিন, ওরা আমাদেরকেই...তাই না?’

‘হ্যাঁ।’ উচু আর শক্ত হয়ে উঠলো রানার চোয়ালের হাড়। হোটেলের গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মাস্টাং। ও জানে, একা শুধু ওকে নয়, ওদের ছ’জনকেই খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। লিলিয়ান একা এলিভেটরে চড়লে লোকটা হয়তো রিমোট কন্ট্রালের বোতামে চাপ দিতো না। ছ’জন একসাথে চড়লে দিতো। ও কখন একা এলিভেটরে চড়ে তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতো না আততায়ী।

একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে জানে রানা। লিলিয়ান এই হত্যা পরিকল্পনার সাথে জড়িত নয়। আমেরিকানরা এর সাথে জড়িত নয়। স্ট্যালিনপন্থী কে. জি. বি. এজেন্ট ছিলো ওরা? নাকি রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স—জি. আর. ইউ.?

সবচেয়ে ভীতিকর প্রশ্নটা হলো, আততায়ীরা ওদের ঠিকানা জানলো কিভাবে?

সাগর থেকে উঠে আসার পর ওকে বা ওর সাথে দেখা হবার পর লিলিয়ানকে কেউ অনুসরণ করেনি। এ-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত।

তাহলে?

‘কি ভাবছো?’

সাইরেন বাজাতে বাজাতে পুলিশের ছটো গাড়ি ছুটে গেল হোটেল স্যাভয়ের দিকে, পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। রানা বললো, ‘গাড়িটা আর ব্যবহার করা উচিত হবে না।’

‘টোয়েনটি-সেভেনথ্ এভিনিউ, অ্যাভিস কোম্পানী—চলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি।’

‘ভাবছি...।’

‘জানি। ওরা জানলো কিভাবে কোথায় আছি আমরা।’

‘এনি আইডিয়া ?’

মাথা নাড়লো লিলিয়ান। ‘কেউ আমাদের অনুসরণ করলে টের পেতাম।’

‘যে ভাবে হোক জেনেছে,’ বললো রানা। ‘কিভাবে, বুঝতে না পারা পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই।’

রানার মতো লিলিয়ানও চিন্তিত। ‘জানি।’ একটু পর জিজ্ঞেস করলো, ‘নতুন কোনো প্ল্যান করছো ?’

‘গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে গোল্ডেন ইন হোটেলে উঠবো। টাকা পাবার পর ওখানে তুমি ফোন করে মেসেজ দেবে। আগের প্ল্যানই ঠিক থাকলো।’

হঠাৎ জানতে চাইলো লিলিয়ান, ‘রা দায়ী, রবিন ? ওদের পরিচয় কি ?’

‘আমেরিকানরা হতে পারে ?’

‘আমার তা মনে হয় না।’

‘আমারও।’

‘যদি ধরেও নিই, ওরা তোমার সম্পর্কে জেনে ফেলেছে,’ বললো লিলিয়ান, ‘তাহলেও তোমাকে ওদের মারতে চাওয়ার কোনো কারণ নেই। বড় জোর ওরা তোমাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করতে পারে।’

‘তোমার সাথে আমি একমত।’

‘তাহলে ?’

‘নিজেই বোঝার চেষ্টা করো। পার্টি তো খুব বেশি নয়।’

‘কে. জি. বি. নয়, কারণ ওরাই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছে আমাদেরকে,’ বললো লিলিয়ান। ‘স্ট্যালিনপন্থীরা ?’

‘ডালচিমস্কিকে ধরার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে, ওদের তা জানার কথা নয় ।’

‘ডালচিমস্কি !’

‘হ্যাঁ ।’

‘যার খোঁজে এলেছো তুমি... ?’

‘হ্যাঁ ।’

ব্যাপারটা হজম করার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো লিলিয়ান । ‘তাহলে বাকি থাকলো শুধু,’ একটু পর বললো সে, ‘গ্রু ।’

‘হ্যাঁ ।’

‘তোমার ধারণা... ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘কিন্তু কেন ?’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান । ‘ওরা চায় না ডালচিমস্কি ধরা পড়ুক ?’

‘তা হয়তো চায় । কিন্তু আমাকে পাঠানোটা ওদের হয়তো পছন্দ হয়নি । হয়তো আমার ওপর ওদের বিশ্বাস নেই । ক্লাসি-ফায়েড অনেক তথ্য জানি আমি—ওরা হয়তো ভাবছে, সেগুলো আমি আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি । ডালচিমস্কি যেমন বিপজ্জনক, আমাকেও সেরকম বিপজ্জনক বলে মনে করছে ।’

‘কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারকে ব্যাপারটা জানানো দরকার,’ বললো লিলিয়ান । ‘ওরা নিশ্চয়ই মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ভুলটা ধরিয়ে দেবে ।’

‘গ্রু ভুল করে এ-সব করছে না,’ তিক্ত হাসলো রানা । ‘বুঝে-শুনে করছে । ওরা ওদের নিজস্ব নীতিতে চলে, বেশিরভাগ সময়ই

কে. জি. বি.-র প্ল্যান-প্রোগ্রাম অনুমোদন করে না।’

‘কিন্তু তা কি করে হয়!’ প্রতিবাদের সুরে বললো লিলিয়ান।  
‘নিজেদের লোকেরা আমাদের মারার চেষ্টা করবে, আমরা তাহলে  
কাজ করবো কিভাবে?’

শান্ত ভাবে বললো রানা, ‘এরই নাম এসপিওনাজ। বা বলতে  
পারো প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব। শান্তির দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে  
আমাকে, আর শান্তির শত্রু স্বপক্ষ বিপক্ষ সবখানেই আছে। ওদের  
অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে।’

চেহারায় রাগ আর অসহায় ভাব নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার  
পর লিলিয়ান বললো, ‘তু কি করছে, হেডকোয়ার্টার তা জানে না  
বলতে চাও? ওরা আমাদের সাবধান করেনি কেন?’

‘যোগাযোগ করার নির্দিষ্ট সময় আছে,’ বললো রানা। ‘তখন  
হয়তো করবে।’

রেন্ট-এ-কার কোম্পানী অ্যাভিসে মাস্টাং রেখে ট্যাক্সি নিলো  
ওরা। গোল্ডেন ইনের সাত তালায় ডাবল বেডের একটা কামরা  
ভাড়া করলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কাপড় ছাড়লো লিলি-  
য়ান, নাইট-ড্রেস পরে শুয়ে পড়লো বিছানায়। গায়ে চাদর টেনে  
উপুড় হলো সে।

ঘরে শুধু শেড পরানো টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে। প্রায় নিঃশব্দ  
পায়ে কার্পেটের ওপর পাঁচচারি করছে রানা। গালে হাত দিয়ে ওর  
দিকে তাকিয়ে আছে লিলিয়ান। তাকিয়ে আছে, আর কি যেন  
চিন্তা করছে।

‘শোবে না?’ দশ মিনিট পর জিজ্ঞেস করলো সে।

‘ঘুম আসবে না।’ সিগারেট ধরালো রানা।

‘আমাকে একটা দেবে ?’

বিছানার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। লিলিয়ানকে সিগারেট দিয়ে বিছানার কিনারায় বসলো। হেলান দিলো বালিশে।

লিলিয়ানের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অপর হাতটা রানার বুকে রাখলো সে।

‘লিলি, তোমার হাত কাঁপছে !’ সিধে হলো রানা।

‘এতোকণ আমরা লাশ-কাটা ঘরে থাকতাম, তাই না ?’ ফিসফিস করে বললো লিলিয়ান। ‘ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে আমরা বেঁচে আছি।’ শিউরে উঠলো সে।

‘এরপরের বার হয়তো থাকবো না,’ নিজের অজান্তেই কঠিন হয়ে গেল রানার কণ্ঠস্বর।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লিলিয়ান। কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বললো, ‘আমরা স্যাভয়ে উঠেছি ওরা জানতো, সেজন্যে তুমি আমাকে দায়ী ভাবছো ?’

‘তোমার কানের ঢুল জোড়া,’ শুকনো গলায় বললো রানা, ‘অস্বাভাবিক বড়।’

কঁপে উঠলো লিলিয়ান। একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো সে, ‘হ্যাঁ।’

‘আমি তাহলে ঠিক ধরেছি ?’ কয়েক সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করলো রানা।

উঠে বসলো লিলিয়ান। কান থেকে ঢুল জোড়া খুলে রানার হাতে গুঁজে দিলো। বাঁ হাতের তালু থেকে একটা ঢুল ডান হাতে নিলো রানা। ছোটো ওজন অনুভব করলো। একটা হালকা, অপরটা একটু ভারী।



হালকাটা লিলিয়ানকে ফেরত দিলো রানা, ভারীটা নিয়ে বিছানা ছাড়লো। টেবিল ল্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে পরীক্ষা করলো সেটা। পিনের মাথার মতো ছোট্ট একটা বোতাম রয়েছে, চাপ দিতেই টোপর আকৃতির ছল ছুঁফাঁক হয়ে গেল, ভেতর থেকে খসে পড়লো অতি ক্ষুদ্র একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র। দেখেই চিনতে পারলো রানা—রাশিয়ার তৈরি রিপার—সিগন্যাল পাঠানোর অত্যাধুনিক যন্ত্র। অন করা অবস্থায় অনবরত পিপ-পিপ সিগন্যাল পাঠিয়ে চলেছে, কিন্তু আওয়াজটা শুধু রিসিভারে শোনা যাবে। এতো শক্তিশালী রিপার জাপানী বা আমেরিকানরাও তৈরি করতে পারেনি, দেড় হাজার মাইল দূরের রিসিভারও সিগন্যাল রিসিভ করতে পারবে। রাশিয়ানদের এই রিপার আমেরিকা সহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক ইন্টেলিজেন্সও ব্যবহার করে বলে শুনেছে রানা।

ওর পিছনে এসে দাঁড়ালো লিলিয়ান। রানার কাঁধে একটা হাত পড়লো। ‘কিছু বলছো না যে?’

হাসতে চেষ্টা করলো রানা। ‘কে. জি. বি. রেসিডেন্টের নির্দেশ তুমি অমান্য করতে পারোনি, তাই না?’

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস চাপলো লিলিয়ান। ‘হ্যাঁ। কিন্তু যদি ধরেও নিই যে এটার সাহায্যে আততায়ীরা জানতে পারে আমরা স্যাভয়ে উঠেছি, তাহলে...তাহলে এ-ও ধরে নিতে হয় যে রেসিডেন্ট আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা করছেন। তা কি করে হয়, রবিন?’

‘রেসিডেন্ট কয়েক শো লোককে নিয়ে কাজ করেন,’ বললো রানা। ‘তাদের মধ্যে দু’একজন স্ট্যালিনপন্থী বিদ্রোহী থাকতে

পারে না ?’

‘রেসিডেন্ট স্বয়ং নন, তুমি জোর করে বলতে পারো ?’

‘মস্কো পুরোপুরি নিঃসন্দেহ না হয়ে ওই লোককে ওয়াশিংটন দূতাবাসে কালচারাল অ্যাটাশে করে পাঠায়নি,’ বললো রানা। ‘ওই লোকের পক্ষে বেঈমানী করা সম্ভব নয়, কারণ তা করলে নিশ্চয়ই রাশিয়ায় তার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে বলে জানে সে।’

‘তুমি চাও রেসিডেন্টকে আমি সাবধান করে দিয়ে বলি যে তার দলে বেঈমান আছে ?’

ব্লিপারটা আগেই অফ করছে রানা, কার্পেট খানিকটা সরিয়ে মেঝেতে ফেললো সেটা, জুতো দিয়ে মাড়িয়ে চ্যাপ্টা করলো। ‘দরকার কি ? রেসিডেন্ট সতর্ক হয়ে গেলে বেঈমানটা বা বেঈমান-রাও সতর্ক হয়ে যাবে। তারচেয়ে আগে আমাদের কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ হোক, মস্কোয় ফেরার আগে রেসিডেন্টের সাথে আমি নিজেকে কথা বলবো।’

‘দায়িত্ব কমে যাওয়ায় অনেক হালকা হয়ে গেলাম আমি,’ বললো লিলিয়ান।

‘তা বটে,’ মনে মনে হাসলো রানা। কিন্তু জানে, রহস্যের কোনো মীমাংসাই হলো না।

ওকে আবার সিগারেট ধরাতে দেখে বাধা দিলো লিলিয়ান। হাত থেকে সিগারেট আর লাইটার কেড়ে নিয়ে বললো, ‘না। শোবে চলো। তুমি না শুলে আমার ঘুম আসবে না।’

জুতো খোলার আগে শপিং ব্যাগটা আতিপাতি করে খুঁজলো রানা।

‘কি খুঁজছো ?’ হাসি চেপে বিছানা থেকে জানতে চাইলো লিলিয়ান ।

‘বইটা গেল কোথায় ?’

লিলিয়ানের সুরেলা হাসিতে ভরে উঠলো ঘর । ‘ব্যাগ থেকে ওটা পড়ে গেছে, স্যাভয়ের রিসেপশনে ।’

‘হায় হায় ! পড়ে যেতে দেখলে অথচ তুললে না ?’ ব্যাগ রেখে বিছানায় এসে বসলো রানা ।

‘আসলে ওটার দরকার আছে কি ?’ পান্টা প্রশ্ন করলো লিলিয়ান । চাদরের নিচে ঢুকে গেল সে, শুধু মুখটা বাইরে থাকলো । ‘বই দেখে রান্না করা যায় বটে, কিন্তু সে রান্না কি খাবার উপযুক্ত হয় ?’

‘তাহলে প্রজেক্ট করেছিলে কেন ?’ বালিশে মাথা দিয়ে শুলো রানা, চাদরের তলায় ঢুকছে ।

‘বলতে পারো ফাঁদ পেতেছিলাম,’ চাদরের নিচে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বললো লিলিয়ান ।

‘সে ফাঁদে আমি কি ধরা দিয়েছি ?’

জবাব না দিয়ে শরীরটাকে দ আকৃতির মতো করে রানার বুকে মুখ লুকালো লিলিয়ান । চিবুকটা ঠেকে আছে রানার বুকে, নাকটা গলার কাছে, একটা হাত রানার বগলের নিচ দিয়ে পিঠে চলে গেছে, অপর হাতটা রানার কাঁধ আর বালিশের মাঝখান দিয়ে মাথার চুল ছুঁয়েছে ।

অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা নেই । বার কয়েক কেঁপে কেঁপে উঠলো লিলিয়ান, ছ’চার বার উঁ-অঁ করলো, তারপর তার আর কোনো সাড়া পেলো না রানা । মনে মনে হাসলো ও । মস্ত একটা ফাঁড়া কেটেছে লিলিয়ানের, বিপুল স্বস্তিবোধ ক্লান্ত করে তুলেছে তাকে ।

# এগারো

---

‘সাবধানে থেকে’, রবিন,’ বলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো লিলিয়ান, রানার ঠোঁটে হালকাভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে পিছিয়ে গেল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

দরজা বন্ধ করলো রানা, কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো এক মিনিট। চিন্তিত।

মনে মনে জটিল একটা অংক মেলাবার চেষ্টা করলো ও। আপন-মনে মাথা ঝাঁকালো—ও যা করছে ঠিকই করছে। প্ল্যান বদল করতে হলে আরো অনেক বেশি খুঁকি নিতে হবে ওকে।

টিভি খুলে বাথরুমে ঢুকলো রানা, ব্রেকফাস্ট সেরে আরেকবার দাঁত ব্রাশ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাথরুম থেকে বেরুচ্ছে, এই সময় দিনের প্রথম দুঃসংবাদটা কানে এলো।

ব্রাজিলে প্লেন হাইজ্যাক হয়েছে, তার ওপর এন. বি. সি. রিপোর্টার বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর ঘোষণা করলো, কাল বিকেলে চ্যানিউটে যা ঘটেছে তার রহস্য ভেদ করার জন্যে ক্যানসাস আর ফেডারেল পুলিশ এখনো জোর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ‘অন্তর্ঘাতক

বলে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার পরিচয় এখনো জানা যায়নি। গুলি খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে সে, কখন কি হয় বলা যায় না। কাল রাতে হেলিকপ্টারে করে কোর্ট লিভেনওয়ার্থ-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে, ওখানকার সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার।’ সবশেষে রিপোর্টার আরো বললো, ‘পরিচয় উদ্ধার করা না গেলেও, পুলিশ তার নীল মটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বর চেক করে দেখছে।’

মেজাজ তিরিষ্কি হয়ে গেল রানার। লোকটার তো ধরা না পড়ে সুইসাইড পিল খাবার কথা, খায়নি কেন?

সামরিক হাসপাতাল, ওখান থেকে কাউকে বের করে আনা সহজ কথা নয়। ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন যদি বেঁচে যায়, তার মুখ খোলার আশংকা থেকেই যাবে। সোডিয়াম পেটোথাল বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করবে আমেরিকানরা, বাস, বকবক করে সব ফাঁস করে দেবে ইলিয়টসিন। অন্যান্য টেলি-বম বা তাদের টার্গেট সম্পর্কে সে যদি কিছু না-ও জানে, আমেরিকানরা অনায়াসে তাদের অস্তিত্ব আন্দাজ করে নেবে।

কাজেই ইলিয়টসিনের মুখ বন্ধ করার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে নিতে হবে।

এসব কি ভাবছি আমি, নিজেকে তিরস্কার করলো রানা। একশো ছত্রিশজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তাদের খুন করতে নয়। কিন্তু ইলিয়টসিন মারাত্মক একটা ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?

তা বটে। সুতরাং চিন্তা করে দেখো কিভাবে তাকে সামরিক হাসপাতাল থেকে বের করে আনা যায়। হ্যাঁ, কাজটা কঠিন। কিন্তু

একেবারেই অসম্ভব কি ?

ওরা তাকে কড়া পাহারায় রেখেছে। তাকে বের করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করতে চাওয়া।

মহা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি ! ব্যাটা সুইসাইড পিল খায়নি কেন !

সুটেডবুটেড হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লো রানা। সুপার-মার্কেটে এসে একটা রেডিমেন্ড গার্মেন্টের দোকানে ঢুকলো। তিনটে শাট, অতিরিক্ত আগুয়োর আর মোজা, একটা স্পোর্টস জ্যাকেট, ধুয়েই পরা যায় এক জোড়া স্ল্যাকস, সাদা ক্যানভাস ডেক শু, আর ব্রাউন লোফার কিনলো। থার্ড এভিনিউয়ে বেরিয়ে এসে খাটি সিক্কের রঙচঙে কিছু টাই দেখলো একটা দোকানের শো-কেসে, আঠারো ডলার দিয়ে এক জোড়া কিনলো—নীল আর লাল। এই একই মানের জিনিস মস্কোয় থাকতেও কিনেছিল, প্রায় অর্ধেক দামে। হোটেল ফিরে এসে প্রথমেই চেক করলো কামরার কোথাও সাব-মিনিয়েচার ইলেকট্রনিক লিস্টিং ডিভাইস রোপণ করা হয়েছে কিনা।

হোটেলের রেস্টোরাঁয় নেমে এসে এক কাপ কফি খেলো রানা। গ্যাম্বলিং হলে ঢুকে রুলেং টেবিলে পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরে ভাগ্য পরীক্ষা করলো। হেরে গিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো এই বলে যে পরে এক সময় লোকসানটা পুষিয়ে নেয়া যাবে।

সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রালটা একবার চেক করে দেখা দরকার। বিশেষ করে ভেতরের লে-আউট। এ-ধরনের কাজ খুব গুরুত্বের সাথে নেয় রানা, আলসেমি করে এড়িয়ে যায় না। আজও বেঁচে আছে ও, তার অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা।

ক্যাথেড্রালে যারা প্রার্থনা করতে যায় তাদের নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই রানার। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে ওর, অনেক ক্যাথেড্রালেই গুপ্তচররা পরস্পরের সাথে দেখা করে, মেসেজ আদান-প্রদান করে, এমনকি অ্যামবুশও পেতে রাখে।

ব্রডওয়ে আর এইটথ এভিনিউয়ের মাঝখানে ফরটি-সেকেণ্ড স্ট্রীট। ফেরারী, নেশাখোর, পতিতা, বখাটে কিশোর, হেঁড়া কন্সল গায়ে আশ্রয়হীন বৃদ্ধা, আধ-পাগল, অবহেলিত পংগু, পর্ণোগ্রাফীর ঝোলা হাতে ফেরিওয়ালা, আর কৌতূহলী ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগেই আছে। ভিড় ঠেলে হন হন করে হাঁটতে লাগলো রানা, কারো চোখে সরাসরি তাকালো না। রসুন আর গোড়া চবির গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এলো। এইটথ এভিনিউ পেরিয়ে এসে সঁ্যাং করে গান শপে ঢুকে পড়লো ও। রাস্তার ধারে শো-কেসে আশ্চর্য সব অস্ত্র — গুর্খা ছুরি, ব্রিটিশ লী-এনফিল্ড রাইফেল, সেমি-অটোমেটিক কার-বাইন, দেখতে অনেকটা ইউ. এস. আর্মি-র এম-ফরটিনের মতো।

রানার একটা হান্টিং রাইফেল দরকার, যেন দুশো গজ দূর থেকে একজন মানুষকে অনায়াসে ঘায়েল করা যায়। দেখে-শুনে একটা উইনচেস্টার পয়েন্ট টু সেভেন জিরো পছন্দ হলো ওর। সাথে রয়েছে একটা ভ্যারিয়েবল রেডফিল্ড স্কোপ, নাইন পাওয়ার পর্যন্ত ম্যাগনিফিকেশন। একটা শোল্ডার-স্লিং, গান ব্যাগ আর দুই বাক্স শেলও কিনলো। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না, গুণ গুণ করতে করতে বেরিয়ে এলো দোকান থেকে।

ডুলাথে বেন কুইকের বিধবা স্ত্রীকে জেরা করছে ফেডারেল এজেন্টরা — এবার নিয়ে নয় বার। বিল, ক্যাশমেমো, আইডেনটিটি কার্ড,

বীমা পলিসি, পাসপোর্ট, বাতিল চেক—বেন কুইকের যাবতীয় কাগজ-পত্র টেবিলের ওপর স্তূপ করা হয়েছে। সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে যতোটা সম্ভব সহযোগিতা করছে মিসেস কুইক। পাইলট স্বামীর অতীত জীবন সম্পর্কে কেন তারা এতো কথা জানতে চাইছে তা তার বোধগম্য হলো না। বিয়ের আগে তার স্বামী কোথায় ছিলো, কেমন ছিলো—এসব প্রশ্নের বিশদ বিবরণ কি তার পক্ষে দেয়া সম্ভব? বৃত্ত আন্তরিকতার সাথেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল সে। স্যোশাল সিকিউরিটির পেনশন স্বীকৃতির কল্যাণে মাসে মাসে যে টাকাটা তার পাবার কথা, স্বামীর অবর্তমানে বেঁচে থাকার বিরাট একটা ভরসা হতে পারে সেটা। কাজেই ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো এই সরকারী লোকদের অসন্তুষ্ট করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। সেই একই কথা আবার তাদেরকে বললো সে—বেন কুইকের কৈশোর কেটেছে মিনিয়াপোলিসে, হাইস্কুলের পড়াশোনাটা সেখানেই শেষ করে সে। তারপর কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, ওখানে দু'বছর থাকার সময়ই প্লেন চালাতে শেখে...।

‘সাপ্তাহিক মিটিঙে কি আলোচনা হলো?’ সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার, ল্যাংলি—বসের ঘরে ঢুকে জানতে চাইলো কমপিউটার বিজ্ঞানী চ্যারিটি উডস্টক।

‘ঘোড়ার ডিম আলোচনা হলো!’ কর্নেল জিল ক্যাসেল তাক্ষিল্যের সাথে জবাব দিলো। প্রতি সোমবার ওয়াকিং গ্রুপ সিক্স পেণ্টাগনে এই মিটিঙে বসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টা ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে তাতে।

‘বিগ রড বা বিটার ক্যাণ্ডি সম্পর্কে নতুন কিছু?’ জানতে চাইলো



উডস্টক, অপারেশন ছোটোর কোড নেম উচ্চারণ করলো সে।

‘ইতিমধ্যে যা জেনেছি তারচেয়ে বেশি কিছু না। ও. এন. আই.-এর এক ভাঁড় একটা রিপোর্ট পড়ার সময় এমন ভান করলো যেন সসার বা ওই জাতীয় কিছু প্রত্যক্ষ করেছে সে। লং আইল্যান্ডের কাছ ঘেঁষে একটা সাবমেরিন নাকি গেছে। ওরা রেডিও সিগন্যালও টেপ করেছে—কোথাকার কে এক রোমিও সম্পর্কে। কোডেড সিগন্যাল, এন. এস. এ. এক্সপার্টরা কোড ভেঙেছে। সবাই ভারি উত্তেজিত। কিন্তু আমি মাতিনি।’

‘রেগে জাননি তো?’ উকিলের মতো কৌশলে প্রশ্ন করলো উডস্টক।

‘আরে না, একেবারে অবোধ বালকের মতো ঠাণ্ডা ছিলাম, চ্যারিটি!’

চ্যারিটি উডস্টকের চোখ জোড়া ক্ষীণ একটু বিস্ফারিত হলো। মনে মনে ভাবলো, বেহায়া লোকটা জানে ফাস্ট নেম ধরে ডাকলে বিরক্ত এবং অস্বস্তি বোধ করেন-সে, তবু হালকা পরিবেশের সুষোগ নিতে কখনো তার ভুল হয় না। লোকটা যদি আমার বস না হতো রে! দেখো কি সাহস, আবার আমার নতুন ব্রেসিয়ারের দিকে কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে! আমার ধারণাই ঠিক, লোকটা মানসিক প্রতিবন্ধী।

‘আমি খুব হাঁক-ডাক ছাড়লো, তারা নাকি হাওয়াই-এর কাছে চীনের তৈরি কিছু অস্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। আর এয়ারফোর্সের গর্ব হলো, মিলিয়ন ফিট ওপর থেকে আরো কিছু ছবি তুলেছে তারা। এই কাজটা খুব ভালো পারে ওরা, ছবি তুলতে। ভাবনার কিছু নেই, আগাগোড়া নিরোধ সেজে বসে ছিলাম আমি। ঘন ঘন

শুধু মাথা ঝাঁকিয়েছি। ভুল একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি। বরং ওদের আমি কিছু উপাদেয় খোরাক সাপ্লাই দিয়েছি, যাতে আমাদের ব্যাপারগুলো থেকে মনোযোগ ছুটে যায়। নতুন পোলিশ অ্যাটাশে আসছে, মায়ামিতে একটা ট্রান্সমিটার রয়েছে, ইত্যাদি। কাজ পেয়ে ভারি খুশি হয়েছে সবাই।’

‘তাহলে তো ভালোই।’

‘তোমার এদিকে খবর কি? সংকটের কোনো আভাস পাচ্ছে?’  
টে করে একবার কমপিউটার বিজ্ঞানীর বুকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলো জন ক্যাসেল।

‘বেন সুইটল্যান্ড ফোন করেছিলেন।’

‘নিপাট ভদ্রলোক,’ মন্তব্য করলো কর্নেল, হাত বাড়িয়ে বাস্তু থেকে চুরুট বের করলো একটা।

‘বেন সুইটল্যান্ড সি. আই. এ. ডিরেক্টরের পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এবং একটা ইতর, ঠিক আপনার মতো,’ শেষ শব্দ তিনটে মনে মনে বললো চ্যারিটি উডস্টক।

মাথা ঝাঁকালো জন ক্যাসেল, নীলচে ধোঁয়া ছাড়লো সিলিঙের দিকে। ‘আমিও তাই বোঝাতে চেয়েছি—সব কথাই কি আমরা উল্টো করে বলছি না?’ মধুমাথা হাসি উপহার দিলো সে। ‘তা, কি চায় সে?’

‘বললো, ডিরেক্টর জানতে চেয়েছেন...,’ বাধা পেয়ে থেমে গেল চ্যারিটি উডস্টক। দরজায় নক হচ্ছে।

‘ইয়েস, কাম ইন,’ ধমকের সুরে বললো কর্নেল।

‘আমি চ্যাপেল, স্যার,’ দরজা সামান্য একটু খুললো প্রথমে, বাইরে থেকে ভেসে এলো সবিনয় কণ্ঠস্বর। ‘কন্ট্রোল রুমে কাজ

আছে, আমার একটা পাস দরকার ছিলো ...।’ ভেতরে ঊকি দিলো চ্যাপেল ।

‘এখন নয়, পরে—যাও !’

বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা ।

‘হ্যাঁ ।’ চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে থাকলো জন ক্যাসেল ।

‘ডিরেক্টর জানতে চেয়েছেন,’ বললো উডস্টক, ‘আপনার কাজ-  
নের কাছ থেকে আপনি কোনো খবর পেয়েছেন কিনা ।’

‘তুমি কি বললে, চ্যারিটি ?’ ঘন ঘন চুরুটে টান দিয়ে নিজের  
সামনে ধোঁয়ার একটা আড়াল তৈরি করলো জন ক্যাসেল ।

‘বললাম, কোথায় আছে তা আমরা জানি । সময় মতো বিস্তারিত  
রিপোর্ট পাঠাবো ।’

‘গু-উ-উ-ড ! এই, ভালো কথা, তোমাকে আমি চ্যারিটি বলে  
ডাকলে তুমি আবার কিছু মনে করো না তো ?’

‘মনে করলেই বা কি ? সবাই কি আর বদভ্যাস ত্যাগ করতে  
পারে ? তবে নাম নিয়ে ততোটা মাথা-ব্যথা আমার নেই । আমি  
সম্পর্ক আর মর্যাদার গুরুত্ব দেই ।’

‘আমিও তোমারই দলে । আমি চাই না তুমি ভাবো সম্পর্কটাকে  
ব্যক্তিগত পর্যায়ে টেনে আনছি ।’ কথা শেষ করে চ্যারিটি উড-  
স্টকের নতুন ব্রেসিয়ারের ওপর আরেকবার চোখ বুলালো সে ।

রাইফেল নিয়ে গোল্ডেন ইনে ফিরলো না রানা । ওয়েস্ট ফরটি-  
সেকেণ্ড স্ট্রীটে অ্যাভিসের একটা শাখা রয়েছে, রুপ্লাস্টিক মোড়া  
আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড দেখিয়ে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত একটা ডজ-  
ওয়াগন ভাড়া করলো । পিছনের কমপার্টমেন্টে রাইফেল আর শেল

ভরে তাল লাগিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায় ।

কেনাকাটা শুরু করলো রানা । দেড় ঘণ্টা ধরে পাঁচ-সাতটা দোকানে অভিযান চললো । প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রে ঠাসা নতুন স্যুটকেস নিয়ে এইটথ্ এভিনিউয়ের বব হাডসন মোটোলে উঠলো ও । বিপদের মধ্যে আছে, এলিভেটরকে ভয় করা উচিত বলে তিন-তালার একটা কামরা পছন্দ করলো । ইমার্জেন্সির সময় যদি গালা-বার দরকার হয়, এক ঝুল-বারান্দা থেকে আরেক ঝুল-বারান্দায় লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে আসা ওর জন্যে কঠিন হবে না । স্যাভয়ের ধারেকাছে না যাওয়াই ভালো, এখন থেকে বব হাডসনই ওর সেফ হাউস । স্যুটকেস খুলে তিনটে জিনিস বের করলো ও—দু'জোড়া মোটোরোল । ওয়াকি টকি, ব্যাটারিচালিত এ. এম./এফ. এম. রেডিও, আর আড়াইশো ডলার দিয়ে কেনা শর্টওয়েভ রিসিভার । সবশেষে টুল কিট বের করে এ. এম./এফ. এম. ইউনিটটাকে মডিফাই করতে বসলো । কাজটা শেষ করার পর এফ. বি. আই. যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে তা এখন শুনতে পাবে ও । দীর্ঘ কয়েক মিনিট একমনে শুনলোও রানা, কাজটায় কোনো খুঁত নেই বুঝতে পেরে সন্তুষ্টির ক্ষীণ হাসি দেখা দিলো ঠোঁটে । এরপর রানা টার্গেট প্র্যাকটিসের জগ্গে ওয়েস্ট টোয়েনটিয়েথ্ স্ট্রীটের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো ।

ওদিকে তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে মস্কায়, ক্রোপতকিন স্ট্রীট থেকে জেনারেল কায়কোভস্কির খোলা জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে । চুরুটের গন্ধ আর ধোঁয়ায় গুমোট হয়ে আছে ঘরের পরিবেশ, দু'জনের চেহারাই ক্লান্তি আর উদ্বেগে ঝুলে পড়েছে । এই ঘরে আরো কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে, কথাটা মনে

হওয়ায় এইমাত্র জানালাটা খুলে দিয়েছেন জেনারেল।

রাত জাগা লাল চোখ নিয়ে জানালার সামনে, জেনারেলের পাশে চলে এলেন কর্নেল বিকারেন, তাজা বাতাসে ভরে নিলেন ফুসফুস।

‘খুব বেশি চুরুট খাচ্ছি, তাই না, আনাতোলি?’

বিকারেন শুধু কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, ‘ক্যানসাসে বেচারী মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে অথচ আমরা তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।’

অবাক হয়ে ডেপুটির দিকে তাকালেন জেনারেল, তারপর আপনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে জানালার দিকে পিছন ফিরলেন, ধীর পায়ে ডেস্কের পিছনে এসে ধপ্ করে বসে পড়লেন নিজের চেয়ারে। হাত বাড়িয়ে বাক্স থেকে একটা চুরুট বের করলেন। ‘সিদ্ধান্ত তো অনেক আগেই নেয়া হয়ে গেছে, আনাতোলি।’

‘জী!’ আকাশ থেকে পড়লেন বিকারেন। ‘সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে? তাহলে সারাটা রাত জেগে কি করছি আমরা? কি সিদ্ধান্ত হয়েছে, জেনারেল কমরেড?’

‘রাত জেগে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করছি, আনাতোলি। মাতৃভূমির স্বার্থে সুইসাইড পিল খেয়ে মহিমাবিত হবার সুযোগ ছিলো ইলিয়টসিনের, কিন্তু সে সুযোগ সে নেয়নি বা নিতে পারেনি। তাকে গৌরবান্বিত করার দায়িত্ব এখন আমাদের। এ-ব্যাপারে তোমার কোনো দ্বিমত আছে?’

‘না। কিন্তু দায়িত্বটা পালন করবে কে? মানে কাকে দিয়ে আমরা কাজটা করাবো?’

‘রানাকে আমরা অনুরোধ করবো,’ বললেন জেনারেল। ‘সামরিক

হাসপাতালে ঢুকে একজন মানুষকে মৃত্যুর মহিমা দান করা, তারপর নিজের চামড়া বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসা, তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত না-ও হতে পারে সে। তাই একই নির্দেশ আমরা রেসিডেন্টকেও দেবো।’

প্ল্যানটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন বিকারেন। মনে হচ্ছে ভালোই। মার্কিন সামরিক হাসপাতাল থেকে ইলিয়টসিনকে বের করে আনা কে. জি. বি. বা রানার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই তাকে মৃত্যুর মহিমা দান করাই ভালো।

‘শুধু ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে নয়,’ আবার বললেন জেনারেল, ‘উদ্বেগে অস্থির বলেও রাত জাগছি আমরা, আনাতোলি।’ এতোক্ষণে চুরুটটা ধরালেন তিনি। ‘মেসেজটা তুমি আরেকবার পড়বে নাকি?’

এবার নিয়ে দশ কি এগারোবার পড়া হবে। রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে কে. জি. বি.-র নিজস্ব চর আছে, সেই পাঠিয়েছে এই মেসেজ। ‘পুরোটা, জেনারেল কমরেড?’ জিজ্ঞেস করলেন বিকারেন।

‘অসুবিধে কি!’

ডেস্ক থেকে মেসেজ লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন বিকারেন, ‘প্রথমে যে প্ল্যানটা ওরা করে, তার অংশবিশেষ জানিয়েছিলাম আপনাদের। একদিন পর প্ল্যানটা বদল করে ওরা, তার পুরোটা আমি জানতে পেরেছি। মাসুদ রানাকে ওরা ডালচিমস্কির চেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করছে। ডালচিমস্কির ব্যবস্থা করার জন্যে দু’জনের একটা দলকে পাঠানো হয়েছে। রানার ব্যবস্থা করার জন্যে তিনটে গ্রুপকে জরুরী নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গ্রুপগুলো আমেরিকাতেই আছে। আর টেলি-বমগুলোকে একেজো করার জন্যে মেক্সিকো থেকে চারটে কমাণ্ডো গ্রুপ অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। পেনিট্রেট করার জায়গা আর তারিখ আগেই জানিয়েছি।’

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

চোখ বুজে শুনছিলেন জেনারেল, চোখ খুলে বললেন, ‘প্রশ্ন হলো, রানাকে এ-সব তথ্য জানানো উচিত হবে কি?’

‘বলেন কি, জেনারেল কমরেড!’

‘জানাতে নিজের গা বাঁচানোর জন্যে বেশিরভাগ সময় নষ্ট করে ফেলবে সে,’ বললেন জেনারেল। ‘ডালচিমস্কিকে খুঁজবে কখন?’

‘কিন্তু এ-সব না জানলে যে মারা পড়বে সে। মরহুম মাসুদ রান কোন্ কাজে আসবে আমাদের?’

গম্ভীর চেহারা নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন কে. জি. বি. চীফ। ‘অকাট যুক্তি বটে। তাহলে এখনো তাকে আমরা জানাচ্ছি না কেন?’

‘আজই তাকে মেসেজ পাঠাবার দিন...।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পককেশ জেনারেল। ‘ঘূমাতে যাচ্ছি, আনাতোলি। শুধু যদি খবর পাও মস্কোর দিকে মার্কিন মিসাইল আসছে তবেই আমার ঘুম ভাঙবে।’

‘আমিও আমার সহকারীকে সেই নির্দেশই দেবো,’ তিক্ত হেঁচো বললেন বিকারেন। ‘তবে আমার শুতে যেতে দেরি আছে।’

উইনচেস্টারের গর্জন চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো ওয়েস্ট টোয়েনটিয়েথ্ স্ট্রিটের শূটিং রেঞ্জটা বলতে গেলে নতুন তৈরি করা হয়েছে, শব্দ হজম করার সমস্ত আধুনিক উপকরণ সহ

তা সত্ত্বেও কান ফাটানো আওয়াজে চেষ্টারের সবাই কেঁপে উঠলো। সাইট সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করে আবার ফায়ার করলো রানা।

বুল'স আই। ডেড সেন্টার।

খোলা বাক্সের ভেতর উঁকি দিয়ে আরেকটা ম্যাগাজিন দেখতে পেলো রানা। রাইফেলের সাইট নিখুঁতভাবে অ্যাডজাস্ট করা গেছে, তবু বারবার গুলি করবে রানা শুধু নিশ্চিত হবার জন্যে যে পয়েন্ট টু সেভেন জিরো যথাযথ 'টিউনড্' অবস্থায় আছে। রিলোড করলো রানা, তাক করলো, তারপর ফায়ার।

বুল'স আই

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

বুল'স আই।

চকচকে শেল কেসগুলো পায়ের কাছে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। 'নাইস শূটিং,' টেকো মাথায় হাত বুলিয়ে বললো লোকটা, পরনে হরঙা হাওয়াই শার্ট।

হেডসেট পরে আছে রানা, শুনতেই পেলো না। আবার ট্রিগার ঝিললো ও।

বুল'স আই, সেই সাথে খালি হয়ে গেল ম্যাগাজিন। হেডসেট লে ফেললো রানা।

'ভেরি নাইস শূটিং,' আবার বললো লোকটা, 'বিশেষ করে এ-রনের একটা গান দিয়ে। এটা দিয়ে আপনি কি শিকার করেন?' ফিরলো রানা, লোকটার পাশে একটা মেয়েও রয়েছে। সাদা



শর্টস, সাদা গেঞ্জি । আঠারো কি উনিশ, আন্দাজ করলো রানা । হাসলো ও । বললো, ‘ভালুক...বনমানুষ...অ্যালিগেটর—মেয়ে ছাড়া আর সব কিছু !’

‘মেয়েদের জন্যে ভারি দুঃসংবাদ,’ সঙ্গীর উদ্দেশে চোখ মটকে বললো মেয়েটা । হাত ধরাধরি করে হাঁটা ধরলো ওরা ।

সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে থাকলো রানা । প্রতি মুহূর্তে ব্যাকুলতা বাড়ছে । প্রায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, এই সময় বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হবার মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো মেয়েটা, ছোট্ট করে একবার হাত নাড়লো । হালকা আনন্দের শ্রোত বয়ে গেল রানার সারা শরীরে ।

সেল কেসগুলো কুড়িয়ে পকেটে রাখলো রানা । কয়েক মিনিট পর রেঞ্জ থেকে বেরুবার সময় দারোয়ানের হাতে গুঁজে দিলো ওগুলো, রিলোড করার জন্যে কারো না কারো কাজে লাগবে ।

বব হাডসন মোটোলে, নিজের কামরায় ফিরে এলো রানা । ঘাম শুকিয়ে গেলেও কেমন নোংরানোংরা লাগছে নিজেকে । আরেকবার গোসল করলো । কাপড়চোপড় পরে হাতঘড়ির ওপর আরেকবার চোখ বুলালো । সময় প্রায় হয়ে এসেছে । মস্কো যদি ওকে কোনো মেসেজ দিতে চায়, এখন থেকে ঠিক তিন মিনিট পর আগে থেকে ঠিক করা ফ্রিকোয়েন্সিতে দৈনিক শর্টওয়েভ নিউজ ব্রডকাস্ট-এর মাধ্যমে দেবে । হ্যালিক্রাফটার রিসিভারটা অন করলো রানা, ফ্রিকোয়েন্সি পেলো, তারপর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খবরের প্রতিটি শব্দ শর্ট হ্যাণ্ডের সাহায্যে লিখে নিলো একটা কাগজে । মেসেজ থাকলে খবরের ভেতরই লুকিয়ে আছে । কোড ভাঙতে বসলো রানা ।

দশ মিনিট পর সাংকেতিক মেসেজটার অর্থ দাঁড়ালো, ‘ইলিয়ট-সিনের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিন। আভাস পেয়েছি আপনার ওপর কমপক্ষে তিনবার হামলা চালানো হতে পারে। টেলি-বমগুলোকে অকেজো করার জন্যে গ্রু চারটে দল পাঠাচ্ছে, অন্য কোনো উপায় না দেখলে এফ. বি. আই.-এর হাতে ধরিয়ে দিন ওদের। ওরা...।’

এরপর জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোন্ শহরে, কোন এয়ার-পোর্টে, কবেকার কোন্ ফ্লাইটে আসবে দল চারটে।

কাগজটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালো রানা। রাগে পিড়ি জ্বলে যাচ্ছে ওর। ইলিয়টসিনের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিন মানে? ওরা কি তাকে কসাই বা খুণী বলে ধরে নিয়েছে? ইলিয়ট-সিন কে? তার সাথে ওর কোনো শত্রুতা আছে? কেন রানা তাকে খুন করতে যাবে? একজন দেশপ্রেমিক, দেশের সেবা করার জন্যে কে. জি. বি.-তে নাম লিখিয়েছিল। কে. জি. বি. তাকে স্যাবোটাজে ট্রেনিং দিয়ে আমেরিকায় পাঠায়। সেই থেকে আজ তেরো চোদ্দ বছর সম্মোহিত অবস্থায় ছিলো লোকটা। কারো কোনো ক্ষতি করেনি, সং জীবনযাপন করে এসেছে। হঠাৎ মূর্তিমান এক শয়তান তাকে টেলিফোন করলো, দম দেয়া পুতুলের মতো একটা ঋংসকাণ্ড ঘটিয়ে বসলো বেচারী—এক রকম বলতে গেলে নিজের অজান্তেই। অথচ রাশিয়ার সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বাধেনি।

কি দোষ এই লোকের? কি দোষ এই একশো ছত্রিশ জনের?

উহু, মাথা নাড়লো রানা। এ কাজ সে করবে না।

কিন্তু তারপরই ভাবলো, সে না করলে আর কাউকে দিয়ে কাজটা করাবে কে. জি. বি.। হয়তো ইতিমধ্যে রেসিডেন্টকেও প্রয়োজনীয়

নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

ইলিয়টসিনের প্রতি সহানুভূতি জাগছে । লোকটা সুইসাইড পিল খেলে সমস্যাটা দেখা দিতো না । গুলি খেয়ে মরে গেলেও পারতো । কিন্তু আত্মহত্যা করেনি বা নিহত হয়নি বলে এখন তাকে খুন করতে হবে ?

ধীরে ধীরে একটা চ্যালেঞ্জ জাগছে রানার মনে ।

কিন্তু সামরিক হাসপাতালে কিভাবে ঢুকবে সে ? ঢুকতে যদি বা পারেও, লাভ কি তাতে ? নিশ্চয়ই কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে ইলিয়টসিনকে । হাসপাতালে নাহয় ঢুকলো, কেবিনে ঢুকবে কিভাবে ? আচ্ছা, ধরা যাক কেবিনেও ঢোকা সম্ভব, তারপর ?

এতোক্ষণে রানা উপলব্ধি করলো, মস্কোও বাধ্য হয়ে ইলিয়টসিনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । হাসপাতালে ঢোকা সম্ভব হলে, কেবিনে ঢোকা সম্ভব হলে, লোকটাকে হয়তো মেরে ফেলাও সম্ভব । কিন্তু তাকে বের করে নিয়ে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয় ।

অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল রানার ।

এটা একটা মানবিক সমস্যা ।

কিন্তু ঝুঁকিটা আত্মঘাতী ।

এ-ধরনের ঝুঁকি তুমি আগেও নিয়েছো !

কিন্তু তা নিয়েছি স্বদেশের জন্যে । ইলিয়টসিন আমার কে ?

একজন স্পাই । তোমার মতো । একজন দেশপ্রেমিক । তোমাদের পেশা এক ।

এবং তার কোনো দোষ নেই । সচেতনভাবে সে কোনো অত্যাচার করেনি ।

আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে ভেবে দেখবো কি করা যায় । হু'এক-

দিনের মধ্যে এমনিতেও লোকটা মারা যেতে পারে।

মেসেজটা আরো বার কয়েক পড়ে মুখস্থ করে নিলো রানা। তারপর ছিঁড়লো, টুকরোগুলোয় আগুন ধরিয়ে পোড়ালো, সবশেষে ছাইগুলো বেসিনে ফেলে ট্যাপের মুখ খুলে দিলো।

টেবিলের সামনে ফিরে এসে আবার কাগজ-কলম নিলো রানা। ইতিমধ্যে বিক্ষোভিত টেলি-বোমাগুলোর একটা তালিকা তৈরি করলো ও। তারপর ভাঁজ খুলে ইউ. এস. রোড ম্যাপের দিকে তাকালো। ইস্ট হ্যাম্পটন থেকে আসার পথে গ্যাস স্টেশন থেকে কিনেছিল এটা।

‘কলোরাডো...মেইন...উইসকনসিন...ক্যানসাস,’ ম্যাপের ওপর প্রতিটি জায়গা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো রানা। এই চার জায়গার টেলি-বম ফাটিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি। এখানে কোথাও একটা প্যাটার্ন না থেকেই পারে না। কিন্তু ওর চোখে ধরা পড়ছে না। লোকগুলোর আসল নাম আগেই লিখেছে রানা, এবার আমেরিকান নামগুলো লিখলো। ছোটো তালিকা পাশাপাশি রেখে দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো। উহঁ, কোনো তাৎপর্য ধরা পড়ছে না। কাগজগুলো ছিঁড়ে পোড়ালো ও, ছাই ফেলে দিয়ে এলো বেসিনে।

চারটের সময় অপর রেডিওটা অন করে ডব্লিউ. সি. বি. এস. ধরলো রানা। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ মিনিট করে নেটওয়ার্ক নিউজ প্রচার করা হয় স্টেশনটা থেকে।

একটু পরই খবর শুরু হলো, ‘সিনেটের অধিবেশন আবার কাল সকাল দশটায় বসবে। ক্যানসাস থেকে সি. বি. এস. রিপোর্টার চ্যানিউট অন্তর্ঘাতক সম্পর্কে সর্বশেষ খবর জানাচ্ছে।’

সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা।

‘আগেই আপনাদের জানানো হয়েছে যে দু’দিন হলো কেউ একজন টেলিফোন কোম্পানীর লং-লাইন্স অপারেশনের মেইন সুইচিং সার্কিটগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। তদন্তে খুব একটা অগ্রগতি না হলেও কতৃপক্ষ মনে করছেন টিম পারকার-ই এই কাজের জন্যে দায়ী। এখনো তার জ্ঞান ফেরেনি, বিস্ফোরণের জায়গা থেকে নীল একটা মটরসাইকেল নিয়ে পালাবার সময় পুলিশের গুলিতে গুরুতর-ভাবে আহত হয় সে। সামরিক হাসপাতালে কড়া পাহারার মধ্যে রাখা হয়েছে তাকে। কতৃপক্ষীয় সূত্রে প্রকাশ, টিম পারকারের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ পাবার সম্ভব চেষ্টাই এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, টিম পারকার হয়তো তার আসল নাম নয়। এদিকে এফ. বি. আই.-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেসটা নিয়ে আলোচনা করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে, কেস মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রিপোর্টারদের কিছু জানাবার নাকি নিয়ম নেই। তবে আমাদের রিপোর্টার বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছেন যে বড়সড় একটা ফেডারেল টাস্ক ফোর্স ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে, সংখ্যায় তারা বিশজনের কম নয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং জনমনে টিম পারকার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এ-ধরনের একটা অপরাধ তার দ্বারা সম্ভবই নয়। সানডে স্কুল টিচাররা ডিনামাইট ফাটাবার ট্রেনিং পায় না। কথাটা সত্যি—টিম পারকার গত এগারো বছর ধরে একটা ব্যাপ্টিস্ট সানডে স্কুলে মাস্টারী করছিলেন...।’

স্কুল মাস্টার ? মনটা তেতো হয়ে গেল রানার। বোঝা গেল, কে. জি. বি. কর্মকর্তাদের কারো স্থূল রুচিবোধ এ-ব্যাপারটায় অবদান রেখেছে।

কিন্তু কারো সমালোচনা করে পার পাবার উপায় নেই। সমস্যার একটা সমাধান বের করতে হবে।

প্রথম কাজ জায়গা মতো পৌছানো। টেলিফোন বুকটা তুলে কোলের ওপর ফেললো রানা। টি. ডব্লিউ. এ.-র নম্বর বের করে ডায়াল করলো।

‘টি. ডব্লিউ. এ.। মিস সিন্টিয়া। মে আই হেলপ ইউ?’

লিভেনওয়ার্থের ফ্লাইট সম্পর্কে প্রশ্ন করলো রানা। ওকে জানানো হলো, লিভেনওয়ার্থে টি. ডব্লিউ. এ.-র কোনো সাভিস নেই, কাছাকাছি উইচিটা শহরে আছে। লাগুয়ারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে দিনে পাঁচটা ফ্লাইট উইচিটায় যায়, আরো দুটো যায় নেউয়ার্ক থেকে।

‘ধন্যবাদ,’ বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা। কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলো ও। তারপর আবার ফোনের রিসিভার তুলে মুখস্থ করা একটা নম্বর ডায়াল করলো। ভিনসেন্ট গগলকে দরকার ওর।

## বারো

---

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের একটা অংশ আজও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে, দুর্গের মতোই দেখতে লাগে। কালের আঁচড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো

বুলডোজার দিয়ে ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন, আধুনিক ইमारত তৈরি করা হয়েছে। কয়েক যুগ আগে ক্যানাসাসের ধু-ধু সমতল প্রান্তরের মাঝ-মধ্যখানে তৈরি করা হয়েছিল দুর্গটা, চারপাশে তখন জনবসতির চিহ্নমাত্র ছিলো না। দৃশ্যটা আমূল বদলে গেছে, ফাঁকা জায়গা বলতে বাকি আছে শুধু দুর্গের ভেতর বিশাল উঠন, দুর্গের আশপাশে গিজ গিজ করছে আধুনিক দালান-কোঠা।

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ সামরিক হাসপাতাল, কাজেই সিভিলিয়ানদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। কড়া ভাঁজ করা উদি পরে যারা গেট পাহারা দেয়, তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, সাথে অনুমতি-পত্র থাকলেও সব লোককে তারা ভেতরে ঢুকতে দেয় না। অভিজ্ঞতা থেকে সিকিউরিটি অফিসারদের জানা আছে, প্রায় ক্ষেত্রেই পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালায় অশুভ শক্তি। তাই ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ মেরামত করার সময় পিছনের দরজা বলে কোনো কিছু রাখা হয়নি। পাশাপাশি দুটো চওড়া গেট, মাঝখানে বিশ গজ নিরেট পাথুরে পাঁচিল। প্রতিটি গেটের পাশে, ভেতর দিকে, একটা করে গেট হাউস। প্রতিটি গেট হাউসের দুটো অংশ। একটা অংশে রেডিও, ওয়্যারলেস, ফোন, ইত্যাদি রাখা হয়, সশস্ত্র প্রহরীরা বিশ্বামণ্ড নেয় এখানে। আরেক অংশে ভিজিটরদের বসানো হয়। ভিজিটরদের ওপর নজর রাখার জন্যে এখানেও থাকে সশস্ত্র প্রহরী।

গেট এ দিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করে, গেট বি দিয়ে যান-বাহন। কোনো কোনো যানবাহনকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না, অনুমতি পাওয়া গেলে আরোহীদের গেট এ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। প্রহরীদের পরিচিত হাসপাতাল কর্মী, নার্স, ডাক্তার, প্রশাস-

নিক কর্মকর্তা, ডেলিভারী ভ্যানের ড্রাইভার. এবং মেথরদের দেহ তল্লাসী করা হয় না বটে, কিন্তু সন্দেহ হলে তা করার অধিকার প্রহরীদের আছে। অপরিচিত সব লোকেরই দেহ-তল্লাসী করা হয়। ওষুধের বাক্স ভাঙি রেফ্রিজারেটর, অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট বা প্যাক করা অন্য কোনো ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, যেগুলো গেটে খুলে দেখা সম্ভব নয়, সেগুলো ভেতরে নিয়ে যাওয়া বা ভেতর থেকে বের করা মহা ঝামেলার ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিশেষ অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত প্রহরীরা গেটেই সব আটকে রাখে। ভিজিটররা চকলেট, ফুলমূল, বা ফুল নিয়ে আসে বটে, কিন্তু সবই বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখার পর ভেতরে নিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়। ঝামেলা পোহাতে হয় বলে বেশিরভাগ ভিজিটর খালি হাতেই রোগী দেখতে আসে।

শুধু গেটেই নয়, উঠানে এবং হাসপাতালের সবখানে সিকিউরিটি অফিসাররা নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায়। বিসদৃশ কিছু চোখে পড়লেই চেক করে তারা, যে কোনো লোককে খামিয়ে অনুমতি-পত্র চায়।

ভূর্ভেদ্য একটা দুর্গই বলা চলে।

আজ বিকেলে, রানা যখন তার নিউ ইয়র্ক মোটেল কামরায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের বাইরে তখন তাপমাত্রা একশো এক ডিগ্রীর কাছাকাছি। গোটা হাসপাতাল শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত, কাজেই ভেতরের তাপমাত্রা সত্তর ডিগ্রীর বেশি নয়। তবে দুশো এগারো নম্বর কেবিনে যারা রয়েছে পার্থক্যটা তাদের কাছে তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না। বিছানায় পড়ে থাকা আহত লোকটার কণ্ঠের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। শুধু পেটে



নয়, তার বৃকেও কয়েকটা ফুটো তৈরি করেছে বুলেট। ডান কাঁধের হাড় উড়ে গেছে। ছিঁড়ে নিয়ে গেছে একটা কান। অর্ধ-সচেতন দেহটার সাথে অনেক ধরনের টিউব আর পাইপের সংযোগ দেয়ায় বেচারার ব্যথা-বেদনা আরো বরং বেড়েছে। অথচ উপস্থিত সাতজন মানুষের মধ্যে ভ্যানেসা রিকার্ড আর ডেরেক মারলো ছাড়া লোকটার ব্যাপারে কারো কোনো সহানুভূতি বা দরদ নেই। ভ্যানেসা রিকার্ড সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন নার্স, একহারা গড়নের সরলমতি নীলনয়না। আর ডেরেক মারলো একজন মেজর, সেই সাথে একজন সার্জেন, এক মুখরা রমণীর স্বামী এবং হাফ ডজন বখাটে পুত্র সন্তানের জনক।

রোগীর ব্যাপারে গोजি-র কোনো দরদ থাকার কথা নয়। পিপি গोजি এফ. বি. আই.-এর অফিসার, উইচিটা ব্যুরো-র ইনচার্জ। লোকটার চুল ছোটো, কিন্তু লোকে যা আন্দাজ করে তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। পিপি গोजির যদি কোনো দরদ না থাকে, মাইকেল এগারসনেরও থাকার কথা নয়। ছেলেমানুষই বলা যায় তাকে, পিপি গोजির সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। পঞ্চম<sup>১</sup> লোকটার পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার কিছুই জানা যায়নি, উপস্থিত ছ'একজন তার পরিচয় উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। কেবিনের বাইরে সাদা পোশাক পরা ছ'জন সিকিউরিটি অফিসার পাহারায় আছে, এই সাতজনের একটা তালিকাও আছে তাদের কাছে। নামগুলোর পাশে প্রত্যেকের পরিচয় লেখা আছে বটে, কিন্তু এই পঞ্চম ব্যক্তির নামের পাশে লেখা আছে ছোটো মাত্র শব্দ—কর্নেল উড। কোথাকার কর্নেল সে-সম্পর্কে কোনো আভাস দেয়া হয়নি। কর্নেল উড এই মুহূর্তে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের

সাথে একটা রিপোর্ট পড়ছে। আর তার সহকারী, একজন নিগ্রো লেফটেন্যান্ট, রোগীর দিকে পিছন ফিরে টেপ-রেকর্ডার অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত। সপ্তম ব্যক্তিটি নিজের পরিচয় দিয়েছে—সে নাকি টেলিফোন কোম্পানীর চীফ সিকিউরিটি অফিসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট, নিউ ইয়র্কের মাইকেল টুইড।

বিছানায় পড়ে থাকা দুর্ভাগ্য লোকটার গলা থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। অথচ কেউ তার দিকে তাকালো না, সবারই দৃষ্টি ঝট করে উঠে গেল একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দিকে, যন্ত্রের স্ক্রীনে লোকটার হার্টবিট ধরা পড়ছে—চলমান সাদা বিন্দুর বিরতিহীন মিছিল।

সিনিয়র এফ. বি. আই. অফিসারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। পিপি গोजি চাপা, কঠিন সুরে নির্দেশ দিলো, ‘ওকে মরতে দেবেন না!’

মেজর-ডক্টর ডেরেক মারলো কাঁধ ঝাঁকালো। ভাবলো, বাপই বোধহয় ঠিক বলেছিল। সাইকিয়াট্রি নিয়ে পড়াশোনা করলেই ভালো হতো। পার্ক এভিনিউয়ে ছ’কামরার একটা চেম্বার নিয়ে বসতো, কর্নেল আর ফেডারেল এজেন্টদের অন্যায় আবদার শুনতে হতো না। ‘আমরা আমাদের সাধ্যমতো করছি,’ শান্ত গলায় বললো সে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী। রোগী বাঁচবে কিনা নিজেও জানে না, অথচ একই হুকুম বারবার শুনতে হচ্ছে।

‘সাধ্যমতো করাই যথেষ্ট নয়,’ বললো পিপি গोजি। ‘একান্তই যদি মরতে চায়, আমরা ওর সাথে কথা বলার পর মরুক।’ তার সহকারী মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করলো।

‘কেমন বুঝছেন, মেজর?’ প্রশ্নটা কর্নেলের।

‘কি জানি। এখনো যে নিঃশ্বাস ফেলছে এটাই তো আশ্চর্য।

আপনারা তো আর গুলি করতে কোথাও বাকি রাখেননি ।’

‘শুনুন, মেজর...’

‘ষাঁড়ের মতো জীবনীশক্তি,’ বলে চলেছে ডাক্তার-মেজর । ‘অন্য কোনো লোক হলে হাসপাতালে আনার অনেক আগেই মারা যেতো ।’

এই সময় বিছানা থেকে একটা শব্দ উচ্চারিত হলো, ‘এডনা ।’  
আওয়াজটা রোগীর গলা থেকে নিশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো ।

সাতজনই ঝুঁকে পড়লো বিছানার দিকে । কিন্তু রোগী আর কোনো কথা বললো না ।

‘এডনা ?’ সবার দিকে একবার করে তাকালো পিপি গোল্ডি, এফ. বি. আই. অফিসার । ‘এডনা মানে ?’

সেবিকা ভ্যানেসা মানুষটা ছোটোখাটো, মাত্র বাইশ বছর বয়স, কিন্তু ইউনিফর্ম পরেও সে তার যৌবন আড়াল করতে পারেনি । প্রশ্নটা নিয়ে দু’সেকেণ্ড চিন্তা করলো সে, তারপর বললো, ‘কি জানি !’

‘ওর স্ত্রী হতে পারে না,’ টান টান পেশী নিয়ে বললো কর্নেল উড । ‘সে মারা গেছে, তিন বছর আগে ।’

‘তার নাম ছিলো লিজা,’ তিরস্কারের সুরে বললো এফ. বি. আই. অফিসার ।

ওদের সবার মুখের দিকে তাকালো সেবিকা ভ্যানেসা ।

‘ওর বার্থ সার্টিফিকেট, হাইস্কুল ডিপ্লোমা, এবং নেভি থেকে পাওয়া ডিসচার্জ পেপার সবই জাল,’ ভ্যানেসার কানের কাছে পুরু ঠোঁটে নামিয়ে ফিসফিস করে বললো নিগ্রো লেফটেন্যান্ট ।

‘এডনা,’ গুরুতর আহত লোকটা আবার উচ্চারণ করলো । এই  
শান্তিদূত-১

লোকই টেলিফোনের সুইচিং সেক্টরটা বিক্ষোভ ঘটিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ।

টেলি-বম খাতায় পুরো বাক্যটা এভাবে লেখা আছে, ‘এডনা ব্যারেল বললো, আপনি আপনার বাড়িটা বিক্রি করতে চান ।’ কথাটার অর্থ এবং তাৎপর্য কামরার মাত্র একজন লোক জানে, কিন্তু সে বেচারার এমন অবস্থা নেই যে সবাইকে তা ব্যাখ্যা করতে পারে । অসিলোস্কোপের স্ক্রীনে সাদা বিন্দুগুলো আগের মতো ব্যস্তভাবে ছুটছে, রোগীর হার্টবিটের কোনো উন্নতি নেই ।

‘হুঃখিত, জেন্টলমেন,’ শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বললো ডাক্তার-মেজর ডেরেক মারলো । ‘রোগীর অবস্থা ভালো নয় । আপনারা কিছু লোক এবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ান ।’

‘কেসটার সাথে হয়তো জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে,’ প্রতিবাদের সুরে বললো পিপি গোজি ।

‘আমরাও থাকছি,’ অধিকার ঘোষণার সুরে বললো কর্নেল উড ।

‘ডাক্তার, যেভাবে হোক লোকটাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখুন,’ সিনিয়র এফ. বি. আই. অফিসার জেদ ধরলো । ‘কথা ওর সাথে আমাদের বলতেই হবে । আমরা ধারণা করছি লোকটা জঘন্য একটা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ।’

‘কিন্তু আমরা ওঁকে শুধু অসহায় একজন রোগী হিসেবে দেখবো,’ হাসিমুখে বললো সেবিকা ভ্যানেসা । তার কথায় সরল মানুষের গুণই প্রকাশ পেলো, ‘এ-ধরনের আপাতঃ নির্দোষ কথায় কেউ রাগ করতে পারে সে-ব্যাপারে সচেতন নয় । ‘সেজন্মেই আমরা চাইবো আপনারা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন ।’

চোটপাট দেখাবার কোনো ইচ্ছেই কারো মধ্যে জাগলো না ।

দরজার দিকে পা বাড়ালো এফ. বি. আই. অফিসার, তাকে অনুসরণ করলো কর্নেল। যদিও, ছুঁজনেই যে যার এইডের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। তারা নড়লচড়ল না। কালো লেফটেন্যান্ট বিছানার পাশে বসলো, হাতে টেপ রেকর্ডার। সে জানে, এফ. বি. আই. সহকারীর অ্যাটাচি কেসেও একটা টেপ-রেকর্ডার আছে। কিন্তু জিনিসটা লুকিয়ে রাখার কি মানে তা তার বোধগম্য নয়।

দশ মিনিট পর টেলিফোন কোম্পানীর লোকটা বললো, ‘যাই, কিছু মুখে নিয়ে আসি।’ সত্যি খিদে পেয়েছে তার। কিন্তু তার নাম মাইকেল টুইডও নয়, নিউ ইয়র্কে সে বাস বা কাজও করে না। ‘এমন-কি আমেরিকান টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাম কোম্পানীর কর্মচারীও নয় সে। এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করছে লোকটা, যেখানে ভুল করলে ক্ষমা করা হয় না। ওরা কখনো ক্ষতিপূরণ দেয় না, ক্ষতিটা ওদের দ্বারা হলেও।

ঠিক এই মুহূর্তে ওরা ইউ. এস. আর্মি হাসপাতাল ফোর্ট লিভেনওয়ার্থের এগারো নম্বর কেবিনের রোগীকে নিয়ে কি করা যায় সে-ব্যাপারে গভীর চিন্তা-ভাবনা করছে।

অর্ধবৃত্ত রচনা করে উড়ে এলো গ্রেনেডটা, তীব্র আলোর ঝলকানির সাথে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। মারা গেল চারজন লোক। ঝোপের আড়াল থেকে ড্রাম পেটাবার মতো আওয়াজ করে উঠলো হেভি মেশিনগান, বুলেটের প্রথম ঝাঁক আরো পাঁচজনকে ধরাশায়ী করলো। পরমুহূর্তে কনভয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়লো গোটা চারেক গ্রেনেড, ছনিয়া কাঁপানো শব্দে বিস্ফোরিত হলো ট্রাক ভর্তি অ্যামুনিশন। লাইনের প্রথম গাড়িটা একবার মাত্র ডিগবাজি

খেয়ে খাদে পড়ে গেল, পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যালিবারের বুলেট ড্রাইভারের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সবই প্রায় বের করে নিয়ে গেছে। খাদের নিচে অদৃশ্য হবার আগে লকলকে জিভের মতো আগুনের শিখা দেখা গেল ফুয়েল ট্যাংকে। একটা হাফ-ট্রাকে দাঁড়িয়ে একজন মেশিনগানার পাল্টা গুলিবর্ষণ করছে বটে, কিন্তু রানা জানে একটু পর তাকেও পটল তুলতে হবে।

হলোও তাই। স্বল্প বাজেটের জাপানী ছবি সবগুলো প্রায় একই ধরনের, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের বীরত্ব খাটো করে দেখানো হয়। বেণুমার মারা পড়ে বেচারারা।

বেলা এগারোটায় চার দেয়ালের ভেতর বসে যুদ্ধের ছবি দেখার কোনো মানে হয় না। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠলো রানা, টিভি সেট অফ করে একটা সিগারেট ধরালো। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে তাড়াতাড়ি রেডিওটা অন করলো ও। খবর পড়া শুরু হয়ে গেছে।

আহত অন্তর্ঘাতক সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। এফ. বি. আই. হয়তো সতর্ক হয়ে গেছে। ওষুধের সাহায্যে লোকটার হয়তো জ্ঞান ফেরানো হয়েছে, তারপর নির্ধাতন চালিয়ে কথা আদায় করা সম্ভব।

আরেকটা কথা ভুলে থাকতে পারছে না রানা। মস্কো কি একা শুধু তাকেই লোকটার চুক্তিপত্র বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে? কে. জি. বি. রেসিডেন্টকে কোনো নির্দেশ দেয়নি?

দিতে বাধ্য, না দিয়ে পারে না। কারণ তারা জানে, অনুরোধটা রানা না-ও রাখতে পারে।

তবে রানা এ-ব্যাপারে কিছু করে কিনা সেটা আগে দেখবে ওরা। যদি বোঝে রানা অন্য রকম প্ল্যান করছে বা কোনো প্ল্যানই করছে

না, তখন ওরা নিজেরা নাক গলাবে ।

কাজেই বেশি সময় নেয়া যাবে না । প্ল্যানটা এখুনি করে ফেলতে হয় । যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটাও । দেরি হয়ে গেলে লোকটাকে দাঁচানো যাবে না ।

কিন্তু ঝুঁকিটা... !

ও-সব কথা ভেবে আর লাভ কি । চোখ-কান বন্ধ করে থাকা যদি সম্ভব হতো তাহলে আলাদা কথা ছিলো । বিবেকের দংশন সহ্যেতে না পারলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে ।

খানিক পায়চারি করে আবার হাতঘড়ি দেখলো রানা । মন্দ কি, খানিকটা উত্তেজনার স্বাদ তো অন্তত পাওয়া যাবে । আর যদি সফল হয় ও, উপরি পাওনা হিসেবে আসবে বিশেষ তৃপ্তি । কাউকে নতুন জীবন দান করার সুযোগ ক'জনের ভাগ্যেই বা জোটে !

মোটেল থেকে বেরিয়ে এলো রানা । একটা বৃদ্ধ থেকে হোটেল স্যাভয়ে ফোন করলো । ম্যাট ইসটনের জন্যে একটা মেসেজ আছে —সমস্ত আয়োজন শেষ । মেসেজটা দেয়া হয়েছে দশটা চল্লিশে । তারমানে বারোটা চল্লিশে ফিফথ এভিনিউ ধরে হাঁটা শুরু করবে লিলি । খদ্দেররা তখন দলে দলে বাড়ির পথ ধরবে, আর অফিস কর্মচারীরা লাঞ্চার জন্যে বেরুবে, ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিতে ছু'জনেরই সুবিধে ।

ঠিক সময়ই লিলিকে দেখতে পেলো রানা । বারোটা ত্রিশ মিনিটে ফিফটি-সিক্সথ্ আর ফিফটি-সেভেনথ্-এর মাঝখানের একটা বুকস্টল থেকে ছু'খানা বই বগলদাবা করে বেরিয়ে এলো লিলি । দোকানের প্রোড দারোয়ান তার সুগঠিত নিতম্বের দিকে তাকিয়ে একটা ঢোক গিললো, লক্ষ্য করে পিণ্ডি জ্বলে গেল রানার । তারপরই মনে মনে

হাসলো সে । ঈর্ষা, তাই না ?

লিলি রাস্তা পেরুচ্ছে, দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একজন লোককে বুকস্টলে ঢুকতে দেখলো রানা । রাস্তা পেরিয়ে রানার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে লিলি, রাস্তার মোড় থেকে বুকস্টলের দিকে তার-পরও তাকিয়ে থাকলো রানা ।

লোকটা একটা খবরের কাগজ হাতে বেরিয়ে এলো বুকস্টল থেকে । রাস্তা পেরুচ্ছে ।

ফেউ ?

লোকটার পরনে বাদামী জ্যাকেট । পায়ে বাদামী জুতো । হ্যাটটা ব্রাউন । রানার চেয়ে ছ'ইঞ্চি খাটো হতে পারে, তবে চওড়ায় বেশি হবে । মোটাতাজা শরীর, কিন্তু সবটাই চবি নয় । লিলি যেরকম গেছে সেদিকেই হাঁটা ধরলো সে । তার পিছু নিলো রানা । চিন্তায় পড়ে গেছে ও ।

রানাকে লিলি দেখতে না পেলোও পিছনে যে ফেউ লেগেছে তা সে জানে । দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েই কোণের হলমার্ক কার্ড শপে ঢুকে পড়লো সে । শুধু চিন্তিত নয়, ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তার । এরা যে রবিনকে খুন করতে চায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সে-চেষ্টা একবার তারা করেওছে । রবিন আর তাকে একসাথে খুন করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হবে । কিন্তু রবিনকে যদি না পায়, তাহলে কি করবে ? তাহলে কি ওকে একাই মেরে রেখে যাবে ?

এ-ও জানে লিলি, জায়গামতো রবিনকে পাওয়া যাবে না । তার সামনে আসার আগে চারদিকটা ভালো করে দেখে নেবে রবিন । ফেউটাকে আবিষ্কার করে ফেলবে সে । আর ফেউ আছে বুঝতে পারলে লিলির সাথে রবিন দেখাই করবে না ।



কিন্তু সে যে বিপদের মধ্যে পড়েছে তা তো রবিন বুঝবে। তার নিরাপত্তার জন্যে কিছুই কি করবে না সে ?

আরেকটা চিন্তা লিলির মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে। ফেউটা ওর খোঁজ পেলো কিভাবে ? লোকটা আমেরিকান কোনো ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিত্ব করছে না, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। তারমানে আবার সেই গ্রু। কিন্তু ওরা তাকে ট্রেস করছে কিভাবে ? মাথার ভেতর সব গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। ও কোথায় আছে তা যাদের জানার কথা, তাদের মধ্যে বেঙ্গ্‌মান রয়েছে কেউ ?

হ্যাঁ, এ না হয়েই যায় না। এই একটাই সম্ভাবনা। কিন্তু কে হতে পারে বেঙ্গ্‌মানটা ? ওরকম একটা জায়গা বেঙ্গ্‌মান থাকা কিভাবে সম্ভব ! তাহলে তো... ! মনে মনে শিউরে উঠলো লিলি। আর কিছু ভাবতে পারছে না সে।

বেঙ্গ্‌মানটা যাতে বেঙ্গ্‌মানী করতে না পারে সে উপায় তার সাথেই আছে। কিন্তু এখন এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি ?

দোকানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লিলি দেখলো, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়েছে ফেউ, সিগারেট ধরাচ্ছে। আরো পাঁচ মিনিট দোকানের ভেতর ঘুরঘুর করলো সে, তারপর বেরিয়ে এলো। বারোটা উনচল্লিশ মিনিটে ফিফথ্ এভিনিউ পেরিয়ে পূর্ব দিকে চলে এলো।

ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ফেউ খসাবার চেষ্টা করলো লিলি। বার কয়েক সরু গলিতে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে এলো মেইন রোডে। ছ'বার মনে হলো, খসানো গেছে। কিন্তু তারপরই আবার দেখতে পেলো লোকটাকে। এরপর আর সরু গলিতে ঢুকতে সাহস পেলো না। গলিতে লোকজন কম,

আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি। মনে মনে ঠিক করলো, নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোবে সে। যথাসময়ে র'দেভো-তে পৌঁছুতে চেষ্টা করবে। বাকিটুকু নির্ভর করুক রবিনের ওপর।

এয়ার ফ্রান্স অফিসে ঢুকলো লিলি, আগামী দু'দিনের ফ্লাইট শিডিউল কিনলো একটা, অকারণে। ক্যাথেড্রালটা দূর থেকে দেখা গেল। দু'মিনিট পর সেটাকে পাশ কাটিয়ে এগোলো সে, একটা পারফিউমের দোকানে ঢুকে নতুন একটা সেট কিনলো। একটা পাঁচে ফিরে এসে সেট প্যাট্রিক-এ ঢুকলো। আদর্শ একজন ক্যাথলিকের মতো এক হাঁটু ভাঁজ করে কয়েক মিনিট প্রার্থনা করলো, যদিও আদর্শ নারী বা ক্যাথলিক কোনোটাই সে নয়।

একটা পনেরো মিনিটে ঝাঁঝালো রোদে আবার বেরিয়ে এলো লিলি। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কসরত করে এগোতে হলো। এক লোকের সাথে ধাক্কা লাগায় ঝাঁকি খেলো সে, বগলের নিচে থেকে পড়ে গেল বইগুলো। হাঁটু ভাঁজ করে উবু হলো, বইগুলো তোলার সময় চারদিকে তাকালো ভালো করে। ফেউ মনে হলো একজনই।

রোড লেভেল থেকে অনেকটা নিচে স্কেটিং রিঙ, চারপাশে রঙিন ছাতা মেলে গ্রীষ্মকালীন রেস্টোর'। চালু করা হয়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে, ইচ্ছে হলো একটা ছাতার নিচে বসে ঠাণ্ডা কিছু খায়। কিন্তু না, নিজেকে স্থির টার্গেট বানানো উচিত হবে না। হাঁটতে হাঁটতে রকফেলার প্লাজা-কে পাশ কাটালো। আঠার মতো লেগে আছে ফেউ। এন. বি. সি. স্টুডিওর লবিতে ট্যুরিস্টদের ভিড়।

দক্ষিণের গেট দিয়ে আবার রাস্তায় বেরুলো লিলি। ফিফটি-নাইনথ্ স্ট্রীট। জুয়েলারীর দোকানগুলোকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিম

দিকে হাঁটছে। সেভেনথ এভিনিউয়ে সস্তাদরের অনেকগুলো হোটেল-রেস্তোরী, ফুটপাথে কলগার্লদের আড্ডাখানা। রেস্তোরী-গুলোর সাইনবোর্ডে রঙচঙে অক্ষরে লেখা রয়েছে, টপলেস। মেট্রোপোলে ঢুকলো লিলি। থ্রু-পীস ব্যাণ্ডে রক মিউজিক বাজছে। লম্বা বারে বসে আছে দশ-বারো জন লোক। ড্যান্সিং ফ্লোরে ছোটো মেয়ে নাচছে, দম দেয়া পুতুলের মতো যান্ত্রিক লাগলো। স্বর্ণকেশীর বয়স হবে বিশ, সোনালি বিকিনি প্যাণ্টি পরে আছে, সাথে ম্যাচ করা জুতো। আরেকজনের বয়স ছ'চার বছর বেশি হবে, নিগ্রো। ছ'জনেই অকারণে হাসছে, এবং টপলেস।

বারের কোথাও রানাকে দেখলো না লিলি

লিলিকে নয়, ফেউটাকে অনুসরণ করছে রানা। লিলির ওপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছে ও। ভেবেছিল, কোনো না কোনো ভাবে ফেউটাকে লিলি খসাতে পারবে, কিন্তু ওর আশা পূরণ হয়নি। লিলি অবশ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু তেমন দক্ষতার সাথে নয়।

লিলি মেট্রোপোলে ঢোকার পর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো রানা। যা করার ওকেই করতে হবে।

মেট্রোপোলের সামনে তেকোণা আকৃতির ক্ষুদে একটা রেলিং ঘেরা পার্ক, রেলিঙে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে লোকটা। পার্ক না বলে আইল্যান্ড বলাই ভালো, রাস্তা পেরোবার জন্যে বহু লোক ওটার ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। ভেতরে ঢুকে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো রানা, জ্যাকেটের বোতাম আগেই খুলে ফেলেছে। আইল্যান্ড আর ছ'পাশের ফুটপাথে প্রচুর লোকজন, বিভিন্নমুখী শ্রোতের মতো মিছিল করে ছুটে চলেছে মানুষ। এখানে গোলাগুলি হলে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে। একেবারে বাধ্য না

হলে পিস্তল বের করার ইচ্ছে নেই রানার ।

শাস্তভাবে রেলিঙের দিকে এগোলো ও ।

রেলিঙে হেলান দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা । অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেট্রোপোলের দরজার দিকে ।

তার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা । নিজের ঠোঁটে একটা সিগারেট রয়েছে, কিন্তু এখনো ধরায়নি । আরো একটা সিগারেট রয়েছে হাতে । লোকটার কাঁধে মৃদু টোকা দিলো রানা ।

অদ্ভুত কাণ্ড ! লোকটা ওর দিকে তাকালোই না । বললো, ‘হ্যাঁ কি ব্যাপার ?’

‘সিগারেট ।’ হাত লম্বা করে দিয়ে লোকটার মুখের সামনে সিগারেটটা ধরলো রানা ।

আড়ষ্ট হয়ে গেল লোকটার পেশী । ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালো সে । কঠিন একটা অবয়ব দেখলো সে । অপরিচিত ।

‘পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,’ চাপা গলায় বললো রানা । কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু গর্বের রেশ নিজের কানেও ধরা পড়লো ।

‘কি চাই ?’ নিলিপ্ত ভঙ্গিতে জানতে চাইলো লোকটা, কথার সুরে বিদেশী টান স্পষ্ট ।

‘তোমার সঙ্গ,’ বললো রানা । লোকটার ঠোঁটের সামনে সিগারেট ধরলো ও । ‘এটা ধরিয়ে আমার আগে আগে হাঁটো ।’ জ্যাকেট একটু ফাঁক করে ভেতরের পিস্তলটা দেখালো তাকে । ‘কোনো রকম চালাকি করলে বিপদে পড়বে ।’

ঠিক এই সময় মেট্রোপোল থেকে বেরিয়ে এলো লিলি ।

‘পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,’ রানার কথাটাই পুনরাবৃত্তি

করলো লোকটা, অনেকটা যেন ক্লেভের সাথে ।

সেই মুহূর্তে রানার চোখের কোণে ধরা পড়লো, হাতের বইগুলো ওদের মাথার দিকে ছুঁড়ে মারছে লিলি । কি বোকামি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করলো রানার । ঝট করে নিচু হলো ও, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি হলো ।

ছুটো আওয়াজ—পিস্তলের ঢব্, আর অশ্রুট গোঙানি ।

নিচু হয়েই বিদ্যাবেগে একপাশে ডাইভ দিলো রানা । পিছন থেকে আরেকটা গুলি হলো । প্রথম ফেউটার কি অবস্থা হয়েছে দেখার সময় নেই, ডাইভ দিয়ে ঘাসের ওপর পড়েই কোমর থেকে পিস্তল বের করে পিছন দিকে তাকালো ও । আইল্যান্ডের উল্টো-দিকের রেলিং টপকে পালাচ্ছে দ্বিতীয় ফেউ । ট্রিগার টিপতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো রানা । লোকজন ছুটোছুটি করছে, কার না কার গায়ে লাগবে ।

উদভ্রান্তের মতো রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেল লিলি । ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো সে । একস্মাৎ ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠলো চারদিক থেকে । ছুটো গাড়ির মাঝখানে দুই ফিটের মতো ফাঁক, সেই ফাঁকে পাখুরে স্যাণ্ড-উইচ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিলি । উঠে দাঁড়িয়ে এক লাফে রেলিং টপকালো রানা, ফুটপাথে নামার আগে প্রথম ফেউটাকে দেখতে পেলো । চিৎ হয়ে পড়ে আছে, বাম বুকে রক্তাক্ত ফুটো নিয়ে ।

হর্নের বিকট আওয়াজ, হৈ-চৈ, ছুটোছুটি—সব অগ্রাহ্য করে লিলির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রানা । তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুটলো । অস্পষ্টভাবে কানে এলো সাইরেনের ওঁয়া-ওঁয়া আওয়াজ । ফুটপাথে না উঠে রাস্তার কিনারা ধরে ছুটছে ওরা । ভিড়ের

মধ্যে সবাই সাহসী নয়, কেউ কেউ সাহসী—ওরা পালাচ্ছে ধরে নিয়ে তাদের দু'একজন পথরোধ করে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। পিস্তল বের করার ভঙ্গি করে তাদের হটিয়ে দিলো রানা। পাঁচ মিনিট পর অকুস্থল থেকে অনেকটা দূরে সরে এলো ওরা, কেউ ওদের পিছু নেয়নি। রানাকে প্রায় শান্তই বলা যায়, কিন্তু লিলি হাঁপাচ্ছে। খালি একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুললো রানা।

ছোটোখাটো এক ইটালিয়ান রেস্টোরাঁয় লাঞ্চ খেলো ওরা। ট্যাক্সি করে বিশ মাইল পেরোবার সময় কেউ কোনো কথা বলেনি। কেবিনে কফি দিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়েটার, সিগারেট ধরিয়ে রানা বললো, 'তোমাকে বই ছুঁতে না দেখলে আমি কুঁকতাম না।' লিলি ফেউটাকে খসাতে পারেনি, সেজন্যে তাকে তিরস্কার করার ইচ্ছে রানার নেই। সে নিজে আরো মারাত্মক ভুল করেছে। প্রথম লোকটাকে যে দ্বিতীয় কোনো লোক কাভার দিতে পারে, এ-কথা একবারও তার মনে হয়নি। অথচ মনে হওয়া উচিত ছিলো। ভুল শুধু এখানেই নয়, আরো দু'জায়গায় করেছে রানা। কাঁধে ওর স্পর্শ পেয়ে লোকটা ঘাড় ফেরায়নি, কারণটা সাথে সাথে বুঝতে পারা উচিত ছিলো ওর। লোকটা রানাকে তার সঙ্গী বলে মনে করেছিল। তৃতীয় ভুলটা করার সাথে সাথে রানা যদি সেটা ধরতেও পারতো, লিলি বই ছোঁড়ার পর ও যাকরেছে তার বেশি কিছু করতে পারতো না। 'পিছনেও একটা চোখ রাখতে হয়,' রানার এই কথাটা পুনরাবৃত্তি করে লোকটা আসলে তাকে বিদ্রূপ করেছে, শোনা মাত্র অন্তর্নিহিত অর্থটা রানার বুঝে নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বুঝতে পারেনি। 'ছুটো বই, তাই না? কি নিয়ে লেখা?'

জোর করে একটু হাসলো লিলি। ‘জেনে কাজ কি। বোঝা গেল, বইয়ের সাহায্য নেয়া আমাদের কপালে নেই।’

‘আহা, বলোই না...।’

‘রন্ধন প্রণালী শিক্ষা, আর ঘর সাজাবার দশটি উপায়,’ ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে বললো লিলি। ‘সন্তুষ্ট?’

কাঁধ ঝাঁকালো রানা।

কফি শেষ করে সরাসরি রানার দিকে তাকালো লিলি, থমথম করছে চেহারা। ‘তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?’

‘বুঝতেই পারছি কি ঘটেছে,’ শান্তভাবে বললো রানা। আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করছে না, কারণ সঠিক উত্তর লিলিরও বোধহয় জানা নেই। ‘টিঠি দিয়ে আসার সময় বা টাকা সংগ্রহের সময় ওদের চোখে ধরা পড়ে যাও তুমি, সেই থেকে ওরা তোমাকে ফলো করছিলো।’

‘ওরা...?’

‘সম্ভবত গ্রু।’

‘তারমানে আবারো সেই কথা বলতে চাইছো, রেসিডেন্টের দলে গ্রু-র চর আছে?’

‘কিংবা স্ট্যালিনপন্থী কে. জি. বি. এজেন্ট,’ বললো রানা।

হ্লান চেহারা নিয়ে বসে থাকলো লিলি।

অন্য প্রসঙ্গ তুললো রানা। ‘আমরা উইচিটা যাচ্ছি।’

ঝট করে মুখ তুললো লিলি, চোখে প্রশ্ন।

‘মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে,’ বললো রানা, আর কিছু ব্যাখ্যা করলো না।

বাধ্য মেয়ের মতো লিলিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বললো,

‘টাকাগুলো এনেছি ।’ হাতব্যাগ খুলে ভেতর থেকে কয়েকটা বাঙল বের করলো সে ।

টাকাগুলো গুললো রানা । ‘কোনো সমস্যা হয়নি তো ?’

মাথা নাড়লো লিলি

‘তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি ?’

‘হয়েছে । তবে আমি কোনো উত্তর রেখে আসিনি ।’

টেবিলের ওপর লিলির হাতে হাত রাখলো রানা, মৃদু একটু চাপ দিলো । ‘চলো, মোটেলে ফিরি ।’

টেবিলের ওপর দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকলো লিলি । ‘আমাকে একটা চুমো খাও ।’

দু’মিনিট পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্টোরঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিলো ওরা । দু’জন দু’জনকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকলো সিটে । মোটেলে ফিরে আবার লিলিকে আলিঙ্গন করলো রানা । ‘ধন্যবাদ, লিলি । অসংখ্য ধন্যবাদ ।’

‘কি ব্যাপার ?’ আকাশ থেকে পড়লো লিলি । ‘হঠাৎ ?’

‘দেখছো না এখনো আমি বহাল তব্বিয়তে বেঁচে রয়েছি !’

‘ও, এই কথা !’ লিলির চোখে ছুঁটামির ঝিলিক । ‘কিন্তু শুধু ধন্যবাদে আমি সন্তুষ্ট নই । সত্যি যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাও, আরো সলিড কিছু দিতে হবে আমাকে ।’

‘আমি প্রস্তুত । বলো কি চাও ?’

‘কি চাই সেটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে ।’ দু’হাত দিয়ে রানার বুকে মৃদু ধাক্কা দিলো লিলি । তারপর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লো নরম বিছানায় ।

ঋণ শোধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো রানা ।



# তেরো

---

চিত্ত হরণ করে এমন অনেক কিছুই দেখার আছে উইচিটায়। মিস্টার আর মিসেস রবিনের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সময়ের অভাবে কিছুই তাদের দেখা হলো না। টি. ডব্লিউ. এ. জেট উইচিটা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার আধ ঘণ্টা পর কে. জি. বি. টিম ভাড়া করা একটা গাড়িতে চেপে লিভেনওয়ার্থের দিকে রওনা হয়ে গেল।

উত্তর-পূর্ব দিকে ছুটলো গাড়ি। পথে তেমন কিছু ঘটলো না। যাত্রাটা একঘেয়ে বলা যেতে পারে। জানালা খোলা বলে কেউ ঘামছে না, তবে আগুনের হলকার মতো গরম বাতাসে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া।

উইচিটা থেকে আশি মাইল দূরে এসে লিলি জানতে চাইলো, ‘প্লেনে আমরা টোপেকা পর্যন্ত গেলেই পারতাম।’

রেডিও অন করে প্রিয় কোনো গান হচ্ছে কিনা দেখলো রানা।

‘লিভেনওয়ার্থের অনেক কাছে হতো টোপেকা,’ আবার বললো লিলি।

‘নিউ ইয়র্ক থেকে ডাইরেক্ট এয়ার সাভিস নেই,’ রেডিও বন্ধ করে ব্যাখ্যা করলো রানা। ‘আর তাছাড়া, কেন যেন মনে হলো, পশ্চিম দিক থেকে ঢুকলে একটু বেশি নিরাপদ থাকবো।’

‘আবার তুমি বিপদের আশংকা করছো?’

‘জিঙ্কেস করো, কোন সময়টায় করছি না!’

গম্ভীর হয়ে গেল লিলি। তার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিলো রানা। ‘বিপদ আসে আশুক, সাধ্য মতো সতর্ক আছি আমরা। আর এই মুহূর্তে অজানা বিপদের কথা ভাবছিও না আমি।’

‘মানে?’ শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল লিলির, তারপর আবার সিটে হেলান দিলো সে। ‘ছঃখিত, ভুলে গিয়েছিলাম কিছু জানতে চাওয়ার অধিকার আমার নেই।’

‘তোমাকে তো বলেছি, মস্কো থেকে নির্দেশ এসেছে। আর দেখতেই পাচ্ছে কোন্ দিকে যাচ্ছি আমরা। তারপরও বুঝতে পারছো না বিপদে ঝাপ দিতে যাচ্ছি?’

‘ছঃখিত,’ বলে রানার উরুতে একটা হাত রাখলো লিলি। ‘জানি, তোমার মানসিক অবস্থা ভালো নয়। মানুষ হয়ে আরেকজন মানুষকে ছনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া—কি যে যন্ত্রণাকর, বুঝি।’

‘খেয়ে নেয়া যাক, কি বলো?’ অগ্র প্রসঙ্গে চলে গেল রানা।

একটা রোডসাইড ডাইনারে থামলো ওরা, টয়লেট ব্যবহার করার সুবিধে আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলো লিভেন-ওয়ার্থের মুডি হোটেলে। চুরাশিটা কামরা নিয়ে পাঁচতালা হোটেল, ম্যানেজার একজন প্রাক্তন কর্নেল, যুক্তিসঙ্গত ভাড়া। বিছানার চাদর পরিষ্কার পেলো ওরা, এয়ারকন্ডিশনিং ঠিকমতো কাজ করে।

ডাবল রুমের ভাড়া পঁচিশ ডলার, ইউরোপিয়ান স্টাইলে সাজানো।  
বিছানার ওপর ভাঁজ করা একটা কাগজ পাওয়া গেল—আজকের  
লিভেনওয়ার্থ টাইমস। স্যুটকেস খুলে জিনিস-পত্র বের করতে শুরু  
করলো ওরা।

‘হোম, হোম অন দি রেঞ্জ,’ ওয়ারড্রোবে রেজার ঝোলাবার সময়  
মুহূ গলায় গেয়ে উঠলো রানা।

‘দ্যাটস দ্য স্টেটস সং,’ মন্তব্য করলো লিলি।

‘আর জাতীয় ফুল?’

‘সানফ্লাওয়ার। জাতীয় পাখি?’

‘ওয়েস্টার্ন মেডো লার্ক।’

‘তোমাকে নিয়ে কে. জি. বি.-র গর্ব করা উচিত, রবিন,’ বললো  
লিলি। ‘হোম ওয়ার্কে একটুও ফাঁকি দাওনি।’

‘কিন্তু,’ অসহায় ভঙ্গিতে বললো রানা, ‘ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ  
সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। সাহায্য করতে পারবে?’

মাথা নাড়লো লিলি। ‘শুধু এইটুকু বলতে পারি, পা ফেলতে  
একটু ভুল করলেই তুমি জানতে পারবে ওরা তোমার জন্যে ওখান-  
কার মর্গে আগে থেকেই জায়গা খালি রেখেছে।’

‘বলো, আমাদের জন্মে। তবে ছশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার।  
যদি দেখি নিরাপদে বেরিয়ে আসার শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা  
আছে তবেই তোমাকে সাথে নেবো।’

‘তা না হলে তুমি একা যাবে?’ কাপড় পাল্টাচ্ছিল লিলি, হাত  
ছোটো ব্লাউজের বোতামের কাছে স্থির হয়ে গেল। ‘ও-সব চিন্তা  
বাদ দাও। তোমাকে আমি একা যেতে দেবো না।’

‘ঠিক আছে, দিয়ে না। কিন্তু এখন দয়া করে ঘর থেকে বোতাম-

গুলোকে বেরুতে দাও ।’

চট করে আধ খোলা ব্লাউজের দিকে একবার তাকালো লিলি ।  
লজ্জা পেয়ে রানার দিকে পিছন ফিরলো । ‘চোখের শরম বলতে কি  
কিছুই নেই ?’

অন্ধকার ঘরে বিছানায় পাশাপাশি গুলো ওরা, গায়ে চাদর ।

‘আমার প্ল্যানটার কথা তোমাকে বলেছি ?’ জিজ্ঞেস করলো  
রানা ।

‘তোমার যে একটা প্ল্যান আছে তাই তো আমার জানা ছিলো  
না ।’

‘হানি, প্ল্যানের কোনো অভাব নেই আমার । সমস্যা হলো  
বাছাই করা ।’ প্ল্যানটা কি, তা কিন্তু রানা ব্যাখ্যা করলো না ।

‘সিদ্ধান্ত তাহলে পাণ্টাচ্ছে না ?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি ।  
‘লোকটাকে না মেরে... ।’

‘যায়, পারা যায় ।’

‘তুমি কি তাহলে... ?’

‘হ্যাঁ, ওখান থেকে ওকে বের করে আনতে চাই ।’

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো লিলি, ‘কিন্তু কিভাবে ?’

‘কাল বলতে পারবো ।’ এখানেই আলোচনার ইতি টানলো  
রানা ।

পরদিন সকালে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স নিয়ে একা বেরিয়ে গেল  
ও । সন্ধ্যা ছটায় ফিরলো, বগলের তলায় তখনো কার্ডবোর্ডের  
বাক্সটা রয়েছে । নিউ ইয়র্ক থেকে একই রকম ছোটো বাক্স নিয়ে  
এসেছে ও ।

‘আজ্ঞেবাজে কতো কি ভাবছিলাম,’ অভিযোগ করলো লিলি,

‘দৃশ্চিন্তায় আমার মাথা ধরে গেছে ।’

তার কাঁধ চাপড়ে দিলো রানা । ‘প্ল্যানটা ফাইনাল করে ফেলেছি । তোমারও গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে ।’ ইশারায় কার্ডবোর্ড বাক্সটা দেখালো ও । ‘নিউ ইয়র্কের একটা কন্সটিউম আউট-ফিট থেকে ইউনিফর্মটা কিনেছিলাম, লেফটেন্যান্টের । কাজে লেগে গেল ।’

‘কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ।’

‘সারাটা দিন ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ হাসপাতালে কাটিয়েছি,’ বললো রানা । ‘কিভাবে ভেতরে ঢুকেছি শুনবে ? ট্যাক্সি নিয়ে ওদিকে যাবার পথে দেখলাম রাস্তার ধারে একটা বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে লেখা—লিভেনওয়ার্থ আমি হাসপিটাল, স্টাফ বাস । ট্যাক্সি একটু দূরে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম, বুক ফুলিয়ে উঠে বসলাম বাসে ।’

তিন সেকেন্ডেও ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো লিলি, যেন রানার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না । ‘তারপর ? গেটে কেউ তোমাকে আটকালো না ? পাস দেখতে চাইলো না ?’

বিরক্ত হলো রানা । ‘কেন আটকাবে না ! পাস দেখাতেই ছেড়ে দিলো, সবার সাথে ভেতরে ঢুকে গেলাম ।’

‘পাস তুমি পেলে কোথায় ?’

‘ধরে নাও কুড়িয়ে পেয়েছি,’ মুচকি হেসে বললো রানা । ওকে সাহায্য করেছে ভিনসেন্ট গগল, কিন্তু তার পরিচয় লিলির কাছে গোপন রাখতে চায় রানা ।

চেহারায় আহত একটা ভাব নিয়ে চুপ করে থাকলো লিলি ।

‘ভেতরে ঢুকে কি দেখলাম শোনো,’ উৎসাহের সাথে আবার শুরু করলো রানা । ‘তার আগে গেটের অবস্থাটা ব্যাখ্যা করি । ভারি

কড়াকড়ি, বুঝলে। একটা পিঁপড়ে গলার উপায় নেই। কিন্তু জানোই তো, মিলিটারীদের আপার চেশ্বার বেশিরভাগ খালিই থাকে। কুকুরের প্রভুভক্তির সাথে ওদের প্রভুভক্তির আশ্চর্য মিল। ভেবোনা সৈনিকদের ছুঁনাম করছি। তা আমি করতে পারি না, কারণ সেনাবাহিনীতে আমিও ছিলাম।’ রানা জানে, তথ্যটা মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করেছে লিলি। ‘যা বলছিলাম। গেটে ওরা যারা রয়েছে, নিজেদের মাথা একদম খাটাতে পারে না। অনেকটা যন্ত্রের মতো, চাবি দিলে ঘোরে। আধ ঘণ্টা লাগলে সবার পাস চেক করতে, এই আধ ঘণ্টায় কম করেও বিশ বার টেলিফোন করলো ওরা। কারো পাস রিনিউ করা হয়নি, কারো পাসের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কেউ বলছে সাথে পাস আনতে ভুলে গেছে কিন্তু গার্ডরা তো তাকে চেনেই, এ ধরনের একটা সমস্যাও ওরা নিজেরা সমাধান করতে পারলো না। সংশ্লিষ্ট কর্তাকে টেলিফোন করে তারপর সিদ্ধান্ত নিলো।’

‘থারাপ কি? ওরা বরং একটু বেশি সতর্ক।’

‘আর ওদের এই সতর্কতা লক্ষ্য করেই আমার মাথায় একটা বুদ্ধি গজালো,’ বললো রানা। বিছানার তলায় তাকালো ও। দ্বিতীয় কার্ডবোর্ডের বাক্সটা রয়েছে ওখানে। ‘ওটায় তোমার জন্যে একটা ইউনিফর্ম আছে। নার্সের ভূমিকা নিচ্ছে। তুমি।’

‘কি করতে হবে আমাকে?’

‘এখনই শুনতে চেয়ো না,’ কাপড় ছাড়তে শুরু করে বললো রানা। ‘সময় মতো বলবো। আর কি দেখলাম শোনো।’ বিছানায় বসে সিগারেট ধরালো রানা।

‘কোথায় রাখা হয়েছে তাকে?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘তিনতলায় ।’ রানা গম্ভীর । ‘করিডরের মাথায় দু’জন মিলিটারী পুলিশ । ছশো এগারো নম্বর কেবিনে রাখা হয়েছে তাকে । কেবিনের বাইরে একজন মিলিটারী পুলিশ, আর সাদা কাপড়ে দু’জন এফ. বি. আই. এজেন্ট—আমার ধারণা ওরা এফ. বি. আই. ; সি. আই. এ. হলে গেছি ।’ চিন্তিত দেখালো রানাকে ।

‘সি. আই. এ. হলে অসুবিধে কি ?’

‘ওরা যদি এফ. বি. আই. হয় তাহলে মনে করতে হবে লোকটাকে ওরা পাগল-ছাগল বা কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য বলে ধরে নিয়েছে । আর যদি সি. আই. এ. হয়, তাহলে মনে করতে হবে আসল বিপদ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে ওরা ।’ ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে ঝুঁকলো রানা, জুতো-মোজা খুলতে শুরু করলো । ঘেমে গোসল হয়ে গেছে ও ।

রেফ্রিজারেটর থেকে বিয়ারের দুটো ক্যান বের করলো লিলি । একটা নিয়ে ট্রাক ড্রাইভারদের মতো ক্যান থেকে গলায় ঢাললো রানা । ‘ধন্যবাদ, ডারলিং ।’

‘ওরা সম্ভবত এফ. বি. আই.-ই, রবিন ।’

‘হলে তো ভালোই,’ বললো রানা । ‘কেবিনের ভেতরও ঢুকে পড়েছিলাম, বুঝলে । সকল প্রশংসা ইউনিফর্মের । অবশ্য সাত সেকেন্ডের বেশি ভেতরে থাকতে পারিনি । সব কিছু দেখে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট সময়, কি বলো ?’

‘কি কি দেখলে ?’

‘অক্সিজেন ইকুইপমেন্ট, ডীপ ফ্রিজ, চাকা লাগানো ট্রে-তে গাদা গাদা ওষুধের বাক্স, ছয়জন লোক, একজন নার্স—তোমার চেয়ে সুন্দরী নয় ।’

‘আমি রোগীর কথা জানতে চাইছি ।’

‘চোখ বন্ধ, হুঁশ নেই বেচারার—যখন তখন অবস্থা ।’

‘প্ল্যানটা কি বলবে আমাকে ?’ রানার পাশে বিছানায় বসলো লিলি ।

‘যদি প্রয়োজন বোধ করি ।’

‘সব দেখে তোমার মনে হয়েছে, লোকটাকে বের করে আনা সম্ভব ?’

‘সম্ভব ।’

‘আজ রাতে ?’

মাথা নাড়লো রানা । ‘রাতেই তো বিপদের আশংকায় থাকবে । কালও নয়, কিছু কাজ এখনো বাকি আছে । পরশু কিংবা তার পর দিন—দিনে-দুপুরে । করিডরে অনেক লোকজন আসা-যাওয়া করবে । আজ লাঞ্চের সময় দেখলাম, কেবিন থেকে প্রায় সবাই বেরিয়ে এলো ।’

‘কিন্তু আমার তো মাথায় ঢুকছে না, জ্বলজ্বালন্ত একটা মানুষকে কিভাবে তুমি ওখান থেকে বের করে আনবে ! এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন ছেলের হাতের মোয়া । আমার তো মনে হচ্ছে তুমি আত্মহত্যা করতে চাইছো !’ বিছানা ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো সে ।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ লিলির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা । তারপর হেসে ফেলে বললো, ‘আচ্ছা, সত্যি যদি তাই হয় ? যদি জানো আজ রাতটাই আমার জীবনের শেষ রাত ? কি করবে তুমি, লিলি ?’

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো লিলি । ‘এ-ধরনের একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো কিভাবে !’



‘শালা, কথা আর বলো না, সে-ই তো এ-সব শিখিয়েছে আমাকে ।’

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো লিলি । ‘প্রলাপ বকছে নাকি ?’

‘আরে না !’ হাসলো রানা । ‘মাসুদ রানার নাম শুনেছো ? শালা আমার বন্ধু । ব্যাটাকে দেখেছি, বিপদে নাক গলাবার আগে মহা ফুঁটিতে মেতে থাকে—নামকরা হোটেল গিয়ে দামী ডিনার খায়, সুন্দরী মেয়ের সাথে নাচে, তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরার সময় সাথে করে নিয়ে আসে ঠিক তোমার মতো একটা লাল টুকটুকে... ।’

লিলি কি যেন একটা ছুঁড়ে মারছে দেখে থেমে গেল রানা, ঝট করে এক পাশে সরিয়ে দিলো মাথাটা । দেয়ালে লেগে বিছানায় পড়লো খালি বিয়ারের ক্যান ।

কাঁধ ঝাঁকালো রানা । ‘নারী চরিত্র বড়ই রহস্যময় । কেউ বিশ্বাস করবে বই ছুঁড়ে কাল তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো ?’

আকস্মাৎ ছুটে এসে রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো লিলি । ‘তোমার কোনো কথাই আমি শুনবো না । প্ল্যানটা আজ রাতেই আমাকে বলতে হবে । রবিন, প্লিজ ।’

লিলিকে ছুঁহাতে ধরে বিছানায় বসালো রানা । ‘ঠিক আছে, আজ রাতেই । কিন্তু কথা দাও যতোটুকু বলবো তার বেশি জানতে চাইবে না । যেটুকু বলবো না সেটুকু তোমার জানার দরকার নেই বলেই বলবো না ।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে লিলি বললো, ‘বেশ, চাইবো না । কিন্তু প্ল্যানটায় যদি কোনো খুঁত দেখি, সংশোধনী আনতে পারবো তো ?’

‘তা পারবে।’

‘এখন তাহলে আমরা কি করবো?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘ফুতি,’ বলে বিছানা ছাড়লো রানা। ‘শাওয়ার সেরে ডিনার খেতে যাবো—কোথায় জানো? হিলটনে। তারপর নাচবো ড্রিম-ল্যাণ্ডে। সবশেষে...।’

‘থাক, থাক—সব যদি বলেই ফেলো তাহলে আর থাকলো কি!’

দু’দিন পর সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হলো অপারেশন।

নার্সের ইউনিফর্ম পরে নিদিষ্ট একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলো লিলি। তার আগে আরো তিনজন পৌঁচেছে ওখানে—একজন ডক্টর-কর্নেল, একজন মেজর, অপরজন লেফটেন্যান্ট-নার্স। সাথে রানার দেয়া কাগজ-পত্র থাকলেও, লেফটেন্যান্ট-নার্সকে দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো লিলি। মেয়েলি কৌতূহল কি জিনিস তার জানা আছে, বাস আসতে দেরি হলে নির্ঘাৎ গল্প জমাবার চেষ্টা করবে মেয়েটা। আগে তোমাকে দেখিনি কেন, কোন্ ডিপার্টমেন্টে আছো, কোন্ ডাক্তারের আওতায় ডিউটি কারো—এ-সব প্রশ্নের কি উত্তর হবে তা তার জানা আছে, কিন্তু যদি না মেলে? দেখতে দেখতে দু’একজন করে আরো দশ-বারোজন স্টাফ এসে পৌঁছুলো।

লিলির ভাগ্য ভালো লেফটেন্যান্ট-নার্স ওর সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, ওর দিকে ভালো করে তাকালো না পর্যন্ত। তার মনের অবস্থা লিলি যদি জানতে পারে, নির্ঘাৎ জ্ঞান হারাবে।

লেফটেন্যান্ট-নার্সের বদলে মেজর লোকটা কৌতূহলী হয়ে উঠলো। পাশে সরে এসে হাসলো সে, সকাল বেলায় স্নিগ্ধ

আবহাওয়ার প্রশংসা দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালো। তবে লিলি ঘামতে শুরু করার আগেই স্টাফ বাস এসে পড়লো, মেজরের পিছনে লাইন দিলো সে। বাসে উঠে প্রথমে দেখে নিলো মেজর কোথায় বসেছে, তারপর তার কাছ থেকে দূরে একটা সিটে বসলো। লেফটেন্যান্ট নার্স বসেছে সবার পিছনে।

হাসপাতালের গেটে স্টাফ বাস থামলো না, থামলো উঠনের এক প্রান্তে। কিন্তু আরোহীরা নামার সময় সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের সবার পাস এবং আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করলো। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় সম্পূর্ণ শান্ত থাকলো লিলি। রবিনের ওপর আস্থা আছে তার, জানে পাস আর আইডেনটিটি কার্ড যেখান থেকেই যোগাড় করে থাকুক, ওগুলোয় কোনো খুঁত নেই।

লেফটেন্যান্ট-নার্সের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে লিলি।

‘আপনাকে একটু গেট-হাউসে অপেক্ষা করতে হবে, ম্যাডাম,’ লেফটেন্যান্টকে বললো একজন গার্ড।

‘সেকি! কেন?’ যেন আকাশ থেকে পড়লো নার্স মেয়েটা।

‘আপনার আইডেনটিটি কার্ড ঠিক আছে, কিন্তু গেট পাসের মেয়াদ পার হয়ে গেছে কাল...।’

গার্ডদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সার্জেন্ট, তার দিকে তাকিয়ে লিলি বললো, ‘জানেনই তো আমরা কি রকম ব্যস্ত থাকি। এ-ধরনের সামান্য ভুল-ভালের জন্যে আপনারা যদি...।’

লিলির কথা শেষ হলো না, দাঁত গের করে হাসলো সার্জেন্ট।

‘ও, আপনার গেট পাসের মেয়াদও বুঝি পার হয়ে গেছে?’

ব্যস্তভাবে নিজের গेट পাসের ভাঁজ খুলে দেখলো লিলি। হেসে উঠলো সে। ‘উহু’, আরো দু’দিন বাকি আছে, সার্জেন্ট।’

‘ঠিক আছে, লেফটেন্যান্টকে যেতে দাও,’ গার্ডদের হুকুম করলো সার্জেন্ট, তারপর লেফটেন্যান্টের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললো, ‘কাল যেন সাথে নতুন পাস থাকে।’

এরপর লিলির পাল্লা। কাগজগুলো গার্ডের হাতে দিয়ে লেফটেন্যান্ট-নার্সের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো সে। কেমন মেয়ে রে বাবা! ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিলাম, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলো না!

কাগজগুলো গিলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হাত-ইশারায় তাকে সামনে এগোতে বললো গার্ড।

হাসপাতাল ভবনে ঢুকে বেশ স্বচ্ছন্দে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো লিলি। কাল রাতে রানা তাকে বিল্ডিংটার লে-আউট দেখিয়েছে, মনে গাঁথা আছে সব, কাজেই বিপজ্জনক এলাকাগুলো এড়িয়ে থাকা কঠিন হলো না। কিন্তু সমস্যা হলো সময় কাটানো নিয়ে। কোথাও বসে থাকা চলবে না, তাহলে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আবার একই করিডর ধরে বারবার আসা-যাওয়া করাও ঠিক হবে না। অথচ বেলা দেড়টার আগে ওর কোনো কাজ নেই।

পুরো হাসপাতালটা, প্রথম থেকে চার তাল্য পর্যন্ত, একবার ঘুরে এলো লিলি। একটা ব্যাপারে একটু খটকা লাগলো। সেই মেয়েটা, লেফটেন্যান্ট নার্স, তারও কি কোনো কাজ নেই? একবার দোতালায়, আরেকবার চারতাল্যে সামনাসামনি হলো ওরা। ওকে দেখে কেমন যেন বিব্রত বোধ করলো মেয়েটা, তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আবার নিচতালায় নেমে এলো লিলি। সময়ের আগে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের দিকে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তাকে। তবু আবার একবার তিনতালায় উঠলো সে। করিডরের মাথায় দু'জন মিলিটারী পুলিশ কাঠের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরো একজন মিলিটারী পুলিশ, আর দু'জন সাদা পোশাক পরা সিকিউরিটি অফিসার। রবিনের সন্দেহ ওরা এফ. বি. আই. এজেন্ট না-ও হতে পারে।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ত্রস্ত পায়ে করিডর পেরিয়ে আরেক সিঁড়ির দিকে এগোলো সে।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসে টয়লেটে ঢুকলো লিলি। কিন্তু টয়লেটে আর কতোক্ষণ বসে থাকা যায়। দশটা দশে করিডরে বেরিয়ে এসে দরজার দিকে এগোলো। তিনটে ধাপ টপকে নেমে এলো বাগানে।

এই সময় বাগানে কারো থাকার কথা নয়। কাউকে দেখলোও না লিলি। ফুল গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকলো বিচক্ষণ। কোথাও বসলো না, কে জানে ওপরতালার কোনো জানালা দিয়ে কেউ হয়তো লক্ষ্য করছে ওকে। মস্ত বড় একটা গোলাপ দেখে থমকে দাঁড়ালো সে, হাত বাড়ালো ফুলটা ছেঁড়ার জন্যে। কিন্তু কি মনে করে হাতটা ফিরিয়ে নিলো আবার। থাক।

ওখান থেকে সরে এলো লিলি।

‘ম্যাডাম?’ পিছন থেকে ভারি একটা কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো লিলি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, বাসের সেই মেজর। মস্ত লাল গোলাপটা গাছ থেকে ছিঁড়ে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে। মিটি মিটি হাসছে লোকটা।

‘আমাকে কিছু বলছেন, মেজর?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘দেখলাম ফুলটা আপনি ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়লেন না,’ মেজর বললো।

‘তাতে আর লাভ হলো কই, একজন তো ছিঁড়লোই।’

‘ছিঁড়লাম কারণ সে অধিকার আমার আছে,’ হাসিমুখে বললো মেজর। ‘চলতি মাসে বাগানের সিকিউরিটি আমার কাঁধে।’

‘ও।’

‘নিন না, নিন,’ বাড়ানো হাত সহ এক পা এগিয়ে এলো মেজর। ‘আপনি যে ফুল ভালোবাসেন সে তো বোঝাই গেছে। তা না হলে কাজের মাঝখানে সময় করে বাগানে ঢুকবেন কেন! নিন, ফুলটা আপনাকে উপহার দিচ্ছি আমি।’

গোলাপটা নিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো লিলি। ‘ধন্যবাদ।’

লিলির গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো মেজর।

বেলা ঠিক একটা ত্রিশ মিনিটে গেট বি-র সামনে এসে ব্রেক করলো ডেলিভারি ভ্যানটা। ড্রাইভার, একজন প্রোচ ইটালিয়ান, লাফ দিয়ে নামলো নিচে। সাথে সাথে চার-পাঁচজন সশস্ত্র গার্ড তাকে ঘিরে ফেললো।

গেট হাউসের ভেতর থেকে ডিউটি অফিসারও ভ্যানটাকে দেখতে পেলো। খোলা নোটবুকটা তার সামনেই রয়েছে, লেখাগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলালো সে। কর্নেল ওয়ার্টসন সকাল দশ-টাতেই ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন একটা ডীপ ফ্রিজ নিয়ে সরকারী মেডিকেল স্টোর থেকে ডেলিভারি ভ্যান আসবে। ফ্রিজটা ভেতরে আনার জন্যে লোক লাগবে, ভ্যানের সাথেই আসবে তারা। পাস চাওয়ার দরকার নেই, সবাইকে যেন ঢুকতে দেয়া হয়।

পরিস্কার নির্দেশ, সন্দেহ করার কিছু নেই। তবু অভ্যেসবশে ফোনের রিসিভার তুলে কর্নেল ওয়াটসনের নম্বরে ডায়াল করলো ডিউটি অফিসার।

অপরপ্রান্ত থেকে যান্ত্রিক, একটু বেশি যান্ত্রিক, কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ‘কর্নেল ওয়াটসন!’

‘স্যার, গेट হাউস থেকে ডিউটি অফিসার বলছি...।’

‘কি দরকার?’ কর্নেল ব্যস্ত মানুষ, কাজের মধ্যে কেউ বিরক্ত করলে ধমক তো দেবেনই।

‘স্যার, আপনার সেই ডেলিভারি ভ্যানটা এসেছে...।’

‘ওড। কিন্তু তুমি ফোন করছো কেন তাই বলো।’

‘স্যার, আমরা কি ওদের সবাইকে ভেতরে ঢুকতে দেবো...’, জানালা দিয়ে ডিউটি অফিসার দেখতে পেলো, ভ্যানের পিছন থেকে লাফ দিয়ে হোঁৎকা চেহারার চারজন লোক নিচে নামলো। গার্ডদের সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেছে ড্রাইভার, এবার বাকি চারজনও যোগ দিলো। গার্ডরা সতর্ক, কিন্তু লোকগুলো হাসছে।

‘ডিউটি অফিসার? নাম কি তোমার?’ অপরপ্রান্ত থেকে বজ্র-কণ্ঠে জানতে চাইলো কর্নেল। ‘একটা অর্ডার ক’বার দিতে হয়? সকালেই তো ফোন করে বলে দিয়েছি...।’

‘জী, স্যার, সকাল বেলাই বলে দিয়েছেন... আমতা আমতা করতে লাগলো ডিউটি অফিসার। ‘ঠিক আছে, স্যার, ঠিক আছে — ওদের সবাইকেই... রাখি, তাহলে, স্যার!’ রিসিভার নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ডিউটি অফিসার। ভাবলো, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, কর্নেল দ্বিতীয়বার তার নাম জানতে চাননি। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলো সে।

ডিউটি অফিসারের নির্দেশে গার্ডরা সরে দাঁড়ালো। ড্রাইভার আবার ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো। বাকি চারজন লোক বসে বসে হলো তাদের ভেতরে ঢুকতে হবে গেট এ দিয়ে।

ড্রাইভার ভ্যান ছেড়ে দেবে, এই সময় ডিউটি অফিসার একজন গার্ডকে জিজ্ঞেস করলো, ‘ভ্যানের পিছনটা চেক করেছো? ওখানে একটা ফ্রিজ আছে, ভেতরটা দেখেছো?’

ফ্রিজের ভেতর থেকে কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পেলো রানা। গার্ড বললো, ‘অ্যাঁই ড্রাইভার, রোখো।’

মনে মনে প্রমাদ গুলো ড্রাইভার, অসহায় ভঙ্গি করে চুপ করে থাকলো সে।

ভ্যানের পিছনে চড়লো দু’জন গার্ড। ডীপ ফ্রিজের দরজা বন্ধ। হাতল ধরে টানাটানি করলো তারা। আধ মিনিট পর ভ্যানের কিনারা থেকে তাদের একজন ডিউটি অফিসারকে বললো, ‘ফ্রিজ খুলছে না। তালা দেয়া, চাবি লাগবে।’

ড্রাইভারের দিকে তাকালো ডিউটি অফিসার। ‘চাবি দাও।’

বাকি চারজন লোক পাঁচিল ঘেঁষে গেট এ-র দিকে এগিয়েছে।

‘চাবি?’ আকাশ থেকে পড়লো ড্রাইভার। ‘আমি কোথায় চাবি পাবো?’

ডিউটি অফিসারের মনে সন্দেহ দেখা দিলো। ‘চাবি কোথায় পাবে মানে? ফ্রিজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তোমাকে, আর চাবি দেয়া হয়নি বলতে চাও? কি আছে ফ্রিজের ভেতর?’

‘কর্নেল ওয়াটসনকে জিজ্ঞেস করুন, চাবি তাকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে,’ ঝাঁঝের সাথে বললো ড্রাইভার। ‘ফ্রিজে কি আছে?’ হঠাৎ একগাল হাসলো সে। ‘মেডিসিন। বাইরের টেম-



পারেচারে এক্সপোজ করা হলে মেডিসিনের সমস্ত গুণ ফুঁৎ হয়ে যাবে।' একটা কাগজ গুঁজ দিলো সে ডিউটি অফিসারের হাতে। 'এটা দেখুন, স্টোর থেকে দেয়া হয়েছে। ওষুধের তালিকা। বাইরে এক্সপোজ করলে কি হবে তা-ও লেখা আছে।'।

চোখকপালে উঠলো ডিউটি অফিসারের। 'ফুঁৎ হয়ে যাবে মানে?'

'মানে নষ্ট হয়ে যাবে।'।

দশ সেকেণ্ড দ্বিধায় ভুগলো ডিউটি অফিসার। সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের প্যাডে লেখা কাগজটার ওপর চোখ বুলালো। তারপর মাথা নাড়লো সে। 'কিন্তু ভেতরে কি আছে তা না দেখে আমি ওটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি না, কাগজ যা-ই লেখা থাক।'।

'সেটা আপনার সমস্যা, অফিসার,' নিলিগু কণ্ঠে বললো ড্রাইভার। 'আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তাই করবো। বলেন তো মেডিকেল স্টোরে সব ফিরিয়ে দিয়ে আসি।' হাতঘড়ি দেখলো সে। 'খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট।'।

'তুমি ঠিক জানো ফ্রিজের চাবি কর্নেল ওয়াটসনের কাছে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?'

ঠোটে একটা সিগারেট গুঁজলো ড্রাইভার। 'জেনেই বলছি। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।'।

গেট হাউসে টেলিফোন বাজছে। 'দাঁড়াও, আসছি,' বলে সেদিকে ছুটলো ডিউটি অফিসার।

গ্যাস-মাস্ক পরতে পরতে দরদর করে ফ্রিজের ভেতর ঘামছে রানা। ডীপ ফ্রিজের চাবি অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা কর্নেল ওয়াটসন ওরফে ভিনসেন্ট গগলের কাছে নয়, আছে লিলির কাছে। চাবি ছাড়াও ফ্রিজের দরজা খোলা যাবে, সে-ব্যবস্থা রানার সাথেই আছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্রিজটা ওরা খুলতে চায় না, চাইছে যেমন আছে তেমনি যেন থাকে ।

রানার উদ্বেগ বাড়তেই থাকলো । সবকিছু এখন ডিউটি অফিসারের ওপর নির্ভর করছে । কর্নেল ওয়াটসনকে ফোন করা হলে আবার নেটা রিসিভ করবে গগল, কারণ চীফ মেডিসিন কন্ট্রোলার কর্নেল ওয়াটসনের ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর লাইনটার সংযোগ দেয়া হয়েছে হাসপাতালের উন্টোদিকের সাততলা ভবনের একটা রিসিভারের সাথে । কমরাটা কাল ভাড়া করা হয়েছে, সামনে রিসিভার নিয়ে বসে আছে গগল । পাশেই জানালা, নিচের রাস্তায় হাসপাতালের দুই গেটে ভ্যান আর নিজের লোকদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে । ফোনপেলে ডিউটি অফিসারকে গগল বলবে, ফ্রিজ খোলা যাবে না । কিন্তু তার কথা যদি লোকটামানতে রাজি না হয় ? তার বস-ও তো একজন কর্নেল, সে যদি নিজের বসের কাছে নির্দেশ চায় ? তার বস হয়তো সরাসরি কর্নেল ওয়াটসনের সাথে দেখা করবে । সেই মুহূর্তে ফাঁস হয়ে যাবে সব । কর্নেল ওয়াটসন বলবে, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে ফ্রিজ আসছে তা-ই সে জানে না । ফোনের লাইনে যে কারিগরি কেরামতি করা হয়েছে, তা-ও জানাজানি হয়ে যাবে । ড্রাইভার সহ বাকি চারজনকে গ্রেফতার করা হবে, ভাঙা হবে ফ্রিজের দরজা । তারপর কি হবে, ভাবতে চায় না রানা । বন্ধ একটা কেবিনে গ্যাস বোমা বিস্ফোরিত হলে ভালো ফলাফল আশা করা যায়, কিন্তু খোলা রাস্তায় বিস্ফোরিত হলে ক'জনকে অজ্ঞান করতে পারবে বলা কঠিন ।

মাত ঘাবড়াও পেয়ারে, দেখোই না শেষ পর্যন্ত কি হয় । নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো রানা ।

গেট এ থেকে ফোন করা হয়েছে। ওদিকের গেট হাউস থেকে ডিউটি অফিসার জানতে চাইছে, পাস ছাড়া চারজন লোককে সে ভেতরে ঢুকতে দেবে কিনা। রিসিভারে কড়া নির্দেশ জারি করলো গেট বি-র ডিউটি অফিসার, ‘এদিকে ঘাপলা দেখা দিয়েছে, কাজেই আমি না বলা পর্যন্ত লোকগুলোকে তোমাদের গেট হাউসে আটকে রাখো—কড়া পাহারায়।’

গেট হাউস থেকে বেরিয়ে আবার ভ্যানের পাশে এসে দাঁড়ালো ডিউটি অফিসার। ইঙ্গিত পেয়ে তার পাশে চলে এলো দু’জন গার্ড। ‘নেমে এসো,’ ড্রাইভারকে হুকুম করলো ডিউটি অফিসার। ‘গেট হাউসে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে।’

‘কেন, গেট হাউসে অপেক্ষা করতে হবে কেন?’ ঘাবড়ে গেছে ড্রাইভার। ‘হয় আমাকে ভেতরে ঢুকে মাল খালাস করতে দিন, নাইয় বিদায় দিন চলে যাই।’

‘চলে যাবার জন্যে এতো ব্যস্ত কেন?’ খোঁচা মারা প্রশ্ন করলো ডিউটি অফিসার। ‘অপেক্ষা করতে হবে এই জন্যে যে কর্নেল হামফ্রে লাক্স খেতে গেছেন, তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই।’

‘কর্নেল হামফ্রে?’

‘আমার বস।’ ডিউটি অফিসারের চেহারা থমথম করছে।

তিনতালার একটা জানালা দিয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখছে লিলি। কি ঘটতে চলেছে পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। ভ্যান থেকে নেমে এলো ড্রাইভার, ডিউটি অফিসারের সাথে মহা তর্ক জুড়ে দিয়েছে সে।

অস্থির হয়ে উঠলো লিলি। কিছু একটা করা দরকার। অথচ কিছুই তার করার নেই। পাঁচ মিনিট আগে দুশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে দিয়ে হেঁটে এসেছে সে। কেবিনের বাইরে একজন

মাত্র মিলিটারী পুলিশ ছিলো। কেবিনের ভেতরটাও প্রায় খালি, শুধু একজন নার্স আছে। উকি দিয়ে আবছাভাবে দেখেছে সে। এখনই সুযোগ, একটু পরই সবাই আবার ফিরে এসে কেবিনে ঢুকবে।

গেটে সমস্যা দেখা দিয়েছে ফ্রিজের দরজা খোলা নিয়ে, আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না লিলির। রবিন তাকে আগেই বলেছিল, এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। বাধাটা এড়াবার একাধিক বিকল্প সমাধান সংশ্লিষ্ট সবার জানা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই হয়তো কাজে আসবে না। এতো পরিশ্রম, এতো আয়োজন, সব বুদ্ধি বিফলে গেল। সাদা কোটের পকেটে হাত ভরে চাবির অস্তিত্বটা অনুভব করলো লিলি। গেটে গিয়ে ডিউটি অফিসারের সামনে দাঁড়াবে নাকি? চাবি দেখিয়ে বলবে, আমি ফ্রিজ খুলতে পারবো না, সাহস থাকলে আপনি খুলুন, কিন্তু ওষুধগুলো নষ্ট হলে আপনি দায়ী থাকবেন। উহঁ, মস্ত বোকামি হয়ে যাবে। ডিউটি অফিসার অতো বোকা নয়। ফ্রিজের দরজা এক সেকেন্ডের জন্যে খুলে আবার বন্ধ করলে ওষুধ যে নষ্ট হবে না, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে। চাবি পেলে অবশ্যই ফ্রিজ খুলবে সে।

তখন গ্যাস বোমা না ফাটিয়ে রবিনের কোনো উপায় থাকবে না। তারমানে অপারেশন শিকেয় উঠবে। শুধু কি তাই, জান নিয়ে পালানোই দুষ্কর হয়ে পড়বে রবিন সহ বাকি পাঁচজনের।

এই সময় ভ্যানের পিছনে একটা মাসিডিঞ্জ এসে থামলো। গাড়িটা আগেও একবার দেখেছে লিলি। কর্নেল হামফ্রেস গাড়ি। লাঞ্চ সেরে খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছেন ভদ্রলোক।

ভ্যানের ড্রাইভারকে প্রায় জোর করে গেট হাউসের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এই সময় কর্নেল হামফ্রেস গাড়িটাকে ভ্যানের পিছনে

থামতে দেখলো ডিউটি অফিসার। ড্রাইভারের দায়িত্ব গার্ডদের ওপর ছেড়ে দিয়ে মাসিডিঞ্জের দিকে ছুটলো সে। সামনে বাধা দেখে মহা বিরক্ত হয়েছেন কর্নেল, হর্নের বোতামে আঙুলের চাপ দিয়ে রেখেছেন।

ডিউটি অফিসারকে ছুটে আসতে দেখে হর্ন থামালেন কর্নেল, জানালা দিয়ে মুখ বের করে খেঁকিয়ে উঠলেন, ‘এসব কি, সার্জেন্ট?’

‘স্যার, সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে একটা ডীপ ফ্রিজ আনা হয়েছে,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ডিউটি অফিসার। ‘কিন্তু ওরা বলছে ফ্রিজের দরজা খোলা যাবে না। ভেতরে কি আছে না দেখে...।’

ফ্রিজের ভেতর থেকে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে কথাগুলো শুনছে রানা। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে।

‘খোলো,’ হাঁক ছাড়লো কর্নেল হামফ্রে। ‘তারপর চাকরিটা হারাও!’

‘জ্বী?’ হাঁ হয়ে গেল ডিউটি অফিসার। ‘জ্বী, স্যার?’

‘জ্বী স্যার, না? দূর হও সামনে থেকে!’ খেপে গেছে কর্নেল হামফ্রে। ‘ফ্রিজে লাখ ডলারের ওষুধ রয়েছে, আর উনি সেগুলো বাইরে এক্সপোজ করতে চান! তুমি দেখছি আমার চাকরিটাও খাবার তালে আছো!’

‘না, স্যার, মানে আমি স্যার...।’

হুস্কার ছাড়লো কর্নেল, ‘এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছো!’

চরকির মতো আধ পাক ঘুরে গেটের দিকে ছুটলো ডিউটি অফিসার। ‘অ্যাই ড্রাইভার, জলদি ভ্যান সরাও—দেখছো না সারের গাড়ি ভেতরে ঢুকতে পারছে না!’

এরপর সব পানির মতো সহজ হয়ে গেল। হাসপাতালের উঠন  
পেরিয়ে বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁষে থামলো ভ্যান। ফোন পেয়ে গেট এ-র  
গেট হাউস থেকে মুক্তি দেয়া হলো বাকি চারজন ভ্যান-কর্মীকে।

ফ্রিজের ভেতর নিঃশব্দে হাসলো রানা। কিন্তু একটু ভাবতে  
গিয়ে ধীরে ধীরে স্নান হয়ে গেল হাসিটা। বড় বাধাটা পেরোনো  
গেছে বটে, কিন্তু তাতে ওর কোনো কৃতিত্ব নেই।

তিনতলার জানালার সামনে থেকে সরে গেল লিলি। পরম স্বস্তি  
বোধ করলো সে। কয়েক পা হেঁটে করিডরের একটা বাঁকে থামলো,  
এদিক ওদিক তাকিয়ে দেয়ালের ছক থেকে ফোনের রিসিভারটা  
নামালো। ছশো এগারো নম্বর কেবিনে ফোন করলো সে।

‘ভ্যানেসা বলছি,’ আহতলোকটার কেবিন থেকে জবাব দিলো নার্স।

‘মেজর সুসান। পার্সোনেল অফিসে রিপোর্ট করবে, প্লিজ ?  
লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার জায়গায় পনেরো  
মিনিট ডিউটি করবে সে।’ উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ  
কেটে দিলো লিলি।

ছশো এগারো নম্বর কেবিন। রিসিভার নামিয়ে রেখে রোগীর  
কাছে ফিরে এলো নার্স। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসির  
রেখা ফুটে রয়েছে। রোগীর পালস দেখলো সে। সন্তুষ্টচিত্তে আপন-  
মনে মাথা নাড়লো। তারপর, লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া এসে পৌঁছুবার  
আগেই, কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো সে। ‘অফিস থেকে ডাকলো  
আমাকে,’ মিলিটারী পুলিশকে বললো সে। ‘লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া  
এখুনি আসবে।’

করিডর ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল নার্স। বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এলো  
উঠনে, উঠন থেকে গেট পেরিয়ে রাস্তায়। রাস্তার মোড়ে তার জন্তো

একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

তিন মিনিট এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ছশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে এসে থামলো লিলি।

‘লেফটেন্যান্ট গ্লোরিয়া?’ জিজ্ঞেস করলো মিলিটারী পুলিশ।

‘হ্যাঁ,’ কেবিনের ভেতর ঢুকতে শুরু করে বললো লিলি। তারপর হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো এম. পি.-র দিকে। ‘ফ্রিজটা বদলে দিয়ে গেছে?’

হাতঘড়ি দেখলো এম. পি.। ‘দেড়টার সময় নতুনটা নিয়ে আসার কথা, কই, এখনো তো এলো না।’

‘এসে যাবে,’ বলে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো লিলি।

ওদিকে, তিনতলায় থামলো এলিভেটর। ফ্রিজটাকে ধরাধরি করে করিডরে বের করে আনলো ভ্যান-কর্মীরা। ভেতরের দেয়ালে বার-বার মাথা ঠুকে যাচ্ছে রানার। ছশো এগারো নম্বর কেবিনের সামনে পৌঁছে গেল ফ্রিজ, খাড়া করে দরজার পাশে রাখা হলো সেটা। রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে হাঁপাতে লাগলো ভ্যান-কর্মীরা।

‘তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি,’ তাগাদা দিলো এম. পি.। ‘এখানে জটলা পাকানো চলবে না।’

ভ্যান-কর্মীরা আবার ফ্রিজটাকে ধরাধরি করে শূণ্যে তুললো। এতোক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলো রানা, এখন শোয়া অবস্থায়, তা-ও উপুড় হয়ে।

দরজায় নক করলো এম. পি.। সাথে সাথে দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়ালো লিলি। ভেতরে ঢোকানো হলো ফ্রিজ। ভ্যান-কর্মী-

দের পিছু পিছু এম. পি.-ও কেবিনের ভেতর ঢুকলো। পুরনো ফ্রিজটার পাশেই রাখা হলো নতুনটাকে। রুমাল বের করে আবার ঘাম মুছতে শুরু করলো ভ্যান-কর্মীরা, আবার তাড়া দিলো এম. পি., ‘কাজটা শেষ করো। পুরনোটা, নাকি মাল খালাস করে নতুনটাই আবার নিয়ে যাবে? যা করবার তাড়াতাড়ি করো।’

‘একটু দেরি হবে,’ এম. পি.-কে বললো লিলি। ‘ওরানাহয় ততোক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করুক?’

‘আই, বাইরে, সবাই বাইরে!’ চারজনের দলটাকে খেদিয়ে বাইরে নিয়ে এলো এম. পি.। ভেতর থেকে কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলো লিলি।

নতুন ডীপ ফ্রিজটার সামনে চলে এলো সে। কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ঢোকালো, চাবিটা ঘোরাবার আগে ফ্রিজের গায়ে ঢোকা দিলো—ঠক, ঠক-ঠক।

ফ্রিজের ভেতর কোনো র‍্যাক বা শেলফ নেই, ডাক্তারের পোশাক পরে সটান দাঁড়িয়ে আছে রানা। মুখে গ্যাস-মাস্ক, এক হাতে ডাক্তারী ব্যাগ, অপর হাতে গ্যাস-গান। ছোট্ট লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো ও, দ্রুত হাতে ফেস-মাস্ক খুলে ফেললো। সাদা কোটের পকেটে ভরলো গ্যাস-গান। গ্যাস-মাস্কটা ব্যাগের ভেতর চালান করে দিলো। ‘এসো, আমার সাথে ধরো ওকে,’ বলে পর্দা ঘেরা কেবিনের ওপর অংশের দিকে এগোলো ও।

আহত লোকটার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো রানা। দেখেই বোঝা যায়, জ্ঞান নেই। নাক-মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে অনেক-গুলো পাইপ আর টিউব। মুখটা বাদে সারা শরীর দর ঢাকা। রক্তবাহী টিউব চাদরের তলায় ঢুকে গেছে। স্বচ্ছ টিউবটার দিকে



চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল রানা, ঝট করে তাকালো মাথার কাছে স্ট্যাণ্ডের সাথে ঝুলে থাকা ব্লাড-ব্যাগের দিকে। ব্যাগ থেকে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রক্ত পড়ার কথা টিউবে, কিন্তু পড়ছে না। চাদর সরিয়ে রোগীর পালস দেখলো রানা।

‘কি ব্যাপার, রবিন?’ পাশ থেকে ফিসফিস করে জানতে চাইলো লিলি।

হতভম্ব হয়ে গেছে রানা। খুন, নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝতে পারছে না। শুধু বুঝলো, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলির কজি ধরলো ও, লম্বা পা ফেলে কেবিনের অপর অংশে বেরিয়ে এলো। ব্যাগ হাতে ডীপ ফ্রিজের ভেতর ঢুকে বললো, ‘তালা লাগাও। ওদের ডেকে আবার নিচে নামাতে বলো ফ্রিজ-টাকে।’

তর্ক না করে নির্দেশ পালন করলো লিলি। কেবিনের দরজা খুলে ভ্যান-কর্মীদের বললো, ‘এসো তোমরা, ফ্রিজ খালি করা হয়েছে।’

ওদের সাথে এম. পি.-ও ঢুকলো কেবিনে। আবার ওদের সাথেই বেরিয়ে এলো। ফ্রিজ নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোলো চারজন। এম. পি. কেবিনের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। কেবিন থেকে লিলি বেরুলো না, তবে ফ্রিজটা যখন বের করা হচ্ছিলো তখন এম. পি.-র চোখকে ফাঁকি দিয়ে একজন ভ্যান-কর্মীর পকেটে ফ্রিজের চাবিটা ফেলে দিয়েছে সে।

এক মিনিট পর দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো লিলি। ‘বাথ-রুম থেকে আসছি,’ বলে ফ্রিজ যেদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার উল্টো দিকে হাঁটা ধরলো সে।

বাঁক ঘুরলো লিলি, পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে টয়লেট

লেখা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো সে। ইউনিফর্ম পরা তিনজন হাসপাতাল-কর্মী বন্ধ একটা দরজার সামনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে একটা মেয়ে বলে চলেছে, ‘নিশ্চয়ই কোনো পাগলের কাণ্ড! তা না হলে সবগুলো দরজায় তালা দেয় কেউ!’

‘কি ব্যাপার, কি হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘ভারি অদ্ভুত ব্যাপার,’ হাসপাতাল কর্মীদের একজন উত্তর দিলো। ‘আমরা সবাই টয়লেটে যাবো বলে এসেছি। এসে দেখি, সবগুলো দরজায় কে যেন তালা লাগিয়ে গেছে। ভ্যানেসা রিকার্ড একটার ভেতর ছিলো, তার টয়লেটেও। দশ মিনিট ধরে চেষ্টামেচি করছে ও। ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছিলাম, তা না হলে জানাই যেতো না...।’

‘চাবি?’

লোকটা বললো, ‘অফিস থেকে আনতে পাঠানো হয়েছে।’

জোর করে হাসলো লিলি। ‘নিশ্চয়ই কেউ ভুল করে...।’

‘এমন ভুল মানুষ করে!’ ক্ষোভ প্রকাশ করলো লোকটা। বাকি দু’জনও তিক্ত মন্তব্য করলো।

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এলো লিলি। সেই লেফটেন্যান্ট-নার্সের কথা মনে পড়ছে ওর। একই বাসে এসেছে ওরা, তার মতো সে-ও উদ্দেশ্যহীনভাবে হাসপাতালে এখানে-সেখানে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছিল। টয়লেটগুলোর দরজায় সে-ই কি তালা দিয়েছে? নার্স ভ্যানেসাকে টয়লেটে বন্ধ করে রেখে ছশো এগারো নম্বর কেবিনে নিজে গিয়েছিল? সে-ই কি তাহলে রিসিভ করেছিল তার ফোন কল? সে ভ্যানেসা নয়, সেজন্যেই কি গ্লোরিয়া পৌঁছুবার আগেই

হুশো এগারো নম্বর কেবিন থেকে কেটে পড়ে ?

রোগীটাকে তাহলে কি সে-ই খুন করে গেছে ?

তাকে কি কে. জি. বি. রেসিডেন্ট পাঠিয়েছিল ?

সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে একতলায় নেমে এলো লিলি। এসে দেখলো, আরেক কাণ্ড বেধে গেছে। ফ্রিজটা তোলা হয়েছে ভ্যানে, কিন্তু গেটে আবার থামানো হয়েছে ড্রাইভারকে। আগের ডিউটি অফিসার নেই, লাঞ্চ খেতে গেছে, নতুন ডিউটি অফিসার ফ্রিজের ভেতরটা না দেখে ভ্যান ছাড়বে না।

এবার আর চাবি নেই বা অন্য কিছু বলে পার পেলো না ড্রাইভার। কারণ জেরার উত্তরে আগেই সে বলে বসেছে, ফ্রিজ খালি। ভ্যান-কর্মীদের একজন পকেট থেকে ফ্রিজের চাবি বের করে ডিউটি অফিসারের হাতে দিলো। দু'জন গার্ডকে নিয়ে নিজে ভ্যানে চড়লো অফিসার। খোলা হলো ফ্রিজের দরজা।

কিছুই নেই, ফ্রিজের ভেতরটা খালি।

উঠনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছে লিলি, কাঁধে একটা হাত পড়লো।

‘চলো, বাইরে আমাদের গাড়ি অপেক্ষা করছে,’ বললো রানা। একটুও অবাক হয়নি লিলি। সে জানে, এলিভেটর একতলায় নামার সময় ফ্রিজ থেকে বেরিয়ে এসেছে রবিন।

অপর গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ওরা। ওদিকে ভ্যানের ড্রাইভারও ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে।

পার্কিং লটে এসে গাড়িতে চড়লো ওরা। মেইন হাইওয়েতে উঠে এলো গাড়ি। থমথম করছে রানার চেহারা।

টয়লেটে গিয়ে কি দেখেছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করলো লিলি। চুপ-

চাপ শুনলো রানা। লিলি থামার পর মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করলো ও, ‘বাস্টার্ডস !’

‘তাহলে আমি যা ভেবেছি সেটাই ঠিক ?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘হ্যাঁ, লোকটাকে খুন করা হয়েছে,’ বললো রানা। ‘আমাদের এতো চেষ্টা কোনো কাজেই লাগলো না।’

‘কিন্তু খুনটা করলো কিভাবে ?’

‘কি জানি, আমি তো কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না। তবে মেয়েটা যে রেসিডেন্টের একজন এজেন্ট এ আমি হলপ করে বলতে পারি।’ হঠাৎ খেপে গেল রানা, ‘ওরা মানুষ নয়, লিলি ! আমার ওপর ওদের কোনো বিশ্বাস নেই। লোকটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি, অথচ আমাকে একটা সুযোগ পর্যন্ত দিলো না। নিজেদের লোককে মেরে ফেললো—ছি !’

রানাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলো লিলি, ‘আমরা যা ভাবছি তা না-ও হতে পারে, রবিন। লোকটা হয়তো নিজে থেকেই মারা গেছে...।’

কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়লো।

একটু পর জিজ্ঞেস করলো লিলি, ‘এখন আমরা কি করবো ?’

‘আমাকে অপমান করা হয়েছে, লিলি,’ বিষন্ন এবং গভীর দেখালো রানাকে। ‘নির্মম হতে পারলে আমার উচিত অ্যাসাইন-মেন্টের দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেশে ফিরে যাওয়া। কিন্তু তা যদি যাই, এই একই ভাবে আরো অনেক লোককে খুন করবে ওরা। শুধু ওদের কথা ভেবে...।’

‘কাদের কথা ?’

‘সব কথা জানতে চেয়ো না,’ নরম সুরে বললো রানা।

বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো লিলি, ‘ছঃখিত, রবিন।’

‘না, কাজটা ফেলে চলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,’ আপন-মনে বললো রানা।

‘আমরা এখন কি করবো বলবে, নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে?’ অভিমানের সাথে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘গোটা ব্যাপারটার জন্যে যে দায়ী, সেই ম্যানিয়াকটাকে খুঁজে বের করবো,’ বললো রানা। বললো বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র ধারণা নেই কোথায় পাওয়া যাবে ডালচিমস্কিকে। দায়িত্বটা নেয়ার সময়ই মনে হয়েছিল, ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলো আনা। এখনো তাই মনে হচ্ছে। হিউম্যান বে মাগুলোকে এক এ’ করে ফাটিয়ে চলেছে ডালচিমস্কি, এখন আবার কে. জি. বি. রেসিডেন্টও একই পথ ধরেছে। এমন হবে জানলে শত অনুরোধেও কি ঢেঁকি গিলতো ও!

লাঞ্চ খাবার জন্যে ফ্রেঞ্চ একটা রেস্টোরাঁয় ঢুকলো ওরা। রানাকে অশ্রুমনস্ক দেখে নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া সারলো লিলি। গগলের কথা ভাবছিল রানা।

ভিনসেন্ট গগলের সাথে রানার পরিচয় আজকের নয়। দু’জন দু’মেরুর বাসিন্দা, একজনের সাথে আরেকজনের কোনো দিক থেকেই কোনো মিল নেই। সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, কিন্তু সে বন্ধুত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। রানা জানে ভিনসেন্ট গাল একজন আন্তর্জাতিক স্মাগলার, ভূমধ্যসাগরের দু’তীরে যতোগুলো সন্ত্রাসবাদী দল আছে সেগুলোর প্রায় সব ক’টাকেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ যোগান দেয় সে। তার জাতীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কেউ কিছু জানে না। তার কোনো কোনো আচরণে আভাস পাওয়া যায়, ফ্রেঞ্চদের প্রতি তার দরদ আছে, আর মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে সে

সমর্থন করে। রানা তার সম্পর্কে বিশদ জানার জন্তে অত্যাঁয় কৌতূ-  
হল কখনোই প্রকাশ করেনি, আবার রানা সম্পর্কে গগলও তার  
কৌতূহলের মাত্রা একটা সীমার বাইরে যেতে দেয়নি। সে নিজে  
যেমন, রানাকেও সেরকম একজন বলে সন্দেহ করে সে—গভীর  
জলের মাছ, হয় আগলার নাইয় আগারগ্রাউণ্ডের রাঘব-বোয়াল।  
গগলের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে রানা, ওর মধ্যে  
লোক দেখানো কোনো ব্যাপার নেই। কেউ যদি তার কোনো  
উপকার করে, মৌখিক একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় না, পাণ্টা কোনো  
উপকার করে ঋণ শোধের অপেক্ষায় থাকে। অনেক গুরুতর সংকটে  
গগলকে সাহায্য করেছে রানা, কিন্তু জানতে চেষ্টা করেনি কোনো  
বড় ধরনের ক্রাইম করতে গিয়ে গগল সংকটে পড়েছিল কিনা।  
সেরকম রানার ডাকে সাড়া দিয়ে সাহায্য করতে এসে গগলও  
কখনো জানতে চেষ্টা করেনি ঠিক কোন্ ধরনের অপরাধ করতে  
গিয়ে ফেঁসে যাচ্ছিলো রানা।

ওদের বন্ধুত্বের ভিত্তি হলো বিশ্বাস, সেটা এতো গভীর আর শক্তি-  
শালী যে কোনোদিন নষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

কিছুদিন থেকে গগলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে রানা।  
এতোদিন স্থায়ী কোনো ঠিকানা ছিলো না তার, বেশিরভাগ সময়  
ইয়ট নিয়ে সাগর চষে বেড়াতো। হঠাৎ কি মনে করে যুক্তরাষ্ট্রের  
নাগরিক হয়েছে সে, বাড়িও কিনেছে। প্রচুর মদ খেতো, যদিও  
মাতাল হতো না, ইদানীং মাত্রাটা অনেক কমেছে। এতো দিন  
তাকে প্রায় জলচর বলে জেনে এসেছে রানা, হঠাৎ তার এই  
ডাঙার প্রতি আকর্ষণ কি তাৎপর্য বহন করে জানা নেই রানার।  
স্থিতি চায় গগল? বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হতে চায়? নাকি অন্য

কোনো উদ্দেশ্য আছে তার ?

আজ হঠাৎ করে দু'জনের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল দেখতে পেলো রানা। বিয়ে করে সংসারী হয়েছে, দু'জনের বেলাতেই এ যেন কল্পনা করা যায় না। পেশা যাই হোক, ভিনসেন্ট গগল আপাদ-মস্তক একজন অ্যাডভেঞ্চারার। রানাও কি তাই নয় ? কোনো ধরনের বাঁধনই ওদের ধাতে সইবে না।

একজন আরেকজনের বিপদে সাহায্য করেছে, প্রতিদান দিয়েছে, বেশ কিছু দিন হিসেবটা নিভুলি ছিলো। কিন্তু তারপর আর হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি। কে যে এখন ঋণী, দু'জনের কেউই এখন আর তা বলতে পারবে না। এই অ্যাসাইনমেন্টে গগলের আরো সাহায্য দরকার হবে রানার। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো ও, নিকট ভবিষ্যতে লোকটার জন্তে কিছু একটা করতে হবে ওকে।

রানা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা নয়। ওর জানা নেই ঋণের বোঝা এখন থেকে শুধু বাড়তেই থাকবে।

বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্টোর'এ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। টোপেকা এয়ারপোর্টের দিকে ছুটলো গাড়ি। রেডিওটা অন করলো রানা। টনি বেনেটের গান বাজছে। রেকর্ডটা শেষ হতে খবর পড়া শুরু হলো।

‘ফোর্ট লিভেনওয়ার্থ মিলিটারী হাসপাতাল থেকে আমাদের রিপোর্টার জানিয়েছেন, আজ কিছুক্ষণ আগে টিম পারকার মারা গেছে। আপনারা আগেই জেনেছেন, তাকে অন্তর্ঘাতক বলে সন্দেহ করা হচ্ছিলো। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার আর জ্ঞান ফিরে আসেনি।...।’

এটা যে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, সি. আই. এ. ঠিকই তা জানতে

পারবে, ভাবলো রানা। কিন্তু খবরটা প্রচার করবে কিনা সন্দেহ আছে।

রানার চিন্তা অন্য খাতে বইতে শুরু করলো। ম্যানিয়াকটা এই মুহূর্তে কোথায়? কি করছে সে? এরপর কোথায় আঘাত হানবে ডালচিমস্কি? মন বলছে আবার তার আঘাত করার সময় হয়ে গেছে।

ঠিকই বলছে মন।

## চোদ্দ

---

ক্যাপটেন মাক্সিম ইলিয়টসিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে যারপরনাই আনন্দিত হলেন কে. জি. বি. রেসিডেন্ট। মস্কোয় খবরটা পাঠাবার আগে দুই চুমুকে দুই আউন্স ভদকা গলধঃকরণ করলেন তিনি। মস্কো থেকে নির্দেশ পাবার পরপরই একজন যোগ্য মেয়ে এজেন্টকে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বেচারী হাসপাতালে ঢুকতে পারলেও প্রথম দু'দিন ইলিয়টসিনের দুশো এগারো নম্বর কেবিনে ঢুকতে পারেনি। তার তৃতীয়বারের চেষ্টা সফল হয়, এবং একবার কেবিনে ঢোকার পর বাকি কাজটা পানির মতো সহজে সেরে ফেলে।



হাইপডারমিক সিরিজ শিরায় ঢুকিয়ে তরল কোনো ওষুধ নয়, শ্রেফ বাতাস ইঞ্জেক্ট করে সে। সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না। ইলি-য়টসিনের হাতে ইঞ্জেকশন পুশ করার অনেক দাগ আছে, অতিরিক্ত একটা দাগ আলাদাভাবে কারো চিনতে পারার কথা নয়। কাজেই মৃত্যুর কারণটা কেউ ধরতে পারবে না, সবাই ধরে নেবে গুরুতর আহত হওয়ার কারণেই তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

ফোর্ট লিভেনওয়ার্থে ম্যাক্সিম ইলিয়টসিন ওরফে টিম পারকারকে যারা পাহারা দিচ্ছিলো, মৃত্যুটাকে নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা রইলো না। কারো ছুঃখ, কেন তাকে সময়ের আগে লাঞ্চ খেতে যাবার নির্দেশ দেয়া হলো অফিস থেকে? আবার কারো ছুঃখ, কেন তাকে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অফিসে ফিরে আসতে বলা হলো? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কয়েকটা ব্যাপার মেলাতে না পারলেও, মৃত্যুটাকে তারা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত বলেই ঘোষণা করলো। নার্স ভ্যানেসার টয়লেটে আটকা পড়ে থাকার ঘটনাটা কারো কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি করলেও, কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখলো। তাদের ধারণা, কেয়ারটেকারদের কেউ একজন ভুল করে কাজটা করেছিল। আর ডীপ ফ্রিজের ব্যাপারটা শ্রেফ চাপা পড়ে গেল। এ-ব্যাপারে যে লোকটা আলোড়ন তুলতে পারতো, সেই কর্নেল ওয়াটসন অকস্মাৎ ছুটি নিয়ে লাস ভেগাস না কোথায় যেন চলে গেছে।

সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হলো এফ. বি. আই.। তাদের এজেন্টদের ভূয়া ফোন কলের মাধ্যমে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা তাদেরকে হতাশ করতে পারলো না। মৃত টিম পারকার সম্পর্কে আরো জোরেশোরে তদন্ত শুরু করলো তারা।

এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখালেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর-দের একজন। তিনি ভাবতে লাগলেন, টিম পারকারের কাগজ-পত্র এবং আইডেনটিটি জাল কেন? এবং, ডেনভারের কাছে আমি বেসে হামলা চালিয়েছিল যে লোকটা, তারই মতো এর জাল কাগজ-গুলোও প্রায় সম মানের উন্নত কেন?

ছোটো ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ থাকতে পারে।

হতে পারে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, আসলে এটা একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। হয়তো এর পিছনে ইন্টাররেশিয়াল টেরোরিস্ট কোনো গ্রুপ জড়িত আছে। এই একটা ব্যাপারে এফ. বি. আই. অদ্বিতীয়; ষড়যন্ত্র আবিষ্কার এবং তা নস্যাৎ করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই। তদন্ত পুরোদমে চলতে লাগলো।

ওদিকে হাষ্টিংটন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় এফ. বি. আই.-এর জন্য আরেকটা সমস্যা তৈরি হতে চলেছে। ভদ্র এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বহু লোক বাস করে হাষ্টিংটনে, তাদের মধ্যে অগ্রতম হলো বার্নার্ড কোরম্যান, একজন বিন্ডিং কন্ট্রাক্টর। বাড়া ছ'ফিট এক ইঞ্চি লম্বা সে, পেশীবহুল শরীর। বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে তার, হালকা রসিকতা করার লোক সে নয়, শহরের গণ্যমান্যদের সাথেই ওঠাবসা। উনিশশো বাট—নাকি উনিশশো একষটি?—সালে কেঁটাটি থেকে এসে ফোরম্যান হিসেবে কাজ শুরু করে সে। দু'বছর কাজ করে ছোটোখাটো কয়েকটা খনি কিনে ফেলে। সেগুলোর একটা এখনো আছে তার, হাষ্টিংটন থেকে এগারো মাইল দূরে। বলাই বাহুল্য, খনিটা সাত রাজার ধন নয়, বছর কয়েক ধরে সেখান থেকে কিছু তোলাও হয়নি। তবু বন্ধু-বান্ধবকে বলে বেড়ায়, কয়লার দাম কখনো যদি চড়ে তাহলে আবার উৎপাদন শুরুর কথা ভাববে

সে। তার বন্ধুদের একজন হলো হাটিংটনের পুলিশ চীফ, প্রায়ই ছুঁজনে শিকার করতে বেরোয়। ছুঁজনই সং, এবং সরল মানুষ, আইন-শৃংখলার প্রতি অন্ধবোধ আছে, পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনে বিশ্বাসী, কঠোর পরিশ্রম করতে জানে—আদর্শ আমেরিকান নাগরিক বলতে যা বোঝায় তাই।

এগারোই জুলাই বিকেল বেলা কোরম্যান তার ওয়্যারহাউসের গেটে তাল লাগালো, কাল সকালের আগে কোনো সাইটেই আর নির্মাণ সামগ্রী পাঠাবার দরকার নেই। সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন, এই সময় অফিস কামরা থেকে খবর এলো তার টেলিফোন এসেছে।

কয়েক মিনিট পর নিজের ফোর-ভাই-ডাইভ জীপে চড়লো কোরম্যান। দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে ছুটলো জীপ। বিশ মিনিট পর রাস্তার দু'পাশে পরিত্যক্ত খনিগুলোকে দেখা গেল, এদিকের রাস্তা টাঁদের পিঠের মতো খানাখন্দে ভরা। খনিগুলো সরু একটা উপত্যকার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, হেডসেট ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই গোটা এলাকার।

হেডসেট হলো একটা সাবটেরেনিয়ান কমাণ্ড পোস্টের সাংকেতিক নাম, যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফ পোস্টটাকে ব্যবহার করলেও করতে পারেন। বোমা, গ্যাস, আর জার্ম গ্রফ একটা বাস্কার, ভেতরে রয়েছে আধুনিক কমিউনিকেশন গিয়ারের বিশাল আয়োজন। উনিশ শো আটান্ন সালে পাথর খুঁড়ে, যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি করা হয় পোস্টটা, সেই থেকে ছোট্ট একটা সিকিউরিটি ট্রুপ আর রেডিও টেকনিশিয়ানদের স্কুদে একটা দলকে সারাক্ষণ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। অফিশিয়ালি বলা হয়, এটা শ্রেফ পুরনো একটা খনি, অতিরিক্ত অ্যামুনিশন রাখার জন্যে গুদাম

হিসেবে ব্যবহার করছে আমি। উপত্যকার শেষ প্রান্তটা ব্যারিকেড দিয়ে সীল করে দেয়া হয়েছে, প্রাইভেট যানবাহন ওদিকে যাতে যেতে না পারে।

নাক বরাবর সোজা হেডসেটের দিকে গেল না কোরম্যান। গাড়ি নিয়ে রিজের মাথায় উঠে এলো সে, থামলো চূড়া থেকে খানিকটা নিচে—দিগন্তের গায়ে যাতে তার বা জীপের কাঠামো দেখা না যায়। গাড়িটাকে পাইন বনের ভেতর লুকিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরালো সে। ছ'একটা টান দিয়ে নেভালো সেটা, তারপর বনের পথ ধরে দেড় মাইল হেঁটে কাঁটাঝোপের কিনারায় এসে থামলো। চারদিকটা ভালো করে দেখে নিয়ে মাথা-সমান উঁচু কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকলো কোরম্যান। কষ্টকর অভিযান, কাপড় ফুঁড়ে মাংসে ফুটছে ধারালো কাঁটাগুলো। কিন্তু থামলো না সে। এভাবেই এক সময় লুকানো মেটাল বক্সের কাছে পৌঁছে গেল।

ছটা চোন্দ মিনিটে ডিটোনেটরে চাপ দিলো সে। পাহাড়টা ধ্বসে পড়লো। বিস্ফোরণের ফলে হাজার টনেরও বেশি মাটি আর পাথর ঢাল বেয়ে নেমে এলো সবগে। মাটির ওপর হেডসেটের ছোটো ছোটো বিল্ডিং ছিলো, ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোর সাথে মিশে গেল সেগুলো। সেই সাথে কমাণ্ড পোস্টের প্রবেশ মুখ পাথর আর মাটিতে চাপা পড়ে গেল। টন টন পাথর ঢুকলো বাস্কারে, ভারি লোহার দরজাগুলো এমনভাবে ছমড়েমুচড়ে গেল, ওগুলো যেন অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ডিটোনেটরে চাপ দেয়ার সময় হেডসেটে কাজ করছিল তেবট্রিজন লোক, প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে একান্ন জন মারা গেল, বাকি সাতজন পরের হুণ্ডায় মারা গেল হাসপাতালে।

হতাহতের সংখ্যা বা হেডসেট রহস্য সম্পর্কে সরকারী সূত্র থেকে রিপোর্টাররা কিছুই জানতে পারলো না। জায়গার নাম উল্লেখ না করে শুধু বলা হলো, একটা আমি ডিপোয় দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণে চারজন লোক মারা গেছে। পেটাগন থেকে ইনভেস্টিগেটররা এলো ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে, লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে কেউ ইউনিফর্ম পরেনি। গোটা এলাকা পরীক্ষা করলো তারা, কিন্তু ডিনামাইটের সামান্য কিছু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তারা আবিষ্কার করতে পারলো না। ডিনামাইটের অংশ পরীক্ষা করে বিস্মিত হলো তারা। কারণ এই ত্র্যাণ্ডের ডিনামাইট ষোল বছর আগে ব্যবহার করা হতো। পাথর আর মাটির বিশাল ঢল বিস্ফোরণের বাকি সমস্ত চিহ্ন চাপা দিয়ে ফেলেছে।

বার্নার্ড কোরম্যান নিজেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। সিকিউরিটি এজেন্টরা অকুস্থলে পৌঁছুবার অনেক আগেই রাইফেল, ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, এক মাসের শুকনো খাবার, আর একটা শর্টওয়েভ রেডিও নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে সে। যতোদূর সম্ভব জীপে করে এগিয়েছে, তারপর পায়ে হেঁটে। পাহাড়ের একটা গুহায় ক্যাম্প করেছে সে। প্রতিদিন সকালে সে তার ব্যাটারিচালিত রেডিও সেটটা অন করে, নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি-তে কাঁটা স্থির রেখে নির্দেশ আর যুদ্ধের খবর শোনার অপেক্ষায় থাকে। কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেল। তাকে কোনো নির্দেশ দেয়া হচ্ছে না, যুদ্ধেরও কোনো খবর নেই। ব্যাপারটা বোধগম্য হলো না কোরম্যানের। নিখুঁত ডীপ কভার এজেন্ট হতভম্ব হয়ে পড়লো, কিন্তু ধৈর্য হারালো না। ঠিক করলো, অপেক্ষা করবে সে। নতুন অর্ডার দিতে বাধ্য তারা। কতৃপক্ষ তার কথা ভুলে যেতে পারে না। তারা জানে,

এরপর কি করতে হবে তা তার জানা নেই।

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সাপ্তাহিক মিটিঙে আলোচ্য সূচীর তৈরী নম্বর বিষয় ছিলো—সোভিয়েত রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের অস্বাভাবিক মৃত্যুহার। ষোলো নম্বর স্থান পেয়েছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া-র ঘটনাটা।

সরাসরি জিল ক্যাসেল, সি. আই. এ. প্রতিনিধির দিকে তাকালো ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি। ‘আপনাদের সেই মেয়েটা, কি যেন নাম ছাই—ওই যে, রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের মৃত্যুহার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল যে?’

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি, একজন মেজর জেনারেল, সহাস্যে বললেন, ‘ভাষা ব্যবহারে আমাদের আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার, জেন্টলমেন। চ্যারিটি উডস্টককে মেয়ে বলা—,’ এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। ‘—বোধহয় উচিত নয়।’

‘আমি আপনার সাথে একমত,’ তাকে সমর্থন করলো জিল ক্যাসেল। ‘চ্যারিটি উডস্টক পরিণত, দায়িত্বসচেতন, ক্রিয়েটিভ একজন অ্যানালিস্ট—আমরা তাকে এজেন্সির গর্ব বলে মনে করি।’

ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাডমিরাল পাইপে টোবাকো ভরছেন। মুখ না তুলেই তিনি কথা বললেন, ‘বড় বড় নব, তার কথা বলা হচ্ছে তো, নাকি?’ সবাই জানে, মার্কিন নেভির অফিসাররা অশ্লীল শব্দ ছাড়া মুখ খুলতে পারে না। ‘আপনাদের এজেন্সির গর্ব, তাতে আর সন্দেহ কি! সে যাক, অস্বাভাবিক মৃত্যুহার থেকে আর কিছু জানতে পেরেছে সে? ব্যাপারটা কি একটা ম্যাসাকার ছিলো?’

‘আমাদের তাই ধারণা,’ জবাব দিলো জিল ক্যাসেল। ‘মিস উড-

স্টকের ধারণা, স্ট্যালিনপন্থীদের একটা গ্রুপ বিদ্রোহ করে বসেছিল।’

‘বিদ্রোহ নিশ্চয়ই দমন করা হয়েছে?’

‘বলা মুশকিল, অ্যাডমিরাল। বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়, বহু লোক ছুঁড়টনায় মারা গেছে—বেশিরভাগই আমি আর কে. জি. বি.-র লোক।’ আরো অনেক তথ্য জানা আছে জিল ক্যাসেলের, কিন্তু প্রয়োজনের বেগে একটা কথাও বলবে না সে।

আবার যখন ষোলো নম্বর আলোচ্য বিষয় উঠলো, প্রথম প্রশ্ন এলো এফ. বি. আই. প্রতিনিধির তরফ থেকে। ‘ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় কি ঘটেছে, আমি ইন্টেলিজেন্সই তা ভালো বলতে পারবে। কিন্তু আমিকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা সি. আই. এ.-কে জিজ্ঞেস করতে বলে। রহস্যটা কি? এতোগুলো লোক মারা গেল, কারা দায়ী? এভাবে তথ্য চেপে রাখা হলে তার পরিণতি যে ভালো হতে পারে না, সে-কথা বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি?’

জিল ক্যাসেল বললো, ‘ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তোলার দরকার নেই। আমার ধারণা হয়েছে, পাথর আর মাটির ঢল-টা এমনি এমনি না-ও নেমে আসতে পারে, কেউ হয়তো নেমে আসতে সাহায্য করেছে। ব্যাপারটার সাথে বিদেশী কোনো শক্তি জড়িত আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে আমি আমাদেরকে অনু-রোধ করেছে।’

‘বেশ, অনুরোধ করেছে,’ এফ. বি. আই. প্রতিনিধি বললো। ‘এখন বলুন, পরীক্ষা করে কি পেলেন আপনারা?’

‘কিছুই পাইনি। কাজটা সম্ভবত কোনো হাসপাতাল পালানো পাগলের। আপনাদের আগ্রহ থাকলে খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোনো হাসপাতাল থেকে পাগল-ছাগল কেউ পালিয়েছে কিনা। কমাও

পোস্টটা টপ সিক্রেট তালিকায় ছিলো, ওটার অস্তিত্বের কথা রাশিয়া, কিউবা, বা চীনের জানার কথা নয়।’

স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, অর্থটা বুঝতে কারো বাকি থাকলো না। ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা হয় ওয়ার্কিং গ্রুপ ফাইভে। গ্রুপ সিক্স মিটিঙে বসেছে শুধু বৈদেশিক সমস্যা আর প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্যে।

পরদিন সকালে সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই জিল ক্যাসেল খবর পেলো, ডিরেক্টরের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট বেন সুইটল্যাণ্ড তাকে দেখা করতে বলেছে। সাথে সাথে তার চেম্বারে হাজির হলো সে।

‘ব্যাপারটা কোন্ পর্যায়ে রয়েছে, ক্যাসেল?’ জানতে চাইলো বেন সুইটল্যাণ্ড। ‘সব ঠিকমতো চলছে, নাকি লেজগোবরে করে ফেলেছো? কন্ট্রোল রুম থেকে খবর পেলাম...।’

‘সব ঠিক মতোই চলছে, বেন,’ তাড়াতাড়ি জবাব দিলো কর্নেল। ‘কন্ট্রোল রুম তোমাকে ঠিকই রিপোর্ট দিয়েছে— কিন্তু মাত্র একটা বালব ফিউজ হয়েছে, দ্বিতীয়টা ঠিকই জ্বলছে।’

‘তা না হয় জ্বলছে,’ কর্কশ গলায় বললো বেন সুইটল্যাণ্ড। ‘কিন্তু তোমার কাজিন কোন করে কি জানতে চেয়েছে শোনোনি?’

‘তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলবো, ছনিয়ার বড় বড় সব ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে আমাদের চর আছে, আমাদের এখানে তাদের দু’একজন থাকবে না, তা কি করে হয়?’

‘বেশ, যুক্তিটা মানলাম।’ বেন সুইটল্যাণ্ড গম্ভীর। ‘কিন্তু তাদের ধরার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, নাকি এখন পর্যন্ত...?’

‘সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, বেন। ফাঁদ পাতা হয়েছে। আশা



করছি ছ'একদিনের মধ্যেই তাকে আমরা ধরতে পারবো। তুমি তো জানোই, আমাদের লোকের খুব অভাব।’

‘লোকের অভাব ? সারো দিন কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করে যারা তাদের এবার কিছু কাজ দাও না !’

‘কার কথা বলছো, বেন ?’ এবার জিল ক্যাসেলও গম্ভীর হয়ে উঠলো।

‘এই যেমন ধরো চ্যারিটি উডস্টক,’ বললো বেন সুইটল্যান্ড। ‘ইয়া বড় ‘একজোড়া ইয়ে’ নিয়ে...থাক, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এ-কথা তো সত্যি যে চেয়ারে বসে কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার। না, ভুল হলো, আরো একটা কাজ আছে তার—মহিলা কর্মীদের উত্তেজিত করা। শুনলাম, অফিসে নাকি নারী-স্বাধীনতার ওপর রীতিমতো ভাষণ দেয় সে !’

জিল ক্যাসেল অপমান বোধ করলো। তার কর্মচারী সম্পর্কে কটুক্তি করা মানে তাকেই অপমান করা। তবু, সুইটল্যান্ডের প্রভাবের কথা মনে রেখে তর্কের মধ্যে গেল না সে। ঠিক আছে, দেখবো, বলে চলে এলো।

নিজের অফিস কামরায় ফিরে চ্যারিটি উডস্টককে ডেকে পাঠালো জিল ক্যাসেল।

একটু পরই হাজির হলো চ্যারিটি উডস্টক। আজ তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সুইটল্যান্ডের সাথে কি কি কথা হয়েছে সব তাকে শোনালো কর্নেল, আপত্তিকর অংশগুলো বাদ দিয়ে। তারপর বললো, ‘একটা ভাঁড়, কে তার সাথে তর্ক করতে যায়।’

কথা বলতে গিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গলায় বেধে গেল, বিষম খেলো

চ্যারিটি উডস্টক। থক্ থক্ করে কাশতে শুরু করলো সে। জিল ক্যাসল মুখ তুলে তাকালো, এবং তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। হঠাৎই আবিষ্কার করলো সে, চ্যারিটি উডস্টক সেই নতুন ব্রা-টা পরেনি আজ। না, কোনো ব্রেসিয়ারই পরেনি! অদ্ভুত তো! কিন্তু কেন?

জিল ক্যাসেল মহা সমস্যায় পড়ে গেল।

উইচিটা থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে এসে হোটেল শেরাটনে উঠেছে ওরা। চারটে হোটেলে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর শেরাটনে তিনতলায় একটা ডাবল রুম পাওয়া গেল, অন্তত দশ তলার নিচে কোনো রুম খালি নেই। এলিভেটর-ভীতি এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি লিলি, রানাকে সে জানালো তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভাঙতে তার কোনো অসুবিধে হবে না।

আজ সকালে একবার বেরিয়েছিল ওরা, টুকটাক কেনাকাটা সেরে হোটেলে ফিরে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের রেস্টোরঁয় লাঞ্চ খেয়েছে। তারপর প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমোবার উদ্দেশ্য নিয়ে বিছানায় ছিলো। ঘুম হয়নি, সেজগে পরস্পরকে দোষারোপ করেছে ওরা।

সন্ধ্যার পর আবার বেরিয়েছে, ডিনার খেয়ে তারপর ফিরবে হোটেলে।

ন'টা পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করলো ওরা। কখনো ট্যাক্সি নিলো, কখনো হাত ধরাধরি করে পার্কের ভেতর হাঁটলো। মাঝখানে দু'বার ছোটোবারে ঢুকে বিয়ার খেলো। আর্ট গ্যালারি আর সিটি মিউজিয়ামেও ঢুঁ মারলো একবার করে। রানা কিছু বলেনি, তবে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না লিলির—রানা আসলে

পরীক্ষা করছে পিছনে ফেউ আছে কিনা।

ন'টায় হ্যাপি ম্যান-এ ঢুকলো ওরা। নামকরা অভিজাত বার আর রেস্টোরঁ। ঠিক সময়ে এসেছে ওরা, টেবিলগুলো প্রায় খালি পেলো। সন্ধ্যা থেকে আটটা সাড়ে-আটটা পর্যন্ত প্রচণ্ড ভিড় থাকে। ধীরেস্থস্থে ডিনার খেলো ওরা। দশটার দিকে গরম আবহাওয়ায় বেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'এফ. বি. আই.-এর কাউকে চেনো নাকি?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামালো লিলি। 'না। কেন?'

রাস্তার বাঁক পর্যন্ত হেঁটে এলো ওরা, রাস্তার ওপারে সারি সারি আলোকিত কনসার্ট আর থিয়েটার হল। ব্রডওয়ের দিকে এগোলো দু'জন। আধাআধি রাস্তা পেরিয়ে মেট্রোপলিটান অপেরা হাউসের সামনে একবার থামলো রানা, মাথা নাড়লো। 'আসলে ঠিক এফ. বি. আই. টাইপের এজেন্টকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না, আমাদের দরকার একজন অসৎ পুলিশ। লোভী, কিন্তু খুব বেশি চতুর নয়। রাস্তায় টহল দেয় না, অফিসে বসে কাজ করে।'

'আজ সকালে বুঝি সে-নির্দেশই পেয়েছো রেডিওতে?'

'ওদের তো বলার কথা একটাই, তাড়াতাড়ি করো! ডিকোডিং করার সময় তোমাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু মনে করোনি তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা। 'আসলে...।'

'নিয়ম নিয়মই, জানি,' নিলিপ্ত কণ্ঠে বললো লিলি।

'ঠিক।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'কেন একজন অসৎ পুলিশ দরকার আমাদের? কারণ ম্যানিয়াক-টাকে খুঁজে বের করতে হলে বড় ধরনের ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের

সাহায্য নিতে হবে। কাউকে খুঁজে বের করতে পুলিশ বিভাগের জুড়ি নেই। সংখ্যায় ওরা কয়েক লাখ, তাই না? তাছাড়া, পুলিশ বিভাগের সাথে এফ. বি. আই.-এরও যোগাযোগ আছে। এফ. বি. আই. টেলিপ্রিন্টার নেটওয়ার্ক পুলিশ বিভাগও ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ ভালো একজন অসৎ পুলিশ সাহায্য করলে আমরা আসলে গোটা পুলিশ বিভাগ আর এফ. বি. আই.-এরও সাহায্য পাবো। আমাদের হয়েকয়েক লাখ চোখ ডালচিমস্কিকে খুঁজতে শুরু করবে।’

‘আইডিয়াটা মন্দ নয়,’ বললো লিলি। ‘কিন্তু বিপদের দিকটা ভেবে দেখেছো? ওদের টেলিপ্রিন্টার সার্কিটের মাধ্যমে সারা দেশে ডালচিমস্কির ফটো প্রচার করতে চাইছো তুমি, তাই না?’

চিন্তিতভাবে লিলির দিকে তাকালো রানা। ধীর পায়ে কলম্বাস সার্কেলের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

‘গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে আমাকে জানানো হয়নি,’ বললো লিলি। ‘তবে ধারণা করি, ডালচিমস্কি বিপজ্জনক লোক, এবং তার কাছে মহামূল্যবান কিছু রয়েছে। আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, ছুনিয়ার সবাইকে তার কথা জানিয়ে দেয়ার খুঁকি কিভাবে তুমি নিতে চাও? অসৎ পুলিশ সন্দেহ করবে না, কেন তুমি এই লোককে খুঁজছো?’

মাথা নাড়লো রানা। ‘সেজন্যই তো বললাম, লোভী হোক, কিন্তু খুব বেশি চতুর হলে চলবে না। ভালো অর্থে আমি বোঝাতে চেয়েছি, অসৎ হলেও চুক্তি মেনে চলে। বেশি দর হাঁকতে পারে, কিন্তু সব ফাঁস করে দেয়ার হুমকি দেয় না। তবে এ-কথা ঠিক যে এ-ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত।’

‘আর খুঁজে যদি পাও-ও, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে কিছু টাকাই শুধু  
শান্তিদত্ত-১

গচ্ছ। গেছে, কাজ কিছুই হয়নি। আমার তো মনে হচ্ছে এভাবে এগোলে অ্যাসাইনমেন্টটাও কেঁচে যেতে পারে।’

ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পেরোবার জন্তে কয়েক পা এগোলো রানা, তারপর কি মনে করে পিছিয়ে এসে আবার ফুটপাথে উঠলো।

‘পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারি?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘এখন পর্যন্ত শূন্য,’ হাসি চেপে বললো রানা। ‘কেউ আমাদের ফলো করছে না।’

‘একটু যেন নিরাশ হয়েছো?’

উত্তর না দিয়ে লিলির কাঁধ ধরলো রানা, কাছে টেনে চুমো খেলো ঠোঁটে।

‘এ-সব কি!’ অবাক হলো লিলি।

‘বেহারার মতো কিছু না করলে লোকে আমাদের আমেরিকান না-ও ভাবতে পারে,’ নিচু গলায় বললো রানা। ‘নিরাশ, লিলি? না, এখনো হইনি। এই, শোনো, আমার একটা কাজ আছে—ঘণ্টাখানেক পর ফিরবো। তুমি রেস্টোরায় ফিরে যাও, আমার জন্তে অপেক্ষা করো ওখানে।’

‘কি কাজ? কি বলছো? কোন্ রেস্টোরায় ফিরবো?’

‘আমাদের হোটেলের রেস্টোরায়,’ বললো রানা। ‘শেরাটনের ওয়াউও ফ্লোরে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে ওখানে।’

‘বেশ, বুঝলাম। কিন্তু তুমি?’

‘বললাম না, একটা কাজ আছে।’ খালি একটা ট্যান্ডি আসতে দেখে হাত তুললো রানা। ‘কি কাজ পরে শুনো। এখন যাও তো। কি বলেছি মনে আছে?’

ম্মান চেহারা নিয়ে ট্যাঙ্কিতে চড়লো লিলি। ‘সাবধানে থেকো,’ বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা পাবলিক টেলিফোন বুদ্ধের সামনে থামলো রানা। ভেতরে ঢুকে খুঁচরো পয়সা বের করলো পকেট থেকে। ডায়াল করলো ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সে।

কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে ডিসি-এইট কাল সকাল সোয়া এগারোটায় টেক-অফ করবে। নন-স্টপ ফ্লাইট, লাস ভেগাসে পৌঁছতে সময় নেবে পাঁচ ঘণ্টা। প্রতিটি ফাস্ট ব্রাস টিকেটের দাম পাঁচশো সতেরো ডলার। ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় আপনমনে হাসলো রানা—যার কাঁধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব চাপানো হয়েছে তার ইকোনমি বা সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ করা সাজে না।

ফোন বুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলো রানা। এক ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরবে ও, কিন্তু হাতে কোনো কাজ নেই।

রানা জানে না, ঠিক ওই সময় অন্য এক শহরে পরবর্তী টার্গেটের কথা ভাবছে ডালচিমস্কি।

রানা আরো জানে না, আবার তাকে খুন করার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে অপেক্ষা করছে গ্রু-র তৃতীয় দলটা। তারা এই ভেবে পুলকিত যে আজ মাসুদ রানার রক্ষা নেই। এবারের ফাঁদে পা তাকে দিতেই হবে।

( আগামী খণ্ডে সমাপ্য। )



## বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক, বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

---

আগামী বই

ওয়েস্টার্ন-৪৫

বাথান-২

রচনা : রওশন জামিল

বিষয় : রহস্যের জট খুলে এনেছে কটেয়, এসময় ওকেই ফাঁসিয়ে দিল শত্রুপক্ষ। লোকজন খুঁজছে ওকে...



মাসুদ রানা-১৪৯

হুইপাণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

## শান্তিদূত-১

### কাজী আনোয়ার হোসেন

একশো ছত্রিশজন ডীপ কাভার রাশান এজেন্ট  
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে।

তারা জানেও না যে তারা বিদেশী এজেন্ট,  
সম্মোহনের মাধ্যমে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে সব।

যদি কখনও চরম সঙ্কট দেখা দেয়  
টেলিফোনের মাধ্যমে ওদের একটা কোডেড মেসেজ দি  
ভয়ঙ্কর দানব হয়ে উঠবে একেকজন—  
মেতে উঠবে মারাত্মক ধ্বংসলীলায়।

কিন্তু এই মুহূর্তে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে,  
হুই পরাশক্তিই সম্ভাব বজায় রেখে  
পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।  
আশাবাদী হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসী।

এমনি সময়ে টেলিফোন আসতে শুরু করলো  
একের পর এক ডীপ কাভার এজেন্টের কাছে।  
এ নিশ্চয়ই উন্মাদ ডালচিমস্কির কাজ।



সেবা বই  
প্রিয় বই  
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০  
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০



RIZON

মাসুদ রানা

# শান্তিদূত ২

কাজী আনোয়ার হোসেন



ANIK





## এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় \* ভারত-নাট্যম \* স্বর্ণমৃগ \* দুঃসাহসিক  
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা \* দুর্গম দুর্গ \* শত্রু ভয়ঙ্কর \* সাগর-সঙ্গম-১,২  
রানা ! সাবধান !! \* বিস্মরণ \* রত্নদ্বীপ \* নীল আতঙ্ক-১,২  
কায়রো \* মৃত্যুপ্রহর \* গুপ্তচক্র \* মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র  
রাত্রি অন্ধকার \* জাল \* অটল সিংহাসন \* মৃত্যুর ঠিকানা  
ক্ষাপা নর্তক \* শয়তানের দূত \* এখনো ষড়যন্ত্র \* প্রমাণ কই ?  
বিপদজনক-১, ২ \* রক্তের রঙ-১, ২ \* অদৃশ্য শত্রু \* পিশাচ দ্বীপ  
বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ \* ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ \* গুপ্তহত্যা  
তিনশত্রু \* অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ \* সতর্ক শয়তান \* নীলছবি-১,২  
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ \* পাগল বৈজ্ঞানিক \* এসপিওনাজ-১, ২  
লাল পাহাড় \* হৃৎকম্পন \* প্রতিহিংসা-১, ২ \* হংকং সত্ৰাট-১,২  
কুউউ ! \* বিদায় রানা-১, ২, ৩ \* প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ \* আক্রমণ-১,২  
গ্রাস-১, ২ \* স্বর্ণতরী-১, ২ \* পপি \* জিপসী-১, ২  
আমিই রানা-১, ২ \* সেই উ-সেন-১, ২ \* হ্যালো, সোহানা-১,২  
হাইজ্যাক-১, ২ \* আই লাভ ইউ, ম্যান-১,২,৩ \* সাগর কণ্ঠা-১,২  
পালাবে কোথায়-১,২ \* টার্গেট নাইন-১,২ \* বিষ নিঃশ্বাস-১,২  
প্রেতাশ্বা-১, ২ \* বন্দী গগল \* জিম্মি \* তুষার যাত্রা-১, ২  
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ \* সন্ন্যাসিনী \* পাশের কামরা  
নিরাপদ কারাগার-১, ২ \* স্বর্গরাজ্য-১, ২ \* উদ্ধার-১, ২  
হামলা-১, ২ \* প্রতিশোধ-১, ২ \* মেজর রাহাত-১, ২  
লেনিনগ্রাদ-১, ২ \* অ্যামবুশ-১, ২ \* আরেক বারমুড়া-১,২  
বেনামী বন্দর-১, ২ \* নকল রানা-১, ২ \* রিপোর্টার-১,২  
মরুযাত্রা-১, ২ \* বন্ধু \* সংকেত-১, ২, ৩ \* স্পর্ধা-১,২  
চ্যালেঞ্জ \* শত্রুপক্ষ \* চারিদিকে শত্রু-১, ২ \* অগ্নিপুরুষ-১,২  
অন্ধকারে চিতা-১, ২ \* মরণকামড়-১, ২ \* মরণখেলা-১, ২  
অপহরণ-১, ২ \* আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ \* বিপর্যাস-১, ২



## শান্তিদূত-২

---

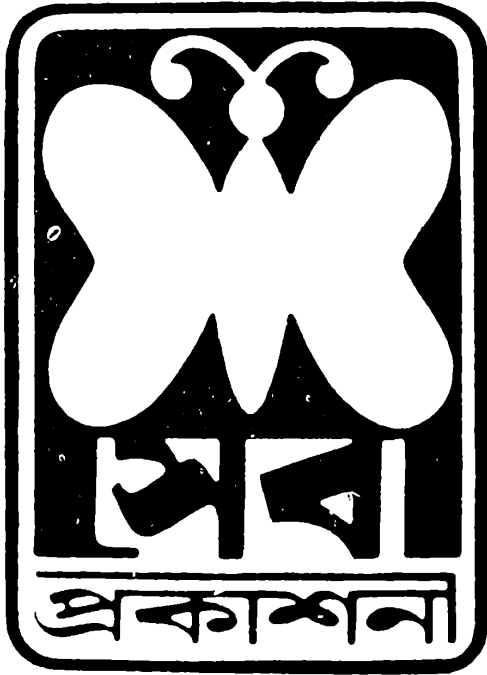
দুইখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস  
সিরিজের অগ্ন্যাগ্ন বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

---

**কাজী আনোয়ার হোসেন**

---

রানা-১৫০



প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণে :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুন বাগিচা,

ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালাপন ৪০৫৩৩২

জি. পি. ও. বক্স নং-৮৫০

শো-রুম :

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHANTIDOOT-2

By : Qazi Anwar Husain

Masud Rana-150

# আসুদ বান্দা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের  
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই  
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে ।  
বিচিত্র তার জীবন । অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি ।  
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর ।  
একা ।  
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না ।  
কোথাও অত্যাচার অবিচার দেখলে  
রুখে দাঁড়ায় ।  
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়  
আর মৃত্যুর হাতছানি ।  
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে  
পরিচিত হই ।  
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে  
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের  
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে ।  
আপনি আমন্ত্রিত ।  
ধন্যবাদ ।



---

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক  
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে  
এর কোনও সম্পর্ক নেই ।

॥ লেখক ॥

## পূর্বাভাস

ছোট্ট একটা ভুল থেকে ঘটনার সূত্রপাত, অনেকটা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার মতো। মস্কো পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেলো, গোকি স্ট্রিটের একটা বাড়িতে সন্দেহজনক এক লোক বাস করে, লোকটা নাকি ব্ল্যাকমার্কেট অপারেশনের সাথে জড়িত। একজন টেকনিশিয়ানকে পাঠানো হলো লোকটার টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করার জন্যে। টেকনিশিয়ান যন্ত্র ফিট করলো ঠিকই, কিন্তু পাশের বিল্ডিংয়ের অন্য এক লাইনে। প্রথম এক হপ্তা কিছুই শোনা গেল না, তারপর একদিন পরপর দু'বার অদ্ভুত কিছু কথাবার্তা শোনা গেল। দু'বারই 'দাগী আসামী' নামটা উচ্চারণ করা হলো। পরের হপ্তার গোড়ার দিকে আরো কিছু কথা শোনা গেল, বেশির-ভাগই দুর্বোধ্য। পুলিশ কর্মকর্তারা বুঝলেন, সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। সময় নষ্ট না করে গোটা ব্যাপারটা কে. জি. বি. সদর দফতরকে জানালেন তাঁরা।

জোসেফ স্ট্যালিনের যুগ অনেক আগেই গত হয়েছে। রাশিয়ার পরবর্তী নেতৃবৃন্দ তাঁকে ভ্রান্ত, নিষ্ঠুর, ক্ষমতালিপ্সু ইত্যাদি বলে নিন্দা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্ট্যালিনপন্থী বা স্ট্যালিনের ভক্ত বলে পরিচিত যারা প্রশাসন, ইন্টেলিজেন্স, এবং সেনাবাহিনীতে শান্তিদূত-২

ছিলো। তাদের সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়। স্ট্যালিনের দোসর ছিলো, এই অভিযোগে অনেক অফিসারকে সাজাও দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও স্ট্যালিনপন্থীদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। গত কয়েক যুগ ধরে মাঝে মাঝেই তারা বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছে, ফিরে পেতে চেয়েছে আগের সম্মানজনক পদ, কখনো বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দখল করতে চেয়েছে ক্ষমতা। কিন্তু প্রতিবারই তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। একটা করে বিদ্রোহ হয়, সেই সাথে কিছু স্ট্যালিনপন্থীর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে, এভাবে তাদের সংখ্যা দিনে দিনে কমতে থাকে। সংখ্যায় কম হলেও, এখনো তারা সবখানে আছে, আরেকটা বিদ্রোহ না হলে তাদের সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। তবে কিছু কিছু লোককে স্ট্যালিনপন্থী বলে সন্দেহ করা হয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন রেড আর্মি-র মার্শাল লিউ ওনায়েভ। রেড আর্মিতে তাঁর অসামান্য প্রভাব রয়েছে। স্ট্যালিনপন্থী বলে সন্দেহ করা হলেও, আজ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। রেড আর্মির কিছু অফিসার তাঁর আড়ালে তাঁকে ‘দাগী আসামী’ বলে সম্বোধন করে থাকেন।

ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্বের সাথে নিলো কে. জি. বি.। গোর্কি স্ট্রীটের টেলিফোন মালিক দিমিত্রি ট্রুশেনকো-কে গ্রেফতার করার জন্যে বাড়িটাকে ঘেরাও করা হলো। গ্রেফতার এড়াবার জন্যে কে. জি. বি. এজেন্টদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো ট্রুশেনকো। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেল একজন কর-পোরাল। গ্রেফতার হবার আগে সুইসাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্ম-হত্যার চেষ্টা করলো ট্রুশেনকো, কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো।



তল্লাশী চালিয়ে তার কামরা থেকে পাওয়া গেল ছাব্বিশ হাজার রাউণ্ড অ্যামুনিশন, আঠারো বাক্স গ্রেনেড আর এক্সপ্লোসিভ, তিনজোড়া বাজুকা, আঠারোটা অটোমেটিক রাইফেল, নয়টা লেটেস্ট মডেল রেড আর্মি নাইপার রাইফেল—নাইট স্কোপ সহ।

কে. জি. বি.-র ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল আনাতোলি বিকারেন ট্রুশেনকোকে নির্যাতন এড়িয়ে যাবার একটা সুযোগ দিলেন, কিন্তু মুখ খুলতে রাজি হলো না ট্রুশেনকো। অগত্যা ইন্টারোগেশন টিমের হাতে তুলে দেয়া হলো তাকে। একই সময় ট্রুশেনকোর পরিচয় পত্র সহ অন্যান্য কাগজ পাঠিয়ে দেয়া হলো ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কি-র কাছে, ওগুলো জাল কিনা পরীক্ষা করে দেখবে সে।

নিকোলাই ডালচিমস্কি আক্ষরিক অর্থেই একটা বদ চরিত্র। তার শরীরের কাঠামো চৌকো একটা দরজার মতো, ছয় ফিট লম্বা। ক্লৈদান্ত, নোংরা পারিবারিক পরিবেশে বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে তার। বাপের দেখাদেখি সেই ছোটোবেলা থেকেই মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে। জ্ঞান হবার পর উপলব্ধি করে, তার ভেতর মানবিক গুণাবলী খুব কমই আছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে হিংস্র পশুশক্তি। সজ্ঞানে মূর্তিমান শয়তান হয়ে ওঠে ডালচিমস্কি। মেয়েরা তার শরীর আর চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়, নোংরা যৌন-বিকৃতি চরিতার্থের জন্যে তাদের ব্যবহার করে সে।

দিমিত্রি ট্রুশেনকোর কাগজ-পত্র পরীক্ষা করার দরকার ছিলো না, ডালচিমস্কি আগে থেকেই জানতো, ওগুলো সব জাল। স্ট্যালিনপন্থীরা সত্যি সত্যি একটা বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, তাতে ডালচিমস্কিরও একটা ভূমিকা ছিলো। ট্রুশেনকো ধরা পড়ায়

সে বুঝতে পারে, তারও সুদিন ফুরিয়েছে। প্রাণে বাঁচতে হলে রাশিয়া ছেড়ে পালাতে হবে। আর গেলে মুক্তবিশ্বের স্বর্গ, অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই যেতে হয়। কিন্তু খালি হাতে যায় কি করে!

গুরুত্বপূর্ণ দুটো জিনিস সাথে করে নিয়ে গেল ডালচিমস্কি। ব্রাসেলস এ কে. জি. বি.-র একটা ব্যাংক আছে, ব্যাংকের সিকিউরিটি সিস্টেমের নকশা চুরি করলো সে। আর যেটা নিলো, সেটার সাহায্যে যে-কোনো লোক তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। জিনিসটা তেমন কিছু নয়, ছোট্ট একটা নোটবুক। মাত্র কয়েক ব্যক্তি এই নোটবুকের কথা জানেন—রেড আর্মি-র চীফ অভ স্টাফ, প্রিমিয়ার, কে. জি. বি. ডিরেক্টর, কে. জি. বি. ডেপুটি ডিরেক্টর, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স (গ্রু) চীফ এবং আরো ছ'একজন। তাঁরা ওটাকে টেলি-বম বুক হিসেবে চেনেন।

দিমিত্রি ট্রুশেনকো একানব্বই ঘণ্টা নির্যাতন সহ্য করার পর মুখ খুললো। কর্নেল বিকারেন যেমন সন্দেহ করেছিলেন, স্ট্যালিনপন্থীদের বড়সড় একটা সুশৃংখল দল ষড়যন্ত্র করেছিল। চারশোরও বেশি সরকারী এবং সশস্ত্রবাহিনীর লোক জড়িত। তাদের মধ্যে আবার অর্ধেকের কিছু কম কে. জি. বি.-র লোক—কেউ কেউ এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বিদেশে রয়েছে। কিন্তু বন্দী ট্রুশেনকো সবার নাম জানে না। মাত্র তেরো জনের নাম বলেছে সে।

এই তেরো জনের মধ্যে নিকোলাই ডালচিমস্কির নামও রয়েছে। রয়েছে মার্শাল ওনায়েভের নাম। তেরো জনের একজন বাদে সবাইকে পরবর্তী পাঁচ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হলো, তাদের মধ্যে নেই শুধু নিকোলাই ডালচিমস্কি।

এরপর মাসখানেক গোটা সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে ব্যাপক ধর-

পাকড় চললো। শুধু দেশের মাটিতেই গ্রেফতার করা হলো। তিনশো বিয়াল্লিশজনকে। নয় জন ধরা দিলো না, আত্মহত্যা করে হাত ফস্কে গেল। বিদেশ থেকে আটক করে দেশে পাঠানো হলো আঠারো জনকে, বাষট্টিজন নিখোঁজ থাকলো। এতো বড় সাফল্য সত্ত্বেও কে. জি. বি. কর্মকর্তারা খুশি হতে পারলেন না। খুশি অবশ্য না হবারই কথা তাঁদের। মুখে না বললেও, মনে মনে তাঁরা সবাই জানেন, কে. জি. বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

গোপনে বিচার হলো অপরাধীদের। দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো সবাই। বলাই বাহুল্য, একজনকেও ক্ষমা করা হলো না। জেরার মুখে এরাই স্বীকার করেছে, শতাধিক সিনিয়র সরকারী অফিসার, প্রিমিয়ার, এবং জেনারেল সেক্রেটারী, সেই সাথে নয় জন পলিটব্যুরো সদস্যকে খুন করার প্ল্যান করেছিল তারা।

মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হলো নিপুণ কৌশলে। এখানে বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, এবং দক্ষতার পরিচয় দিলেন কর্নেল বিকারেন। অফিশিয়াল গেজেটে প্রকাশ না পেলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে মূল্যবান খেতাবে ভূষিত করা হলো তাঁকে। পিঠ চাপড়ে দিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি, কে. জি. বি. ডিরেক্টর, তাঁর স্নেহভাজন ডেপুটিকে বললেন, ‘ভাগ্যিস এ-ধরনের একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল! আমার পদটা পেতে তোমার সামনে আর কোনো বাধা থাকলো না।’

কিন্তু সদাহাস্যময় কর্নেলের চেহারা থেকে হাসি যেন চির বিদায় নিয়েছে। বিষণ্ণ চোখ তুলে তিনি শুধু বললেন, ‘আমি যে কতোখানি ব্যর্থ, আপনার চেয়ে ভালো বেউ তা জানে না। কে. জি. বি.-র কাকে আমি বিশ্বাস করবো বলতে পারেন? কি করে জানবো কে

বেঈমান নয় ?’

ডেপুটিকে আলিঙ্গন করে জেনারেল কায়কোভস্কি বললেন, ‘হ্যাঁ, কে. জি. বি.-কে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের। অবসর নেয়ার আগে যতোটুকু পারি তোমাকে আমি সাহায্য করবো।’

মার্শাল ওনায়েভ সহ ষড়যন্ত্রকারীদের আরো এগারোজন সিনিয়র সদস্য নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট বিস্ফোরণে কৃষ্ণ সাগরে মারা গেলেন। বাকিরা কেউ মারা গেল সড়ক দুর্ঘটনায় বা অগ্নিকাণ্ডে, কেউ হার্ট অ্যাটাকে। সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেল ট্রেন দুর্ঘটনায়, বেড়শোর মতো। দুর্ঘটনাগুলো রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘটলো, প্রচুর সময়ের ব্যবধানে, এবং সবগুলোর খবর সংবাদপত্রে প্রকাশও পেলো না।

কিন্তু মার্কিন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে একটা আলোড়ন উঠলো। সি. আই. এ.-র একজন অ্যানালিস্ট. স্বর্ণকেশী এক মহিলা, কমপিউটার সায়েন্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলো, তার চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। গত মাসে রাশিয়ার মৃত্যু হার এতো বেশি কেন, এই প্রশ্ন বিচলিত করে তুললো তাকে। তার নাম চারিটি উডস্টক, পাঁচ ফিট লম্বা, একহারা, সারা মুখে খয়েরি তিল। বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিলো সে। এবং রিপোর্ট-টা তার বস কর্নেল জিল ক্যাসেলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলো সি. আই. এ.-র সোভিয়েত অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে।

এই সময় কে. জি. বি. সদর দফতরে খবর এলো, তাদের ব্রাসেলস ব্যাংকে ডাকাতি হয়েছে। কে বা কারা যেন ব্যাংকের ভেতর রাতের বেলা ঢুকে পড়ে, দু’জন গার্ডকে গুলি করে মারে, অ্যালার্ম সিস্টেম অকেজো করে দেয়, তারপর ডাকাতি করে নিয়ে

যায় তিন লাখ নিরানব্বই হাজার ডলার । আরো বড় অংকের ফ্রাঙ্ক, মার্ক, পাউণ্ড ছিলো, কিন্তু সে-সবে হাত দেয়া হয়নি ।

কেন ?

ব্যাপারটা নিয়ে জেনারেল কায়কোভস্কি তাঁর ডেপুটির সাথে আলাপ করার সুযোগ পেলেন না, কারণ কর্নেল বিকারেন তখন স্ট্যালিনপন্থী অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্যে কৃষ্ণ সাগরে রয়েছেন । পয়লা জুনের আগে তিনি ফিরবেন না ।

পয়লা জুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এলিস খেলার নামে এক লোক উন্মাদ হয়ে গেল । খেলার অটো রিপেয়ার কোম্পানী তার নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান । লোকটা নিরীহ, ভদ্র, ধার্মিক । নিয়মিত ট্যাক্স দেয় । গরীব মানুষদের সাহায্য করে । পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চ মুখ । সেই এলিস খেলার সেদিন কাঁটায় কাঁটায় ছোটো পঁচিশ মিনিটে একটা ফোন কল পেলো, রিসিভার নামিয়ে রেখে কেমন যেনঘোলা চোখে চারদিকে একবার তাকালো, তারপর পুরনো একটা গ্যারেজ থেকে নীল ডব্লু প্যানেল-ট্রাক বের করে বেরিয়ে পড়লো—কোথায় যাচ্ছে মেকানিকদের কাউকে কিছু বললো না । এই ট্রাকটা অনেক দিন থেকে ছিলো গ্যারেজে, কাউকে ছুঁতে দিতো না খেলার, চাবিটা সব সময় নিজের কাছে রাখতো ।

শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ইউ. এস. আর্মি কেমিক্যাল বেস, সরাসরি সেখানে চলে যায় খেলার । গেটে তাকে বাধা দেয়া হয়, পকেট থেকে সেভেন-মিলিমিটার পিস্তল বের করে সরাসরি সেক্ট্রির মাথায় গুলি করে সে । কয়েক সেকেন্ড পর আরো দু'জন গার্ডকে খুন করে খেলার । এরপর সোজা রাস্তা ধরে দেড় মাইল ট্রাক চালিয়ে চলে আসে বিন্ডিং এম পর্যন্ত । চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ

দিয়ে নামে সে। গাড়িটা সবগে গিয়ে ধাক্কা খায় জানালাবিহীন ওয়ারহাউসে। পরমুহূর্তে যে বিস্ফোরণ ঘটে তা থেকে আন্দাজ করা চলে ট্রাকটায় হাই এক্সপ্লোসিভ ঠাসা ছিলো। পালাতে চেষ্টা করে খেলার, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মিলিটারী পুলিশ তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। এম বিল্ডিং মাত্র তিন হপ্তা আগে পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল এজেন্টের ডিপো ছিলো, কিন্তু সে-প্রসঙ্গে কেমিক্যাল করপোরেশনের প্রেস রিলিজে একটা শব্দও উচ্চারণ করা হলো না।

খবরটা পৌঁছে গেল মস্কায়।

বিশ তারিখে আরো একটা ঘটনা ঘটলো। এ-ও আমেরিকায়। লিজা'স বৃদের মালিক, লিজা আইভারসন, চল্লিশোবর্ষ এক মহিলা, হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল। সে-ও একটা টেলিফোন কল পাবার পরপরই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সোজা ব্যাংকে আসে মহিলা, সেফটি-ডিপোজিট বক্স থেকে একটা প্যাকেট বের করে। নিউ ইয়র্কে আসার পর থেকে ডিপোজিট বক্সটা ভাড়া নেয়া ছিলো তার, বারো বছর ধরে। এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে যায় লিজা আইভারসন। তারপর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

সেদিনই ওই এলাকার জেট ফাইটার বেসে আগুন লাগে। ফলে বেসের প্রায় সবটুকু ফুয়েল পুড়ে যায়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে উত্তর-পূর্ব আমেরিকার ওপর শত্রু বিমান হানা দেয়ার কোনো হুমকি সেদিন বা পরবর্তী তিন দিন ছিলো না। চার চারটে দিন আমেরিকার বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সাময়িক একটা ফুটো তৈরি হয়েছিল—মহামূল্যবান ছাতায় সাময়িক ছোট্ট একটা ফুটো—তারপর চব্বিশ তারিখ বিকেলে ফুয়েল ট্রাক পৌঁছে গেলে সমস্ত উদ্বেগের অবসান ঘটে। জেট ফাইটার বেস থেকে খুব বেশি দূরে

নয়, সরু একটা গলিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল লিজা আইভারসনের গাড়িটা। কিন্তু আগুন লাগার সাথে লিজা আইভারসনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটা কেউই এক করে দেখলো না।

স্যাবোটাজের তৃতীয় ঘটনাটা ঘটলো অগাস্টা থেকে কমবেশি দু'হাজার মাইল দূরে, লাক দু ফ্ল্যামবিউ-এ। সেই আমেরিকাতেই।

মস্কো থেকে নিকোলাই ডালচিমস্কি নিখোঁজ হবার পর ডকুমেন্ট 'অডিট' করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কর্নেল বিকারেন। সর্বশেষ আইটেমগুলোর সর্বশেষ তালিকা চেক করা হয়েছে। না, সব ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি। ভন্টে বেশ ক'টা ডকুমেন্ট নেই। তার মধ্যে একটা হলো টেলি-বম বুক।

আতকে উঠলেন কে. জি. বি. কর্মকর্তারা। আমেরিকায় স্যাবোটাজের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে গেল। ডালচিমস্কি কি করতে চাইছে বুঝতে পেরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন তাঁরা। বুঝতে পারলেন, ডালচিমস্কি এখন দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ। ইচ্ছে করলেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে সে।

কে. জি. বি. প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এটা উপলব্ধি করেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সাথে প্রাথমিক আলাপটা সেরে রেখেছিলেন মেজর জেনারেল কায়কোভস্কি। বলেছিলেন, বি. সি. আই.-এর অন্যতম এজেন্ট মাসুদ রানার সাহায্য তাদের দরকার হতে পারে। তবে বন্ধু কায়কোভস্কিকে রাহাত খান কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি।

টেলি-বম বুক নিয়ে ডালচিমস্কি আমেরিকায় পালিয়ে গেছে, এবং একের পর এক মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে,

এটা পরিস্কার হয়ে যাবার পর রাহাত খানের সাথে আবার যোগা-যোগ করলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। জানালেন, মাসুদ রানার সাহায্য সত্যি তাঁদের দরকার। কিন্তু রাহাত খান এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। তখন জেনারেল কায়কোভস্কি রেগে গিয়ে এমন কিছু কথা বললেন, রাহাত খানের আর এড়িয়ে যাবার উপায় থাকলো না। কে. জি. বি. চীফ বললেন, ‘ক’দিন আগে কে. জি. বি.-র মতো একই বিপদে পড়েছিল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, অনুরোধ পাবার সাথে সাথে তাদের তোমরা সাহায্য করেছো। আপদে-বিপদে সি. আই. এ.-কেও তোমরা সাহায্য করো। যতো ওজর-আপত্তি শুধু কে. জি. বি.-র বেলায়?’ তারপর তিনি আবেগের সাথে জানতে চাইলেন, ‘একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে কে তোমাদের সাহায্য করেছিল?’

রাহাত খানকে রাজি করাতে পারলেও জেনারেল কায়কোভস্কির সামনে আরো দুটো বাধা ছিলো। তিনি জানতেন কে. জি. বি.-র পদস্থ অফিসাররা রানার সাহায্য নিতে রাজি হবে না। ওদেরকে কৌশলে রাজি করাতে হবে। সে-কাজটাও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সারলেন। শেষ বাধাটা ছিলো মাসুদ রানা স্বয়ং। ও কি সাহায্য করতে রাজি হবে?

রাহাত খানের নির্দেশে মস্কো এসে পৌঁছুলো রানা। জেনারেল কায়কোভস্কি এবং কর্নেল বিকারেন, দু’জন মিলে সমস্যাটা ব্যাখ্যা করলেন।

কাজটায় হাত দেয়া হয় আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে। ধারণাটা অবশ্য আরো অনেক পুরনো। তখন মনে হয়েছিল আমেরিকার সাথে রাশিয়ার একটা যুদ্ধ বোধহয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমেরিকার অস্ত্রসজ্জা আর উস্কানিমূলক কথাবার্তা শুনে মনে হতো,



যে-কোনো দিন রাশিয়া আক্রান্ত হতে পারে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে একটা স্যাবোটাজ টিম গঠনের বুদ্ধি আসে কর্নেল বিকারেনের মাথায়। এমন একটা স্যাবোটাজ টিম, সদস্য সংখ্যা একশো থেকে দেড়শোর বেশি হবে না, কিন্তু নির্দেশ পেলে তারা গোটা আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলো রাতারাতি ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রাখবে। অবশ্যই তারা ডীপ-কাভার এজেন্ট হবে, কিন্তু তাদের পরিচয় ফাঁস হবার কোনো সুযোগই থাকবে না। এমনকি তারা নিজেরাও জানবে না যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের ডীপ-কাভার এজেন্ট। সব শুনে পুলকিত হলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। সাথে সাথে তিনি উপলব্ধি করলেন আইডিয়াটা শুধু চমকপ্রদ নয়, নিশ্চিহ্নও বটে। এরপর মাসের পর মাস ধরে চললো প্রজেক্টের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ। মনোচিকিৎসক, হিপনোটিস্টদের সাথে পরামর্শ করা হলো। ট্রেনিং দেয়ার জন্যে বাছাই করা হলো চারশো লোককে।

চালাচালি করে তাদের মধ্যে থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হলো একশো ছত্রিশজনকে। এরা কেউ ইংরেজী জানতো না, জীবনে কখনো আমেরিকায় যায়নি। প্রথম পর্যায়ে ট্রেনিং এদেরকে শেখানো হয়েছিল আন-আর্মড কমব্যাট, জুডো, কারাতে, গেরিলা ফাইটিং, স্যাবোটাজ কৌশল, ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত ট্রেনিং-এর আগে একশো ছত্রিশজনকে সম্মোহিত করা হলো। হিপনোটিসিসের সাহায্যে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, জাতীয়তা, পরিচয়, নাম-ঠিকানা, পেশা, সব বদলে দেয়া হলো। নিজেদের তারা সত্যি সত্যি আমেরিকান নাগরিক বলে বিশ্বাস করলো, সমস্ত দিক থেকে হয়েও উঠলো নির্ভেজাল আমেরিকান। সম্মোহিত অবস্থাতেই একটা সংকেত গঁথে দেয়া

হলো। তাদের মগজে, টেলিফোনে সেই সংকেত পেলে কি করতে হবে তা-ও সুপ্ত অবস্থায় থাকলো মনের ভেতর।

এরপর একে একে আমেরিকায় অনুপ্রবেশ করলো তারা। এক একজন এক একটা রাজ্যের বিশেষ একটা এলাকায় ঠাই করে নিলো, এবং যে যার এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও গেল না। ধীরে ধীরে এলাকার একজন হয়ে উঠলো সে, চাকরি নিলো বা ব্যবসা শুরু করলো, বিয়েও করলো কেউ কেউ। সম্মোহিত অবস্থায় প্রত্যেকে আলাদা আলাদা পেশাগত ট্রেনিং পেয়েছিল, ফলে যে যার পেশায় দ্রুত উন্নতি করলো তারা। অতিরিক্ত মদ্য পান, লাম্পট্য, নীচ আচরণ, লোভ, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে সাজেশন দেয়া হয়েছিল, ফলে মানুষ হিসেবে যে যার এলাকায় সুনাম অর্জন করলো সবাই।

যে যার ঠাইয়ে পৌঁছে যাবার এক বছর পর ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর জানিয়ে প্রত্যেকে তারা মেক্সিকো আর কানাডার নির্দিষ্ট এক জায়গায় একটা করে ভিউকার্ড পাঠালো। এরপর ওদের প্রত্যেকের নামে একটা করে প্যাকেট এলো ওখান থেকে। এক্সপ্লোসিভ আর ডিটোনেটর। কিভাবে কি করতে হয়, সবই জানা আছে তাদের।

ওদের নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, সাংকেতিক বার্তা সহ মোট তিনটে খাতা তৈরি করা হলো। নাম দেয়া হলো টেলি-বম বুক। একটা ছিলো কে. জি. বি. সদর দফতরে, ডকুমেন্টস এক্সপার্ট নিকোলাই ডালচিমস্কির দায়িত্বে। আরেকটা আছে রেড আমি চীফ অভ স্টাফের প্রাইভেট সেফে, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ গ্রু-র সশস্ত্র প্রহরীরা রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয় সেটাকে।

তৃতীয়টা আছে ওয়াশিংটনে, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ত্রিফকেসে। ছোট্ট একটা বোতাম টিপে ত্রিফকেসটাকে যখন তখন পাউন্ডার করে দেয়ার ব্যবস্থা ওটার ভেতরই রাখা হয়েছে।

একশো ছত্রিশ জন আদর্শ, নিখুঁত ডীপ-কাভার এজেন্ট সেই থেকে আজ চোদ্দ বছর ধরে জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে আমেরিকায়। টেলিফোনে সাংকেতিক বার্তা না পেলে তাদের সম্মোহিত অবস্থা কাটবে না, তার আগে পর্যন্ত তারা মাটির মানুষ। কিন্তু সাংকেতিক বার্তা পাবার সাথে সাথে নিরীহ দর্শন মাটির মানুষগুলো হয়ে উঠবে আক্ষরিক অর্থেই একেকটা দানব। যন্ত্রের মতো বিশ্বস্ততার সাথে যে যার দায়িত্ব পালন করবে, প্রত্যেকে ধ্বংস করবে যুক্তরাষ্ট্রের একটা করে সামরিক স্থাপনা, কিংবা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান। সেই সাংকেতিক বার্তাই পাঠাতে শুরু করেছে ম্যানিয়াক ডালচিমস্কি, হিউম্যান বোমাগুলো এক এক করে ফাটিয়ে দিচ্ছে সে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। রাশিয়ার সাথে আমেরিকার সম্পর্ক এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো, ছ'পক্ষের কেউই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ চায় না। ঠিক এই পরিস্থিতিতে ডালচিমস্কি যদি একের পর এক টেলি-বোমাগুলো ফাটাতে থাকে, তাকে যদি থামানো না যায়, আমেরিকা ধরে নেবে রাশিয়া তাদের সাথে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে। কাজেই পাল্টা আঘাত হানতে ইতস্তত করবে না তারা। আর রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ মানেই তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

শুধু যে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করলো রানা তাই নয়, অসহায়ও বোধ করলো। আমেরিকা বিরাট একটা দেশ, সেখানে কোথায় শান্তিদূত-২

ডালচিমস্কিকে খুঁজবে সে ? এমনকি কানাডাতেও থাকতে পারে ডালচিমস্কি, কারণ কানাডা থেকেও সরাসরি আমেরিকায় টেলিফোন করা যায় । কিন্তু অসহায় বোধ করলেও, অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো রানাকে । মনে মনে জানলো, এই অ্যাসাইনমেন্টে তার ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা ষোলোআনা । রানা চাইলো, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের সাথে বা কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখবে না সে, কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার শুধু মাঝে-মাঝে রেডিওর খবরের মাধ্যমে রানাকে পরামর্শ দিতে পারবে । তার শর্ত মেনে নিলেন ঔরা । তবে রানাকেও ওদের একটা অনুরোধ রক্ষা করতে হলো । কে. জি. বি.-র একজন মেয়ে এজেন্টকে সহকারিণী হিসেবে সাথে নিতে হবে । মেয়েটা আমেরিকান, খুবই সুন্দরী, নাম লিলিয়ান ।

প্লেন, তারপর সাবমেরিনে চড়ে আমেরিকায় পৌঁছুলো রানা । সাগর সৈকতে ওকে অভ্যর্থনা জানালো লিলিয়ান । ওদিকে মার্কিন জলসীমার ভেতর বিদেশী একটা সাবমেরিন এসেছিল, সাবমেরিন থেকে কোড করা একটা মেসেজ প্রচার করা হয়েছে, এ-সব মার্কিন ইন্টেলিজেন্স জেনে ফেললো । অপরদিকে স্যাবোটাজের যে-সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর রহস্য ভেদ করার জন্যে একাধিক ইন্টেলিজেন্স জোরেশোরে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে । ইতিমধ্যে জানা গেছে এলিস খেলার আসল এলিস খেলার নয় । আসল এলিস খেলার চোদ্দ বছর আগে মারা গেছে ।

এফ. বি. আই. এবং মার্কিন মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স তদন্ত চালিয়ে যেতে বন্ধপরিকর, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো, সি. আই. এ. তাদেরকে সাহায্য করছে না । সাপ্তাহিক

মিটিঙে এ-সব প্রসঙ্গে কথা উঠলেই দায়সারা গোছের জবাব দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে সি. আই. এ. প্রতিনিধিরা।

মস্কো থেকে মস্কোর কাজে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে রানাকে, আর সেই মস্কোতেই রানার অবর্তমানে বিচার হয়ে গেল ওর। রায় হলো, মৃত্যুদণ্ড।

অনেক দিন আগে রাশিয়া থেকে মিগ-একত্রিশ নিয়ে পালিয়ে এসেছিল রানা, সে-কথা মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কিছু অফিসার আজও ভোলেনি। তাদের মধ্যে একজন হলেন গ্রু-র চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরভ। তাঁর ধারণা, মিগ-একত্রিশ চুরি করে রাশিয়ানদের অপমান করেছিল রানা, তাকে ক্ষমা করা যায় না। রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফের সাথে মিটিঙে বসে রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিলেন তিনি। ডালচিমস্কি এবং রানাকে একই দৃষ্টিতে দেখা হলো। রাশিয়া এবং বিশ্ব-শান্তির জন্যে দু'জনেই নাকি সমান বিপজ্জনক। সি. আই. এ.-তে গ্রু-র নিজস্ব চর আছে, তার নাম চ্যাপেল, সেই চ্যাপেলের কাছ থেকে একটা বার্তা পেয়েছেন মেজর জেনারেল কুদরভ। মেসেজে চ্যাপেল বলেছে, 'মাসুদ রানা আমেরিকানদের সাথে হাত মিলিয়েছে...'। এই মেসেজ দেখিয়েই রানার মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিয়ে নিলেন তিনি। সেই মিটিঙে আরো সিদ্ধান্ত হলো, টেলি-বমগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে গ্রু-র চারটে টিমকে পাঠানো হবে। আমেরিকার সাথে যুদ্ধ এড়াতে হলে নিজেদের অর্থাৎ কে. জি. বি.-র একশো ছত্রিশজন ডীপ-কাভার এজেন্টকে হত্যা না করে উপায় নেই। আর মাসুদ রানাকে হত্যা করার জন্যে পাঠানো হবে তিনটে দলকে।

এ-সব কিছুই সময় মতো রানা জানতে পারলো না। লিলিকে শাস্তিদূত-

ওর ভালো লাগলো, কিন্তু তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো ও। আমেরিকায় পৌঁছবার পর কয়েকটা দিন কেটে গেল, কিন্তু কিভাবে বা কোথেকে কাজ শুরু করবে ঠিক করতে পারছে না রানা। এতো বড় একটা দেশে কোথায় খুঁজবে সে ডালচিমস্কিকে? তার ওপর আবার নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, কে. জি. বি. এজেন্ট বা অন্য কারো সাহায্য নেয়া যাবে না।

ইতিমধ্যে আরো একটা টেলি-বোমা ফাটিয়ে দিলো ডালচিমস্কি। কিন্তু লোকটা পালাতেও পারলো না, মারাও গেল না। আহত হয়ে জ্ঞান হারালো, সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলো তাকে। একাধিক মার্কিন ইন্টেলিজেন্স অষ্টপ্রহর তাকে পাহারা দিয়ে রাখলো। এই সময় রেডিওর মাধ্যমে কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার থেকে রানাকে অনুরোধ করা হলো, সামরিক হাসপাতালে ঢুকে রানা যেন জ্ঞানহীন ডীপ-কাভার এজেন্ট লোকটাকে খুন করে। মনে মনে ভীষণ রেগে গেল রানা। কি ভেবেছে তাকে ওরা? কসাই? কাজটায় প্রাণের ঝুঁকি আছে, তবু রানা সিদ্ধান্ত নিলো সামরিক হাসপাতালে ঢুকবে সে। খুন নয়, লোকটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।

ইতিমধ্যে রানার ওপর ছ'বার হামলা চালানো হয়ে গেছে। ছ'বারই অস্ত্রের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে রানা। প্রথমবার নিজের বুদ্ধিতে বেঁচেছে, দ্বিতীয়বার লিলিয়ানের সাহায্যে। হামলাগুলো কারা করছে, কিভাবে তারা ওদের হোটেলের ঠিকানা যোগাড় করলো, এই সব প্রশ্নে লিলিয়ানের সাথে আলোচনা করলো রানা। আগেই লক্ষ্য করেছিল ও, লিলিয়ানের কানের ছল জোড়া অস্বাভাবিক বড়। কথাটা মুখ ফুটে বলতেই ছল জোড়া কান থেকে খুলে

রানার হাতে দিলো লিলিয়ান। দেখা গেল একটার চেয়ে অপরটা একটু বেশি ভারি। ক্ষুদ্রে বোতামে চাপ দিয়ে ভারিটার ভেতর থেকে মিনি একটা রিপার বের করলো রানা। লিলিকে বললো, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের অনুরোধ ফেলতে পারোনি বলে এটা তুমি সাথে রেখেছিলে, তাই না? রেসিডেন্ট চেয়েছিল তুমি অর্থাৎ আমরা কোথায় যাই না যাই সব খবর সে যেন জানতে পারে। লিলিয়ান এমন ভাব দেখালো, যেন রানার অনুরোধই ঠিক। ছ'জনেই একমত হলো, রেসিডেন্ট যাদেরকে নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে স্ট্যালিন-পন্থী কে. জি. বি. অথবা গ্রু-র এজেন্ট লুকিয়ে আছে, তারাই রানাকে খুন করার চেষ্টা করছে। এভাবে রহস্যের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো গেল বটে, কিন্তু মনে মনে রানা জানলো, রহস্যের কোনো মীমাংসাই হলো না আসলে।

চোখ কান খোলা রাখলো রানা। জানে, আবার তার ওপর আক্রমণ হতে পারে।

অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে সামরিক হাসপাতালে ঢুকলো সে। ভিন-সেন্ট গগল সাহায্য করলো ওকে। কিন্তু আহত ডীপ-কাভার এজেন্টের কেবিনে ঢুকে রানা দেখলো, লোকটা মারা গেছে। পরে রানা জানতে পারলো, কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট তাকে খুন করে রেখে গেছে। রাগে ছুঃখে ইচ্ছে হলো অ্যাসাইনমেন্টফেলে দেশে ফিরে যায়। কিন্তু তারপর ভাবলো, কাজটা নিতে রাজি হয়েছিল মানবিক একটা কারণে। ওর মনে হয়েছিল একশো ছত্রিশ জন টেলি-বম আসলে নিরপরাধ, সাংকেতিক বার্তা না পাওয়া পর্যন্ত তারা কোনো অপরাধ করবে না। কোনোভাবে এদেরকে যদি বাঁচানো সম্ভব হয় তাহলে একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা

করে দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলো রানা। একটা জেদ, একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো সে। দেখা যাক লোকগুলোকে বাঁচানো যায় কিনা।

প্রথম খণ্ডের শেষাংশে দেখা গেছে, লিলিয়ানকে সাথে নিয়ে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছে রানা। হঠাৎ কি মনে করে লিলিয়ানকে হোটেল ফিরে যেতে বললো ও। হোটেল ফিরতে বললো, কিন্তু নিজের কামরায় নয়—গ্রাউণ্ড ফ্লোরে রেস্টোরঁ আছে, রানার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে লিলিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার নির্দেশ মেনে নিয়ে ফিরে গেল লিলি।

লিলিকে বিদায় করে দিয়ে পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে একটা এয়ারলাইন্স অফিসে টেলিফোন করলো রানা। লাস ভেগাসের দুটো টিকেট রিজার্ভ করলো। লিলিকে জানায়নি ও, গ্রুর চারটে দল মেক্সিকো থেকে লাস ভেগাস এয়ারপোর্টেই আসছে। ওখান থেকে সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়বে তারা, এক এক করে খুন করবে টেলি-বমগুলোকে।

রানা ঠিক করেছে, ওরা যখন পৌঁছুবে তখন লাস ভেগাসে থাকবে সে। ওদের ব্যাপারে কি করা যায় তা এখনো ঠিক করেনি। জানে, একাধিক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটা হলো, নিজের পরিচয় না জানিয়ে এফ. বি. আই.-কে ওদের আসার কথা এবং পরিচয় জানিয়ে দেয়া। এফ. বি. আই. সদলবলে হাজির থাকবে এয়ারপোর্টে, একটা করে গ্রুর টিম প্লেন থেকে নামবে আর তাদের গ্রেফতার করা হবে। এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে রানার কাছে।

সুখী পাঠকবৃন্দ, বুঝতেই পারছেন রানা সম্ভবত এই অ্যাসাইন-



মেটে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। বেশ ক'দিন হয়ে গেল আমেরিকায় পৌঁচেছে ও, বেশিরভাগ সময় নিজের জ্ঞান বাঁচাবার জন্যে ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে ওকে, আসল কাজে এখন পর্যন্ত হাতই দিতে পারেনি। অবশ্য কাজে হাত দেয়ার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও—ঠিক করেছে, অসৎ একজন পুলিশের সাহায্য নেবে। চলুন এবার দেখা যাক আপনাদের প্রিয় মার্জারের কপালে শিক্কে ছেঁড়ে কিনা।

# এক

---

শেরাটন হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, লোটাস বার অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্টে বসে রয়েছে লিলি। এক ঘণ্টার মধ্যে আসার কথা অথচ দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, রবিনের দেখা নেই। রাগ বা অভিমান নয়, দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে মনে মনে ছটফট করছে লিলি। মানুষটার কোনো বিপদ হলো না তো? আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে গেলই বা কোথায়? টনটনে সময় জ্ঞান, এতো দেরি করার মানুষ তো সে নয়!

রেস্টুরেন্টের পিছনদিকে, কোণের একটা টেবিলে বসেছে লিলি। রাত কম হয়নি, প্রায় বারোটা, তবু আশপাশের সবগুলো টেবিলে খদ্দের রয়েছে। আজ রাতে শেষবারের মতো গলা ভিজিয়ে নিতে এসেছে ওরা, আর খানিক পর এক এক করে বেরিয়ে যাবে সবাই। রেস্টুরেন্টে ঢোকান মুখেই বার কাউন্টার, সেটার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে বিয়ার বা হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কাউন্টারের পাশেই টেলিফোন বুদটা। পিছন দিকে শুধু লিলির টেবিলেই তিনটে চেয়ার খালি, তবু কেউ উপযাচক হয়ে আলাপ শাস্তিদূত-

জমাবার চেষ্টা করেনি বা খালি চেয়ারগুলোয় বসার অনুমতি চায়নি, সম্ভবত ওকে একা এবং বিষম দেখেই। লিলির পিছনের দেয়ালে বড়সড় একটা আয়না থাকলেও, দরজার দিকে মুখ করে বসেছে সে। দরজার বাইরে করিডর, উন্টোদিকে পাশাপাশি তিনটে কাঁচের দরজা, দরজার ওদিকে রিশেপসন হল আর লাউঞ্জ। নিজের টেবিল থেকে লাউঞ্জে ঢোকান দ্বিতীয় এবং শেষ দরজাটাও দেখতে পাচ্ছে। ঢুকলে দ্বিতীয় দরজা দিয়েই লাউঞ্জে ঢুকবে রবিন। লাউঞ্জের এলিভেটরটাও দেখতে পাচ্ছে লিলি।

একা একা অনেক গোপন কথা ভাবছে ও। ইতিমধ্যে ছ'বার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে রবিনকে। ছ'বারই রবিনের সাথে সে-ও মারা যেতে পারতো। প্রথমবার আততায়ীরা কিভাবে ওদের হৃদিশ পেয়েছিল রবিন তা আবিষ্কার করে ফেলে। লিলির কানের ভারি ছলটার ভেতর থেকে ক্ষুদে রিপার বের হয়। দ্বিতীয়বার রবিনের ধারণা হয়, লিলি কে. জি. বি. রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে পড়ে যায়, তারা লিলিকে অনুসরণ করে, এবং এক সময় রবিনকে দেখে ফেলে। কিন্তু লিলি জানে, ব্যাপারটা ঠিক তা ছিলো না। কে. জি. বি. রেসিডেন্টের সাথে তার যোগাযোগ করার প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই যোগাযোগ করতে গিয়ে শত্রুর চোখে ধরা পড়ার প্রশ্নও অবাস্তব। শত্রুরা তার হৃদিশ পায় টেলিফোনে, এ-ব্যাপারে লিলি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। কোথেকে টেলিফোন করা হয়েছিল তা-ও পরিষ্কার জানে সে। অর্থাৎ মোক্ষম জায়গায় একজন গুপ্তচর লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ আঁতকে উঠলো লিলি। এই মুহূর্তেও! সেই গুপ্তচর সম্ভবত এই মুহূর্তেও জানে কোথায় রয়েছে সে। দেড় ঘণ্টার বেশি হলো

এখানে বসে রয়েছে, গুপ্তচরের ফোন পেয়ে এখানেও শক্ররা ওত পেতে নেই তো ?

চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে আশপাশটা দেখে নেয়ার ঝোঁকটা অনেক কষ্টে দমন করলো লিলি। কেউ যদি তার ওপর নজর রেখেই থাকে, তাকে সতর্ক করে দেয়াটা বোকামি হবে। আরেকটা কথা ভেবে ক্ষীণ একটু স্বস্তি বোধ করলো সে। শক্ররা যদি থাকে, তারা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে রবিনের জন্যে। তাহলে রবিন বরং আরো দেরি করে এলেই ভালো, বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে ওরা। পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করলো লিলি, বোকার মতো চিন্তা করছে সে। প্রফেশনাল খুনীরা কখনো অধৈর্য হয়ে ফিরে যায় না। রবিনের অপেক্ষায় সে যতোকণ এখানে বসে থাকবে, আত-তায়ীরাও ততোকণ এখান থেকে নড়বে না।

আমার তাহলে এখানে বসে থাকা উচিত হচ্ছে না।

কিন্তু রবিন আমাকে এখানেই থাকতে বলে দিয়েছে।

বিপদ যদি হয়ই, আমি থাকলেও হবে, না থাকলেও হবে— থাকলে বরং সতর্ক বা সাহায্য করতে পারবো ওকে।

ওয়েটারকে ডাকার ছলে এদিক ওদিক তাকালো লিলি। কেউ ওর দিকে তাকিয়ে নেই, কাউকে সন্দেহজনক বলে মনে হলো না। কাছে এসে দাঁড়ালো ওয়েটার। ‘আরেকটা বিয়ার দাও,’ তাকে বললো লিলি। ‘না, আরো দুটো।’ লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে হঠাৎ রবিনকে দেখতে পেয়েছে সে।

চলে গেল ওয়েটার। লাউঞ্জ পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলো রবিন। তারপর কাঁচ লাগানো সুইংডোর ঠেলে রেস্টুরেন্টে ঢুকলো। গাল ফুলিয়ে নড়েচড়ে বসলো লিলি। রবিন কাছে

আসতে বললো, ‘তুমি কেমন মানুষ বলে তো ! এক ঘণ্টার কথা বলে দু’ঘণ্টা পার করে দিলে !’

‘আরে সন্ধানাশ, বিবি সাহেব দেখি রেগে টং হয়ে আছে !’ খালি একটা চেয়ার টেনে লিলির মুখোমুখি বসলো রানা। পিছনে একটা শব্দ হলো—সম্ভবত কারো পকেট বা হাত থেকে খুচরো পয়সা পড়ে গেছে মেঝেতে। ‘শোনো, কাল সকালে আমরা লাস ভেগাসে যাচ্ছি,’ নিচু গলায় বললো রানা। ‘টুকটাক কিছু কেনাকাটা করে আজ রাতেই সব গুছিয়ে রাখতে হবে।’ আয়নার দিকে চোখ পড়তে চুপ করে গেল ও। বিয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে ওয়েটার।

ওয়েটার চলে যেতে বিয়ারের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিলো রানা। ‘বাইরে বেশি ঠাণ্ডা, বুঝলে। এক ছুটে কামরা থেকে তোমার কোটটা নিয়ে এসো।’

কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলো লিলি, কিন্তু কথা বাড়ালো না। তাড়াতাড়ি বিয়ারটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়ালো সে। ‘এখুনি নিয়ে আসছি,’ বলে দরজার দিকে এগোলো।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো লিলি। করিডর পেরিয়ে লাউঞ্জে ঢুকলো। এলিভেটরের পাশেই সিঁড়ি, সিঁড়িটাকেই বেছে নিলো সে। স্যাভয়ের এলিভেটর বিফারিত হবার পর ভয়টা এখনো তার দূর হয়নি।

এদিকে লিলি লাউঞ্জে ঢুকতেই অস্থির হয়ে উঠলো রানা। দ্রুত পকেট হাতড়াচ্ছে সে। কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ বোকা বোকা হাসি দেখা গেল ওর মুখে। পকেট থেকে বের করে আনলো সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল ও,

ঘাড় ফিরিয়ে করিডর আর লাউঞ্জের দিকে তাকালো। দেখলো, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লিলি। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লো রানা, প্রায় দৌড় দিয়ে বেরিয়ে এলো করিডরে, ওখান থেকে ঝিংকার করে ডাকলো, ‘লিলি, এই লিলি—চলে এসো, সিগারেট আমার পকেটেই!’

হাসতে হাসতে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলো রানা। আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালো।

শান্তভাবে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলো লিলি। টেবিল থেকে প্যাকেট তুলে নিয়ে সিগারেট বের করে ধরালো। তারপর ফিসফিস করে বললো, ‘আমি সিগারেট আনতে যাচ্ছিলাম না।’

ধোঁয়া উদগীরণ করার ছলে রানাও ঠোঁট নাড়লো, ‘জানি।’

‘তাহলে?’

‘আমি এখন চিন্তিত,’ বিড়বিড় করে বললো রানা। ‘বিরক্ত করো না।’

অভিমান হলেও, লোকজনকে দেখিয়ে মূঢ় শব্দে হাসলো লিলি।

‘আমাদের কামরায় তুমি নও, আমি যাবো,’ বললো রানা। কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে নেই, কেউ ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

‘কিন্তু কেন?’

হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো রানার চেহারা। ‘ঠিক জানি না। হয়তো পাখা গজিয়েছে, মরতে যাবো। আমি চলে যাবার দু’মিনিট পর ফোন বুদে ঢুকে আবোলতাবোল নম্বরে ডায়াল করবে, সাত মিনিটের আগে বুদ থেকে বেরুবে না।’ পকেট থেকে একগাদা খুচরো পয়সা বের করে টেবিলের তলা দিয়ে লিলির মুঠোয় গুঁজে

দিলো ও । ‘বেরিয়ে কেনেডি এয়ারপোর্টের কাছে হোটেল লিফটনে যাবে, আরেক নামে কামরা ভাড়া করবে ।’

‘কিন্তু... ।’

লিলির কথা যেন শুনতেই পেলো নারানা । অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজতে গুঁজতে উঠে দাঁড়িয়েছে ও । ‘আসছি,’ বলে আধ পাক ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালো ।

তিনতলায় রানা আর লিলির কামরা । দরজা বন্ধ, ভেতরটা অন্ধকার, দরজার দিকে মুখ করে কামরার মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে আততায়ী । প্রায় তিন ঘণ্টা হলো মাস্টার কী দিয়ে দরজার তাল খুলে ভেতরে ঢুকেছে সে । ঢোকান পরপরই ফোন করে নিজের সঙ্গী লোকটাকে জানিয়ে দিয়েছে, ভেতরে ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয়নি, ঢুকতে তাকে দেখেওনি কেউ । ঘণ্টাখানেক পর সঙ্গীর কাছ থেকে সে-ও একটা টেলিফোন পেয়েছিল—শিকার নয়, শিকারের সঙ্গিনী রেস্টুরেন্টে পৌঁচেছে । তারপর এই খানিক আগে কয়েক মিনিটের ব্যবধানে পরপর তিনটে ফোন পেয়েছে সে । প্রথমে বলা হলো, শিকারও এইমাত্র রেস্টুরেন্টে পৌঁছুলো । তারপর বলা হলো, শিকার নয়, তার সঙ্গিনী তিনতলায় উঠছে । সবশেষে বলা হলো, না, ওরা কেউ এখন কামরায় যাচ্ছে না ।

টেলিফোন সহ টেবিলটা ঘরের মাঝখানে, চেয়ারের কাছে টেনে এনেছে আততায়ী । বেল বাজলেই রিসিভার তুলে নেবে সে । এই মুহূর্তে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, হাতে ধরা পিস্তলের মাজল্-ও দরজার দিকে তাক করা ।

বান বান শব্দে আবার বেজে উঠলো টেলিফোন ।

হেঁা দিয়ে রিসিভার তুললো আততায়ী ।

‘শিকার তিনতলায় উঠছে,’ অপরপ্রান্ত থেকে সঙ্গী বললো ।  
‘এক। সিঁড়িতে পা রাখলো এই মাত্র । গেট রেডি ! গুড লাক !’  
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ।

আস্তে করে ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো আততায়ী ।  
পিস্তলটা শক্ত করে ধরলো সে । দরজার বাইরে করিডরে আলো  
আছে, চৌকাঠের নিচের দিকে সরু, লম্বা একটা সাদাটে রেখা  
ফুটে আছে । কী-হোলটাও সামান্য আলোকিত । দরজার সামনে  
করিডরে কেউ দাঁড়ালে ছ’জায়গাতেই তার কালো ছায়া পড়বে ।

একচুল নড়ছে না আততায়ী । ট্রিগারে শক্ত হয়ে আছে আঙুল ।  
দরজার বাইরে ছায়া দেখলেই ট্রিগার টেনে দেবে সে । পিস্তলে  
সাইলেন্সার ফিট করা আছে, তেমন কোনো শব্দ হবে না । তবু  
ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে তাদের । শিকার যদি করিডরে একা  
থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না । কিন্তু করিডরে যদি আর  
কেউ থাকে, ঝামেলা বেধে যাবে । সেক্ষেত্রে দরজা খুলেই ঝেড়ে  
দৌড় দেবে সে । হাতে পিস্তল থাকবে, কাজেই মরণের পাখা না  
গজালে কেউ তাকে বাধা দিতে আসবে বলে মনে হয় না ।

এক, দুই করে সেকেণ্ড গুণছে আততায়ী ।

একশো পর্যন্ত গোণার পর আবার নতুন করে এক, দুই শুরু  
করলো সে । দুশো পর্যন্ত গোণা শেষ করলো । এক তলা থেকে  
তিনতলায় উঠতে ক’টাই বা ধাপ সিঁড়ির, এতো দেরি হচ্ছে কেন ?

তারপর মনে পড়লো, দোতলার ল্যান্ডিংয়ে ছোটো একজোড়া  
দোকান আছে । শিকার হয়তো সিগারেট কেনার জন্যে থেমেছে ।  
কিংবা হয়তো বুকস্টলে দাঁড়িয়ে পেপার পড়ছে ।



আরো তিনশো পর্যন্ত গুলো আততায়ী। ব্যাপার কি ? নিচে সঙ্গিনীকে বসিয়ে রেখে কেউ যদি তিনতলার একটা কামরা থেকে কিছু নিতে আসে, মাঝপথে কতোক্ষণ সময় নষ্ট করবে সে ? এতো দেরি হচ্ছে কেন ? মাঝপথ থেকে আবার যে রেস্টুরেন্টে নেমে যায়নি তা তো বোঝাই যাচ্ছে, কারণ তা গেলে আরেকটা টেলিফোন পেতো সে ।

সঙ্গীকে সে টেলিফোন করবে নাকি ? তাকে জিজ্ঞেস করবে, শিকারের পৌছুতে এতো দেরি হচ্ছে কেন ? কিন্তু তাতে লাভ হবে না, কারণ সঙ্গীও তার মতো অন্ধকারে রয়েছে, শিকারের দেরি হবার কারণ তারও জানা নেই । তারচেয়ে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক ।

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না । আরো আড়াই শো পর্যন্ত গুণেছে আততায়ী, হঠাৎ দরজার বাইরে চৌকাঠের সরু ফাঁকে ছায়া দেখে দম বন্ধ হয়ে এলো তার । মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই কী-হোলের একটু ওপরের একটা বিন্দু লক্ষ্য করে পরপর ছ'বার গুলি করলো সে । কাতর একটা ধ্বনি তার কানে যেন মধুবর্ষণ করলো । একবার না পারিলে দেখো শতো বার ! ছ'বার ছ'দলকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে, বাছাধন ! কিন্তু আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি !

কাতর গোঙানির শব্দ তখনো থামেনি, বিদ্যুৎবেগে দরজার সামনে চলে এলো আততায়ী । নবটা ঘুরিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেললো দরজার কবাট ।

কাউন্টারের সামনে, ফোন বুদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলো আত-

তায়ীর সঙ্গী লোকটা । তার পরনে কালো একটা জ্যাকেট, মাথায় একই রঙের হ্যাট । রানা যখন রেস্টুরেন্টে ঢুকলো, তাড়াছড়ো করে বুদে ঢোকান সময় এক লোকের সাথে ধাক্কা খায় সে, মুঠোর ভেতর ভরে রাখা খুচরো পয়সাগুলো মেঝেতে পড়ে যায় । এমন কিছুই নয় ব্যাপারটা, কিন্তু তবু মনটা তার খুঁতখুঁত করতে থাকে ।

তারপর আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটলো, কোনোটাকেই স্বাভাবিক-ভাবে নিতে পারলো না সে । তার ধারণা ছিলো, শিকার রেস্টুরেন্টে ঢুকবে সঙ্গিনীকে নিয়ে তিনতলায় নিজেদের কামরায় যাবে বলে । রাত তো আর কম হয়নি, নিশ্চয়ই বিছানায় গিয়ে মজা করার জন্যে অস্থির হয়ে থাকবে দু'জনেই । কিন্তু তার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হলো । শিকার নয়, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো তার সঙ্গিনী ।

কিন্তু সঙ্গিনীকে সিঁড়ি থেকে ডেকে নিলো শিকার । কি যেন কথা হলো দু'জনের মধ্যে । তারপর শিকার নিজে চেয়ার ছাড়লো । তিনতলায় যাবে । প্রতিবারের মতো, এবারও কি ঘটতে চলেছে ফোনে সে তার সঙ্গীকে জানিয়েছে । মনটা খুঁত খুঁত করছিল বলেই তার একটা ঝাঁক চাপে, শিকারের পিছু পিছু সে-ও তিনতলায় উঠে পড়ে । কিন্তু ঝাঁকটাকে দমিয়ে রাখে সে । কারণ প্ল্যানটা অন্য ভাবে করা হয়েছে ।

প্ল্যান করার সময় দু'জনেই একমত হয়েছিল, রানা হচ্ছে আসল শিকার, কিন্তু লিলিকেও বাঁচিয়ে রাখা চলে না । যদি সম্ভব হয় তাহলে দু'জনকে একসাথে গুলি করে মারা হবে, তা না সম্ভব হলে একেকবারে একেকজনকে । তবে প্রথমে মারতে হবে রানাকে ।

সংক্ষেপে প্ল্যানটা ছিলো এই রকম : মেয়েটা যদি একা কামরায়

চুকতে যায়, তাকে গুলি করা হবে না, ভেতরে ঢুকাতে দেয়া হবে। ভেতরে ঢুকলে তাকে বন্দী করা হবে, মুখে কাপড় ওঁজিয়ে রাখা হবে মেঝেতে, হাত-পা বেঁধে। আর যদি রানা একাকামরার সামনে আসে, তাকে কোনো সুযোগই দেয়া হবে না, বন্ধ দরজার ভেতর থেকে গুলি করা হবে। কিন্তু যদি দু'জন একসাথে তিনতলায় ওঠে তাহলে রেস্টুরেন্ট থেকে সঙ্গীকে ফোন করে সে-ও ওদের পিছু নেবে। এই পরিস্থিতিতে গুলি করবে দু'জনেই—কামরার ভেতর থেকে একজন, আর করিডর থেকে অপরজন।

কাজেই রানা যখন একা তিনতলার উদ্দেশে রওনা হলো, মেয়েটার সাথে রেস্টুরেন্টে থেকে যেতে হলো তাকে। সঙ্গীর ওপর তার আস্থা আছে, জানে তার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না। গুলি করার পরপরই দরজা খুলে লাশটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নেবে সে। তারপর অপেক্ষা করবে। রানার দেরি দেখে কিছুক্ষণ পর মেয়েটাও তিনতলায় উঠবে। রেস্টুরেন্ট থেকে সে-ও তখন অনুসরণ করবে মেয়েটাকে।

রানা সিঁড়ি বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ছয় মিনিট অপেক্ষা করলো কালো জ্যাকেট। ইতিমধ্যে আরো একটা ব্যাপার তার মনের খুঁতখুঁতে ভাবটা বাড়িয়ে তুলেছে। চার মিনিট আগে সেই যে মেয়েটা ফোন বুদে ঢুকেছে, বেকুবাব নামটি পর্যন্ত নেই। ঈশ্বর জানে কোথায় ফোন করছে বারবার।

তবু এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো সে যে আসল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। রানা যে বেঁচে নেই এ-ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তিনতলায় কোনো ঝামেলাই হয়নি, হলে এতোক্ষণে মহা হৈ-চৈ বেধে যেতো।

কাজেই অপেক্ষা করা যেতে পারে। বাইরে ফোন করা এক সময় শেষ হবে মেয়েটার। রানার দেরি হচ্ছে দেখে তিনতলায় ফোন করতে পারে সে। রানাকে খুন করার পর আর কোনো ফোন রিসিভ করবে না তার সঙ্গী, জানে কালো হ্যাট। কেউ রিসিভার তুলছে না দেখে কি করবে মেয়েটা? হয়তো আরো ক'মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে তিনতলায় যাবে সে।

ফোন বুদে ঠিক সাত মিনিট থাকার পর বেরিয়ে এলো লিলি, ওয়েটারকে ডেকে ওখানে দাঁড়িয়েই বিল মেটালো, ভাঙতি পয়সা ফেরত না নিয়ে চলে এলো লাউঞ্জে, সেখান থেকে হোটেলের বাইরে। রাস্তা পেরিয়ে খানিকটা হাঁটলো সে, তারপর একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে বসলো। ড্রাইভারকে বললো, 'কেনেডি এয়ারপোর্ট।'

লিলি হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে বোকা বনে গেল কালো হ্যাট। একবার ইচ্ছে হলো, মেয়েটার পিছু নেয়। কিন্তু প্ল্যানটা সেভাবে করা হয়নি ভেবে ইতস্তত করতে লাগলো সে। এতো রাতে মেয়েটা যে হোটেল থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে, ওদের মাথায় একবারও এই সম্ভাবনাটা উকি দেয়নি! মেয়েটার পিছু পিছু গেলে তাকে খুন করার একটা সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সুযোগ-টা পেতে কতোকণ সময় লাগবে বলা মুশকিল। এদিকে ঘরে লাশ নিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা তার সঙ্গীর পক্ষে সম্ভব নয়। ফোন করে পরামর্শ করার ইচ্ছা হলো, কিন্তু আগেই ঠিক করা হয়েছে, রানাকে খুন করার পর তার সঙ্গী রিসিভার তুলবে না।

অগত্যা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো কালো হ্যাট।

তিনতলায় উঠে নিজেদের কামরার সামনে মুহূর্তের জন্যেও থামেনি রানা। আলোকিত করিডরের মাঝখান দিয়ে এগোলো, নিজেদের কামরাটাকে ছাড়িয়ে বিশ গজের মতো এসে ছোটো একটা ঝুল-বারান্দা দেখে থামলো সেখানে। কামরার দরজা থেকে জায়গাটা বেশ একটু দূরে হয়ে গেল, তবে চমৎকার একটা আড়াল পাওয়া গেছে বটে।

মনে মনে একটা হিসেব করেছে রানা, সম্ভবত মিনিট দশেকের মতো অপেক্ষা করতে হবে ওকে।

আর হ্যাঁ, ঠিক দশ মিনিটের মাথায় অপেক্ষার পালা শেষ হলো। সিঁড়ির মাথায় লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলো রানা। রেস্টুরেন্টে এই লোকের হাত থেকেই খুচরো পয়সা পড়ে গিয়েছিল।

করিডর ধরে হন হন করে এগিয়ে এলো লোকটা। রানাদের কামরার সামনে থামলো সে। নক করার জন্যে হাত তুললো, কিন্তু শূন্য স্থির হয়ে থাকলো হাতটা, মাথা নিচু করে নিজের পায়ের চারপাশে কি যেন খুঁজছে সে।

ঝুল-বারান্দা থেকে ঊকি দিয়ে আবার তাকালো রানা। নির্মম এক চিলতে হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। লোকটা কি খুঁজছে জানে ও। একেই সম্ভবত নিয়তির পরিহাস বলে। রক্তের দাগ খুঁজছে লোকটা।

রক্ত ঝরলো ঠিকই, কিন্তু তা লোকটার নিজের রক্ত। দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে সে পাঁচ সেকেণ্ডও হয়নি, পরপর দু'বার ঝাঁকি খেলো। লোকটার মুখের একটা পাশ আর পিঠের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিলো রানা। পিঠে পাশাপাশি দুটো ফুটো তৈরি করে বেরিয়ে এলো একজোড়া বুলেট। হাঁ হয়ে গেল মুখ, কাতর আক্ষেপ ধ্বনি

বেরিয়ে এলো গলার ভেতর থেকে ।

গোঙানির আওয়াজটাই সব ভুল করে দিলো । রানার ধারণা ছিলো না বুকের মোক্ষম জায়গায় গুলি খেয়ে এতো জোরে কেউ গোঙাতে পারে । ওদের কামরার দরজা বিক্ষোভিত হলো, প্রায় একই সাথে আশপাশের আরো কয়েকটা দরজা দড়াম দড়াম করে খুলে গেল ।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো আততায়ী, লাশ তো নয় যেন ভূত দেখে চমকে উঠলো সে । আশপাশের খোলা দরজা থেকে লোকজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে ‘পুলিশ, পুলিশ’ বলে চিৎকার জুড়ে দিলো, লাশ টপকে তীর বেগে ছুটলো সিঁড়ির দিকে । কেউ কিছু বুঝতে না পেরে দ্রুত পথ ছেড়ে দিলো তাকে । ইতিমধ্যে বুল-বারান্দা থেকে করিডরে বেরিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু গুলি করার কোনো সুযোগই পেলো না ও । ‘খুনী, ধরুন ওকে !’ চিৎকার করে বলতে পারতো বটে, কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে লোকসান হতো বেশি । লোকজন বা পুলিশকে জানতে দেয়া চলবে না ঘটনার সাথে সে-ও জড়িত ছিলো । কিন্তু লোকটাকে তো আর পালাতে দেয়া যায় না, ধাওয়া শুরু করলো ও । পিস্তলটা পকেটেই রয়েছে, বের করেনি ।

রক্তাক্ত লাশ দেখলে যা হয়, এগোতে গিয়ে পিছিয়ে আসছে লোকজন । তিন চার জনের সাথে ধাক্কা খেয়ে রানা যখন সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুলো, আততায়ী তখন একতলায় নেমে গেছে । দোতলা থেকে আরো অনেক লোক উঠে আসছে, রানার উত্তেজিত চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তারা যে যার ধাপে । ফলে এক তলায় নামতে আরো দেরি হয়ে গেল রানার । হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আততায়ীর ছায়া পর্যন্ত দেখলো না কোথাও ।

মনে মনে লোকটার প্রশংসা করলো রানা। শ্রেফ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেল ব্যাটা। পুলিশ পুলিশ বলে চিৎকার না করলে করিডরের লোকরাই তাকে খুনী মনে করে জড়িয়ে ধরে ফেলতো।

অনেক দেরি করে, রাত প্রায় ছোটোর সময়, হোটেল লিফটনে এলো রানা। রিসেপশনে বসে ডিউটি ক্লার্ক ঝিমোচ্ছিল, পোর্টারের সাথে রানাকে দেখে চোখ কচলাতে কচলাতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

‘আমি জন প্লেয়ার,’ বললো রানা। ‘মিসেস প্লেয়ার...?’

‘জী,’ রেজিস্টার খাতা খুলে চোখ বুলালো ক্লার্ক। ‘থার্ড ফ্লোর, রুম নম্বর নাইনটি-ফোর।’ উনি বলেছেন আপনি এলে যেন ফোন করি, কেননা যদি ঘুমিয়ে পড়েন।’

ক্লার্ককে স্মৃযোগনা দিয়ে কাউন্টার থেকে ফোনের রিসিভার তুলে নিলো রানা। ‘নম্বরটা বলুন।’ নম্বর জেনে নিয়ে ডায়াল করলো ও। অপরপ্রান্তে সাথে সাথে রিসিভার তুললো লিলি।

‘হ্যালো?’

‘জেনে বসে আছো, হানি?’ হাসলো রানা। ‘যা যা বলে দিয়েছিলে সব কিনে এনেছি...।’

পোর্টারের হাতের দিকে তাকালো ক্লার্ক। তার দু’হাতে স্যুট-কেস আর ব্যাগ। ওজনের ভারে কাঁধ দুটো দু’দিকে ঢালু হয়ে আছে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ধন্যবাদ দিলো রানা, তারপর এলিভেটরের দিকে এগোতে যাবে, সবিনয়ে বাধা দিলো ক্লার্ক।

‘স্যার, আপনার পাসপোর্টটা?’

কোটের ভেতরের পকেটে হাত ভরে পাসপোর্ট বের করলো রানা। সেটা নিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো ক্লার্ক। ব্রিটিশ পাসপোর্ট, সাবজেক্টের পেশা অধ্যাপনা। মিসেস প্লেয়ারের কাছ থেকে আগেই জেনেছে সে, ইংলিশ লিটারেচারের ওপর একটা আন্তর্জাতিক সেমিনার হচ্ছে নিউ ইয়র্কে, সস্ত্রীক সেই সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন ভদ্রলোক। পাসপোর্টের ফটোর সাথে ভদ্রলোকের চেহারাটা মিলিয়ে দেখলো সে। চওড়া গৌফ, চওড়া জুলফি, নাকের পাশে লালচে জ্বরুল, চোখে বাইফোকাল চশমা—সব ঠিক আছে।

পোর্টারকে পিছনে নিয়ে চারতলায় উঠে এলো রানা। চুরানব্বই নম্বর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে নক করলো দরজায়। কী-হোলে চোখ রেখে আগে দেখে নিলো লিলি, তারপর দরজা খুললো। হোটেল শেরাটনে যাকে দেখে এসেছে তার সাথে এই লোকের চেহারা মেলে না, তবে রবিনের এই নতুন চেহারাই আশা করছিল সে। সম্ভবত কোনো পাবলিক টয়লেটে ঢুকে আগের চেহারা পাল্টে ফেলেছে রবিন।

ভেতরে ঢুকে লিলিকে জড়িয়ে ধরলো রানা, আদর করে ঠোঁট বুলালো তার গালে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে খানিকটা ঢুকে ব্যাগ আর স্যুটকেস নামিয়ে রাখলো পোর্টার, তারপর পিছিয়ে গিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে লোকটাকে বখশিশ দিলো রানা, স্যালুট হুঁকে লোকটা চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো লিলি। দু'জন দু'জনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ তাকিয়ে থাকলো।

‘ভাগ্যিস তুমি ইনসিস্ট করেছিলে,’ বললো লিলি, ‘তা না হলে আরেক জোড়া পাসপোর্ট তৈরিই হতো না।’



‘মস্কো থেকেই নিয়ে আসতাম, কিন্তু হেডকোয়ার্টার আমাকে বলে দেয়া হয় জানাশোনা লোক আছে তোমার, কাগজ-পত্র জাল করার ব্যাপারে তাদের জুড়ি নেই, সেজন্যেই দায়িত্বটা তোমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলাম। সত্যি সত্যি কাজে লাগবে তা কিন্তু ভাবিনি!’

ব্যাগ আর স্মার্টকেসের দিকে তাকালো লিলি। ‘সবই দেখছি নতুন।’

‘হ্যাঁ,’ মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘আবার সব ফেলে আসতে হয়েছে।’

‘কেন?’ রানার দিকে এক পা এগোলো লিলি। ‘কি ঘটলো ওখানে?’

‘তুমি আন্দাজ করতে পারোনি কি ঘটেছে?’ পান্টা প্রশ্ন করলো রানা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

‘কি বলতে চাও তুমি?’ আড়ষ্ট হয়ে গেছে লিলি।

একটা হাত তুললো রানা, অর্থাৎ তর্ক করার ইচ্ছে নেই। ‘আবার, লিলি। আবার খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। একা আমাকে নয়, আমাদেরকে।’

বিড়বিড় করে লিলি বললো, ‘মাই গড!’ নিজের অজান্তেই তার একটা হাত উঠে গেল গালের কাছাকাছি। কি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিতে গেল সে, কিন্তু তার আগেই সেটা থপ্ করে ধরে ফেললো রানা।

‘ছাড়ো!’ হাতটা মুচড়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো লিলি।

‘আমি একটা আহাম্মক,’ গাল পাড়লো রানা। ‘এমন বোকামি মানুষ করে। তখনই আমার বোঝা উচিত ছিলো!’ লিলির হাত ছেড়ে দিলো ও। ‘খোলো আবার, দেখতে দাও।’

লিলির চেহারায় রাগ ছিলো, হঠাৎ ছ'চোখ ঝিক্ করে উঠলো কৌতুক আর প্রশংসা । শরীরে মৃদু ঢেউ তুলে রিনরিনে গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কি ? কি খুলবো ? কাপড় ?'

হঠাৎ খেপে গেল রানা । ছ'হাতে লিলির কাঁধ খামচে ধরলো ও । আধ পাক ঘোরালো । তারপর ধাক্কা দিলো সজোরে । ছিটকে গিয়ে বিছানার ওপর চিৎ হয়ে পড়লো লিলি । উঠে বসতে যাবে, দ্রুত বিছানার সামনে এসে ঠাস করে চড় কষালো গোলাপি গালে ।

ফুঁপিয়ে উঠে ছ'হাতে মুখ ঢাকলো লিলি । কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠলো তার পিঠ ।

বিছানার কিনারায় বসে সিগারেট বের করলো রানা । খানিক পর লিলির কান্না থামলো । কিন্তু নড়লো না সে, যেমন দ পাকিয়ে শুয়েছিল তেমনি শুয়ে থাকলো ।

আবার জিজ্ঞেস করলো রানা, 'খুলবে ?'

কয়েক সেকেন্ড পর বিছানায় উঠে বসলো লিলি । ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করলো কানের তুল জোড়া । পাশাপাশি কয়েকটা কালচে লম্বা দাগ ফুটে রয়েছে গালে ।

একটা একটা করে খুলে ছোটো তুলই রানার বাড়ানো হাতে তুলে দিলো লিলি । ছ'হাতের তালুতে নিয়ে আলাদাভাবে এক একটার ওজন অনুভব করলো রানা । ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো একটা । নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করলো ওর । আততায়ীরা প্রথমবার বার্থ হবার পর সন্দেহবশতঃ রানা লিলির তুল জোড়া দেখতে চেয়েছিল । আকারে ওগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বড়, সেটাই ওর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে । হাতে নিয়ে দেখার সময় ছোটোর মধ্যে একটাকে একটু বেশি ভারি মনে হয়, তাই শুধু সেটাকেই খুঁটিয়ে

পরীক্ষা করে রানা, এবং ছলটার ভেতর থেকে একটা মিনি রিপার বেরিয়ে আসে। রিপারটা বেরিয়ে আসার পর ছলটা অপারটার চেয়ে বেশি হালকা হয়ে গেল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেনি ও। অথচ দেখা উচিত ছিলো।

আজও ব্যর্থ হয়েছে আততায়ীরা। স্বভাবতই রানার মনে পুরনো প্রশ্নটা ফিরে এসেছে আবার—আততায়ীরা জানলো কিভাবে কোন্ হোটেলে উঠেছে ওরা? প্রথমবার রিপারের সাহায্যে জেনেছিল। যদি বলা হয়, দ্বিতীয়বার তারালিলিকে অনুসরণ করে রানার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল, তর্কের খাতিরে তা-ও নাহয় মেনে নেয়া যায়। কিন্তু আজ, তৃতীয়বার? শেরাটনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে বসতে না বসতে এক লোকের হাত থেকে খুচরো পয়সা পড়ে যায়—সেদিকে পিছন ফিরে থাকলেও সামনের দেয়ালে আয়না ছিলো, লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পায় রানা। ফোন বুদে ঢুকে লোকটা কাকে যেন টেলিফোন করে। মাত্র ছ'একটা কথা বলে রুদ থেকে বেরিয়ে আসে সে, বার কাউন্টারের গায়ে আবার হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। রানা একটা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে লিলিকে তিনতলায় ওদের কামরায় যেতে বলে। লিলি রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতেই লোকটা আবার ফোন বুদে ঢুকে কাকে যেন ফোন করে।

রানার ধারণা হয়, ওদের কামরায় ওত পেতে বসে আছে আততায়ী, ওর আর লিলির গতিবিধি সম্পর্কে ফোনে খবর পাঠাচ্ছে রেস্টুরেন্ট থেকে কালো হ্যাট। অমনি অভিনয় শুরু করে দেয় রানা। সিদ্ধান্ত নেয়, লিলির বদলে নিজেদের কামরায় সে নিজেই যাবে—আসলে যাবে না, যাবার ভান করবে।

ফাঁদ একটা আছে, এটা অনুমান করে প্রতিপক্ষদের জ্ঞে ফাঁদ

পাতে রানা । ওর ফাঁদে ধরা দিয়েছে প্রতিপক্ষ, নিজেদের একজনকে হারিয়েছে তারা । কিন্তু পুরনো প্রশ্নটার উত্তর ওকে জানতে হবে । আততায়ীরা জানলো কিভাবে কোথায় উঠেছে ওরা ?

উত্তরটা কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারলো রানা, সেজন্যেই নিজের ওপর রেগে গেছে ও । যে ছলটার ভেতর রিপার ছিলো সেটা এখন সত্যি হালকা, কিন্তু অপরটা একটু বেশি ভারি । কিন্তু তা হওয়া-  
য়ার কথা নয় । কোনো ঘাপলা না থাকলে ছোটোরই ওজন এক হওয়া  
দরকার ।

হালকাটা আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে, তবু আরেকবার পরীক্ষা  
করলো রানা । ক্ষুদে বোতাম টিপতে ছ'ফাঁক হয়ে গেল ছল, কিন্তু  
ভেতরটা ফাঁকা । দ্বিতীয়টাতেও ক্ষুদে একটা লুকানো বোতাম রয়েছে ।  
নখ দিয়ে চাপ দিতে এই ছলটাও ছ'ফাঁক হলো, এবং ভেতর থেকে  
খসে পড়লো ছোট্ট একটা রিপার । এটা আগেরটার চেয়েও ছোটো ।

থমথমে চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি ।

মুখ তুললো রানা । 'কি বলবে জানি । কে. জি. বি. রেসিডেন্টের  
চাকরি করো, তার নির্দেশ ফেলতে পারোনি, এই তো ?'

একটা ঢোক গিললো লিলি । মুখ্য কথা নেই । মনে মনে রানাকে  
আন্ত একটা গর্দভ ভাবছে সে ।

'কিন্তু এটা কোনো যুক্তি নয়, লিলি,' বললো রানা । 'রেসিডেন্ট-  
কে অনেক কথা বলে এড়িয়ে যেতে পারতে তুমি । বলতে পারতে  
রবিন ছোটো রিপারই দেখে ফেলেছে ।'

'তা পারতাম,' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললো লিলি । 'কিন্তু যদি বলি  
আমিও চেয়েছিলাম আমরা কোথায় যাই না যাই রেসিডেন্ট সব  
সময় জানুন ? যদি বলি তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না ?'

‘বলতে হবে না, আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না,’  
তিক্ত একটু হাসলো রানা।

লিলির চোখ জোড়া সামান্য একটু বড় হলো। ‘জানো ?  
তাহলে...তাহলে আমাকে তুমি সাথে রেখেছো কেন ? ইচ্ছে কর-  
লেই তো বিদায় করে দিতে পারতে।’

‘পারতাম। কিন্তু দেইনি এই কারণে যে অদৃশ্য শত্রু আরো বেশি  
বিপজ্জনক !’

‘কি !’ প্রায় আঁতকে উঠলো লিলি। ‘আমাকে তুমি শত্রু বললে ?’

‘নও ?’ বিষন্ন হাসলো রানা। ‘জানো সাথে রিপার রাখলে খুনীরা  
আমাকে খুন করার চেষ্টা করবে, তবু রেখেছো। জানো মন্সো আমার  
বিশ্বস্ততা যাচাই না করে পাঠায়নি, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে  
পারোনি। শত্রু নও তো কি ?’

কষ্টাজিত একটু হাসি ফুটলো লিলির ঠোঁটে। ‘আমাকে নিয়ে  
খুব বিপদে পড়ে গেছো, তাই না ? শত্রু অথচ বিদায় করে দিতে  
পারছো না !’ একটু থামলো সে, তারপর ফোঁস করে উঠলো, ‘তুমি  
একটা একচোখো ! রিপার সাথে রাখায় আমাকেও বারবার প্রাণ  
হারাবার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না ? ভেবেছো ওটা  
আমি সাধ করে সাথে রেখেছি... ?’

‘এই না বললে...।’

‘বলেছি বেশ করেছি !’ দু’হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো  
লিলি। ধরা গলায় বললো, ‘বারবার তোমার কাছে ছোটো হতে  
হচ্ছে আমাকে—মেজাজ ঠিক রাখা সম্ভব ? রাগের মাথায় যা মুখে  
এসেছে তাই বলেছি...।’

‘তারমানে আমার প্রথম অনুমানটাই ঠিক,’ বললো রানা।

‘রেসিডেন্টের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়েছো তুমি।’ পকেট থেকে রুমাল বের করে লিলির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো ও।

চোখ মুছতে মুছতে মাথা ঝাঁকালো লিলি।

‘আর কোনো রিপার আছে তোমার সাথে?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

মাথা নাড়লো লিলি। ‘তুমি জানো না, প্রথমবার আমাদের ওপর হামলা হবার পর রেসিডেন্টের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছিলাম আমি। তার লোকজনের মধ্যে গ্রু-র চর আছে এ-কথা বলেছি। দ্বিতীয় রিপারটা ফেলে দেয়ার অনুমতি চাই আমি তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ছ’একদিনের মধ্যে গ্রু-র চরকে খুঁজে বের করে ফেলবেন তিনি।’

রানা জানে কিছু কথা সত্যি বলছে লিলি, কিছু কথা ভাড়া মিথ্যে, তবু সহাস্য বদনে সব হজম করলো ও। ‘তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি নও, শত্রু আসলে রেসিডেন্ট।’

‘তিনিও নন,’ বললো লিলি। ‘তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গ্রু-র লোকটাকে চিনে বের করতে পারেননি। তাঁর উদ্দেশ্যটাকে খারাপ বলতে পারো না, আমাদের নিরাপত্তার জন্যেই আমরা কখন কোথায় থাকি না থাকি জানার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি...।’

‘কিন্তু আমি চেয়েছি আমরা কোথায় থাকবো বা কি করবো কেউ তা জানবে না,’ স্লান হাসলো রানা। ‘মস্কো আমার এই শর্তে রাজি হয়েছিল। রেসিডেন্টের তা না জানার কথা নয়। তারমানে হেড-কোয়ার্টারের নির্দেশ মানছে না সে।’

‘হয়তো মস্কো তোমাকে এক কথা বলেছে, রেসিডেন্টকে বলেছে অন্য কথা। তুমিও জানো, এসপিওনাজে মুখে যা বলা হয় কাজে

তা করা হয় না। এই পেশার এটাই দস্তুর।’

‘কিন্তু আমি ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোকের এক কথা।’

ভেজা ভেজা চোখ তুলে তাকালো লিলি। ‘কি সেটা?’

‘হেডকোয়ার্টার আমাকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দিতে চাইলে এক শর্তে রাজি হই আমি,’ বললো রানা। ‘আমার আদেশ না মানলে তাকে আমি বিদায় করে দিতে পারবো।’

লিলির চেহারা থেকে সমস্ত রক্ত এক নিমেষে নেমে গেল। ‘তার-  
মানে... তুমি... আমাকে...?’

‘হ্যাঁ,’ কঠিন সুরে বললো রানা। ‘তোমাকে আমি বিদায় করে দিচ্ছি। রিপারটা এখনো কাজ করছে, তারমানে গ্রু-র চর জানে কোথায় রয়েছি আমরা। তুমি কখন বেরিয়ে যাবে তার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। দশ মিনিট পর আমিও বেরিয়ে যাবো, অন্য কোনো হোটেলে উঠবো। সাবধান, পিছু নেয়ার চেষ্টা করো না। আর তোমার রেসিডেন্টকেও বলে দিয়ো, আমার ব্যাপারে নাক গলাতে চেষ্টা করলে তার পরিণতি ভালো হবে না।’

চেহারায় ব্যাকুলতা, খপ্ করে রানার হাত ধরার চেষ্টা করলো লিলি। ‘রবিন...!’

সাঁধ্যা করে সরে গেল রানা, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দৃঢ় পায়ে দরজার সামনে চলে এলো ও। কবাট খুলে বললো, ‘আমি অপেক্ষা করছি।’

আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো লিলি, কিন্তু রানার চোখে কাঠিন্য দেখে বুঝলো শতো অনুরোধেও কোনো লাভ হবে না আর। ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে নিলো সে। স্থিরভাবে বসে থাকলো আরো কয়েক সেকেন্ড। তারপর নিঃশব্দে নামলো বিছানা থেকে,

ক্লান্ত পায়ে দরজার দিকে এগোলো ।

রানার সামনে থামলো লিলি । ‘যাচ্ছি,’ ফিসফিস করে বললো সে । ‘কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যেতে দাও ।’

রানা কঠিন । নির্বাক ।

‘একদিন হয়তো তুমি জানতে পারবে যে লিলি মেয়েটা ভালো ছিলো না,’ শান্তভাবে বলার চেষ্টা করলেও, লিলির গলা কেঁপে গেল । ‘কিন্তু জেনো, যাই সে করে থাকুক, কখনো তোমার অমঙ্গল চায়নি । ক’দিনেরই বা পরিচয়, তোমার সম্পর্কে কতোটুকুই বা জানি আমি—কিন্তু যতোটুকুই জেনেছি, শ্রদ্ধা করার জন্যে যথেষ্ট । নিজের রূপ-যৌবন নিয়ে বড় গর্ব ছিলো আমার, কিন্তু দেখলাম এমন পুরুষও ছনিয়ে আসছে পাশে শুয়েও আমার দিকে হাত না বাড়িয়ে থাকতে পারে ।’

রানা নিরুত্তর ।

‘আরো কিছু কথা বলার ছিলো,’ ঠোঁট কামড়ে বললো লিলি । ‘বলতে গেলে কেঁদে ফেলবো, থাক... ।’ রানাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো লিলি । ডুঁকরে কেঁদে উঠে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে ।



# দুই

---

কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে ট্যাক্সি। সকালটা রোদ ঝলমলে। পিছনের সিটে হেলান দিয়ে ডেইলি নিউজ পড়ছে রানা। ডাইভারের পিছনে প্লাস্টিক প্যানেলটা সিলিং ছুঁয়ে রয়েছে, ওরা কথা বললেও লোকটা শুনতে পাবে না।

‘এই ফ্যানাটিকদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে মানুষ,’ বিড়বিড় করে বললো রানা।

‘কাদের কথা বলছো?’ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো লিলি, রানার দিকে ফিরে ওর কাঁধে চিবুক ঠেকালো, চোখ রাখলো খোলা কাগজটার ওপর। ‘স্বাইজ্যাকার?’

‘দেখো না,’ বললো রানা, ‘আবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছে। তিনশো আরোহী জিম্মি, বাধা দিতে চেষ্টা করায় তিনজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।’

‘হ্যাঁ, আজকাল বড় বেশি প্লেন হাইজ্যাক হচ্ছে...।’

কাল রাতে সিঁড়ির মাথা থেকে লিলিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রানা। সত্যি সত্যি তাকে বিদায় করে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই ওর

ছিলো না, তবে যেন বিদায় করে দিতে চায় এই অভিনয়টুকু করার দরকার ছিলো। তবু মনে মনে একটা কথা স্বীকার না করে পারেনি রানা—যদি সত্যি সত্যি লিলিকে বিদায় করে দেয়ার ইচ্ছেও ওর থাকতো, বিদায়-মুহূর্তে তার শেষ কথাগুলো শুনে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত পান্টাতে বাধ্য হতো ও। তার কথায় যে ভাব আর আবেগ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে যে-কোনো পাষাণেরও মন গলে যাবার কথা। লিলির মনের উপলব্ধি আর ভাবাবেগ তরল সোনার মতো চোখ আর মুখ বেয়ে ঝরে পড়তে দেখেছে রানা। চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, কামরা থেকে লিলি বেরিয়ে যাবার কয়েক সেকেন্ড আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিল রানা। তবু নিজেকে কঠোর শাসনে বেঁধে রাখে ও। লিলি সিঁড়ির মাথায় পৌঁছানোর আগে পিছু ডাকেনি।

লিলির শেষ কথাগুলো ভীষণভাবে স্পর্শ করেছিল রানাকে। লিলির হয়তো ধারণা, কথাগুলো পুরোপুরি অর্থ একা শুধু সে-ই জানে, রানা জানে না। কিন্তু লিলি যা বলতে চেয়েছে তার সবটুকু তো বুঝেছেই রানা, তারচেয়ে বেশি আন্দাজ করে নিয়েছে—সেজন্যেই মেয়েটার প্রতি নিজেকে অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও। এরকম একটা মেয়ের প্রতি কার না মমতা জাগে!

ট্যাক্সি ডেকে রাতেই ওরা হোটেল বদল করেছিল, তবে নতুন হোটেল উঠেও কেউ ওরা ঘুমাতে পারেনি। কারণটা ভয় নয়, অণু কিছু। প্রেমের লেন-দেন একবার শুরু হলে কারই বা সময়-জ্ঞান থাকে!

‘আমি শুধু প্লেন-হাইজ্যাকারদের কথা বলছি না!’ লিলির মনে হলো রেগে গেছে রানা। ‘বলছি টেরোরিস্টদের কথা! সারা দুনিয়া

জুড়েই এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ওরা, গুরুতর একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।’ লিলিকে বলার উপায় নেই, আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সদ্য গঠিত একটা অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনে যোগ দিয়েছে রানা। অল্প কিছু দিন হলো। ‘বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এর পরিণতি যে ভয়াবহ, বুঝেও কেউ তা বুঝতে চাইছে না। আমার তো সন্দেহ হয়, টেরোরিস্টদের দমন করতে না পারলে ওরাই একদিন বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে।’

‘তোমার ডালচিমস্কিও কি সে-ধরনের একজন টেরোরিস্ট?’ হঠাৎ জানতে চাইলো লিলি।

‘অফকোর্স!’ মুঠো পাকালো রানা। ‘লোকটাকে ধরতে পারলে এমন শাস্তি দেবো যে...।’

তাড়াতাড়ি মুখে হাতচাপা দিলো লিলি, কিন্তু তাতেও হাসির শব্দ আটকানো গেল না। রানা ওর দিকে কটমট করে তাকাতে বললো, ‘সরি। হাসি পেলো এই জন্যে যে...।’

‘জানি,’ স্নান মুখে বললো রানা। ‘কোথায় সে তা-ই আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না, অথচ শাস্তি দেয়ার কথা ভাবছি, হাসি তো পাবেই। কে জানে, হয়তো ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হবে...।’

চিংড়ি মাছের মতো ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে রানার বুকের ওপর পড়লো লিলি। বোতাম খোলা জ্যাকেটের ভেতর হাত গলিয়ে শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো। ‘এতোক্ষণে একটা কাজ পেলাম!’

‘মানে?’

‘আমার ওপর নির্দেশ আছে, তোমাকে সব সময় হাসি-খুশি

রাখতে হবে,’ শার্টের বোতাম খুলে রানার লোমশ বুকে মুখ ঘষলো লিলি। ‘তোমাকে উৎসাহ আর প্রেরণা যোগানো আমার প্রথম দায়িত্ব।’

গম্ভীর হলো রানা। ‘খুবই পবিত্র দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু শার্ট আর ট্রাউজারের বোতাম এক নয়, এটা আগে বুঝতে হবে তোমাকে।’

মুহূর্তের জন্তে স্থির হয়ে গেল লিলি, তারপরই অদম্য হাসিতে কঁপে উঠলো তার সারা শরীর। ‘কি অসভ্য রে বাবা!’

ইউনাইটেড এয়ার ট্রাভেলস-এর অফিস থেকে টিকেট সংগ্রহ করলো ওরা। ওদের নির্দেশে এরপর সরাসরি ইউনাইটেডের নিজস্ব টার্মিনালের সামনে চলে এলো ড্রাইভার! এয়ারপোর্টে আসার পথে নো রিস্ক সেফ ডিপোজিট কোম্পানীর বক্স থেকে লম্বা একটা কেস ছাড়িয়েছে রানা। নিগ্রো পোর্টার সেটার দিকে কেমন সন্দেহের চোখে তাকালো, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না। প্রশ্ন করলো শ্বেতাঙ্গ টিকেট ক্লার্ক।

‘হ্যাঁ, এটা একটা রাইফেল,’ বললো রানা। ‘হান্টিং রাইফেল। চেক করিয়ে নিয়ে যেতে পারবো কি?’

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ক্লার্ক।

‘খুব দামী জিনিস, কাজেই সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন, তা না হলে ইন্সুরেন্স আপনাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে বসবে,’ সাবধান করে দিলো রানা।

‘অফকোর্স, স্যার,’ সবিনয়ে বললো টিকেট ক্লার্ক। ‘এবার আপনাদের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট জেনে নিন। বলেছিলেন স্ন্যাক করবেন, তাই না? তাহলে নাইন-এ আর বি। হ্যাভ এ গুড ক্লাইট, স্যার।’

কিন্তু ঝামেলা এখানেই শেষ হলো না। রানা আর লিলির মতো রেডিওতে পাসপোর্ট অফিসাররাও হোটেল শেরাটনের ঘটনাটা শুনেছে। একজন মানুষ খুন হয়েছে ওখানে। খুনী পালিয়েছে। এবং হোটেল থেকে অদৃশ্য হয়েছে একটা দম্পতি। চেহারার বর্ণনা জানিয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছে পুলিশ আর এফ. বি. আই.। রানার মতো লিলির চেহারাও আজ সকালে বদল হয়েছে, চেহারার সাথে পাসপোর্টের ফটো ছবছ মিলে গেল।

কিন্তু কাস্টমস চেকিংয়ের সময় আটকে গেল ওরা। গেট দিয়ে ঢোকান সময়ই মেটাল ডিটেকটর ফাঁস করে দিলো রানার সাথে পয়েন্ট টু টু রয়েছে।

‘টার্গেট পিস্তল, আনলোডেড,’ ব্যাখ্যা করলো রানা।

‘সরি, মিঃ প্লেয়ার। অ্যাটাচি কেসে করে ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না।’ ইউনিফর্ম পরা অফিসার মাথা নাড়লো। ‘এফ. এ. এ. রুলসে নিষেধ আছে। গন্তব্যে পৌঁছে ওটা আপনি ফেরত পাবেন।’

কোনো মন্তব্য না করে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। অ্যাটাচি কেস খুলে বের করে দিলো পিস্তলটা।

‘ধন্যবাদ, এবার আপনারা যেতে পারেন।’

ওদের বাহন ডিসি-৮, ফাস্ট ক্লাস কমপার্টমেন্ট অর্ধেকও ভরেনি। সোনালি ডানার চিলের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে টেক-অফ করলো, নিখুঁত দাড়ি কামানো পাইলটের রয়েছে বিশ হাজার ঘণ্টা প্লেন চালাবার অভিজ্ঞতা। শুধু ফাস্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টেই মেদহীন চারজন স্টুয়ার্ডেসকে দেখা গেল, হাতে হাতে দিয়ে গেল তাজা ফুল আর কানে কানে মধুরা হাসি, উপরি

পাওনা হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত সুগঠিত পায়ের প্রদর্শনী। দিক বদল করে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলো ডগলাস জেট, মাটি ছাড়ার নয় মিনিট পর পরিবেশিত হলো বিনা পয়সায় আরোহীদের পছন্দ মতো পানীয়।

কি যেন ভাবছে রানা।

‘পেনি ফর ইওর থটস।’ লিলি হাসছে না।

মাথা নাড়লো রানা। ‘যতো কম জানবে ততোই তোমার জন্যে ভালো। ভিলেন টাইপের কেউ যদি তোমাকে জেরা করে, তুমি কিছু না জানলে আমি নিরাপদে থাকবো।’

শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিলো লিলি। ‘কেন, ভিলেনরা কেউ আমাকে জেরা করবে কেন?’

‘কারণ ভিলেনদের স্বভাবই তাই।’

সময়মতো লাঞ্চ দিয়ে গেল স্টুয়ার্ডেস। একাধিক ভি. সি. আর. চালু রয়েছে। হেডসেট আর ইয়ার প্লাগও আছে, পাঁচটা চ্যানেলের যে-কোনো একটার সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনা যেতে পারে।

‘আরো ত্র্যাণ্ডি দেই?’ সোনালি চুলের স্টুয়ার্ডেস জিজ্ঞেস করলো।

নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে উঠলো লিলির। ‘না, লাগবে না।’

কিন্তু প্রশ্নটা করা হয়েছে রানাকে। ওর কাছ থেকে উত্তর পাবার আশায় একটু বুঁকে দাঁড়িয়েই থাকলো স্টুয়ার্ডেস। খানিক আগেই লক্ষ্য করছে লিলি, বেহারার মতো বারবার শুধু রবিনের দিকেই তাকাচ্ছে মেয়েটা।

আবার জিজ্ঞেস করলো স্টুয়ার্ডেস, ‘মিঃ প্লেয়ার, মোর ত্র্যাণ্ডি?’

রানার শুনতে পাবার কথা নয়, হেডসেট পরে রয়েছে। লিলি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু স্টুয়ার্ডেসকে হাত বাড়াতে দেখে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লো সে।

রানার মাথা থেকে আলগোছে হেডসেটটা খুলে নিলো স্টুয়ার্ডেস, মুখে মুক্তো ঝরা হাসি, চোখে কৌতুক মেশানো দুটামির ভাব। প্রশ্নটা আবার করলো সে।

লিলির দিকে তাকালো রানা। ‘তুমি কি বলো, হানি?’

‘মাত্র তিনটে বাজে, আর তোমাকে খেতে দেবো না,’ প্রয়োজনের চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো লিলি। ভুলেও স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকালো না। রানার কাঁধে মাথা রাখলো সে। ‘ঘুম পাবে।’

স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফিরে অসহায় ভঙ্গিতে মুক্ত কাঁধটা ঝাঁকালো রানা।

স্টুয়ার্ডেস চলে যেতে রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সাপের মতো হিস হিস করে উঠলো লিলি, ‘ডাইনী!’

‘আত্মসমালোচনা ভালো জিনিস,’ সহাস্যে বললো রানা। ‘কিন্তু সেটা মনে মনে করা উচিত।’

‘কে বললো আত্মসমালোচনা করছি?’ ফৌস করে উঠলো লিলি। ‘গাল দিচ্ছি ওকে!’

‘কেন, কেন?’ অবাক হবার ভান করলো রানা।

‘বেহায়া, এক নম্বর ছোটোলোক, আস্ত একটা ডাইনী! এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন তোমাকে গিলে খাবে!’

জানাঘা দিয়ে বাইরে তাকালো রানা। তারপর লিলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, ‘আকাশের কতোটা ওপরে উঠেছি বলতে পারবে? বেহেশতের কাছাকাছি চলে আসিনি তো?’

কোথায় গেল ঈর্ষা, খিল খিল করে হেসে উঠলো লিলি। তারপর ফিসফিস করে বললো, ‘তুমি একজন কমিউনিস্ট হয়ে এ-সব রাবিশ বিশ্বাস করো—দোজখ, বেহেশত?’

‘ভয়ে বলবো নাকি নির্ভয়ে?’

‘নির্ভয়ে।’

রানার সংক্ষিপ্ত উত্তর, ‘করি।’

‘তুমি? একজন কমিউনিস্ট?’ হাঁ হয়ে গেল লিলি। ‘ওহ, গড!’ পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা, একসাথে সশব্দে হেসে উঠলো।

তারপর রানা বললো, ‘ধর্মের চেয়ে জোরালো আফিম আর হয় না।’

‘ধর্মের কথা বাদ দাও,’ বললো লিলি। ‘তোমার কথা বলো। আমি তোমাকে বুঝতে চাই।’

‘আমি কর্মে বিশ্বাসী, আবার আমি ভোগীও,’ বললো রানা। ‘আমার ভেতর ভালো কাজ করার প্রবণতা জন্মগত, প্রবণতাটা কিছু পাবার আশার মুখাপেক্ষী নয়। আমার ভেতর ধ্বংসের বীজও লুকিয়ে আছে, ধ্বংস আমি করিও, তবে বিবেকের নির্দেশে ন্যায়ের স্বার্থে ধ্বংস করি। মানুষ হয়ে জন্মেছি সেজন্যে নিজেকে ভাগ্যবান বলে জানি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ক্রটিহীন, আদর্শ মানুষ আমি কোনো দিনও হতে পারবো না, কারো পক্ষেই হওয়া সম্ভব নয়—সেজন্যে আমার ক্ষোভ আর যন্ত্রণার শেষ নেই...।’

‘তুমি ভোগী, এই কথাটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?’ মনোযোগী ছাত্রীর মতো গালে হাত দিয়ে একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে লিলি।



‘সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমি মহান এক শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ উপলব্ধি করতে পারি,’ বললো রানা। ‘অপূর্ব সুন্দর যে-কোনো জিনিস আমাকে আলোড়িত এবং মুগ্ধ করে, শুধায় সেই শিল্পীর প্রতি নত হয়ে আসে আমার মাথা, কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে যায় অন্তর। নগণ্য আমি, কিন্তু ভাগ্যবান, এই অনুভূতি গ্রাস করে আমাকে। নারীদেহ সেই মহান শিল্পীর এক মহৎ সৃষ্টি।’ ওর চোখের তারায় ঝিক্ করে উঠলো ছুঁচামি। ‘আমি সেই মহৎ সৃষ্টির একজন সমঝদার হবার চেষ্টায় থাকি।’

‘সোজা কথায়, আমি তাহলে একটা শিল্প?’ আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলো লিলি। ধীরে ধীরে রানার কাঁধে হাত রাখলো সে। দু’জন দু’জনের চোখে তাকিয়ে আছে। ‘তাহলে বলো, আমি কেমন শিল্প?’

‘খুবই উচুদরের শিল্পকর্ম,’ শিল্প সমালোচকের মতো গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘যদি লজ্জা না পাও তাহলে ব্যাখ্যা করতে পারি। প্রথমে ধরা যাক তোমার বুকের গঠন...।’

দাঁত দিয়ে জিভের ডগা কেটে রানার মুখে হাতচাপা দিলো লিলি। ‘পাগল নাকি! মুখে একটু লাগাম নেই!’ হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠলো সে। ‘বলে কি, কতোক্ষণ হুঁশ ছিলো না আমাদের?’

লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দেয়ালের দিকে তাকালো রানা। লাল হরফে কয়েকটা আলোকিত লেখা ফুটে উঠেছে বোর্ডে—সিট বেন্ট বেঁধে নিন। এখন থেকে আর সিগারেট খাওয়া যাবে না। আমরা লাস ভেগাসে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি। ইত্যাদি।

একটু পরই স্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠলো।

প্লেন থেকে যেন গরম তন্দুরে নেমে এলো ওরা। ছায়ায় সাতাশি

ডিগ্রী টেমপারেচার । বহুদূর পর্যন্ত কোনো ছায়া নেই । হিম টামি-  
নাল ভবনে ঢুকে হাঁফ ছাড়লো ওরা । চারদিকে নারী-পুরুষের ভিড়,  
কিন্তু শুধু মেয়েদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো লিলি । ‘একি,  
রবিন !’

‘আগে বোধহয় লাস ভেগাসে আসোনি তুমি, তাই না ?’ সকৌ-  
তুকে জিজ্ঞেস করলো রানা । ‘আমার কথা বিশ্বাস হলো এবার ?  
নারীদেহ মহান এক শিল্পীর মহৎ এক শিল্প, কথাটা লাস ভেগাসের  
মেয়েদের চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ জানে না ।’

‘নিশ্চয়ই ট্রেনিং নিয়েছে ওরা,’ বিহ্বল ভাবটা এখনও কাটিয়ে  
উঠতে পারছে না লিলি । ‘চর্চা না করলে এ কসরত দেখানো  
অসম্ভব ।’

‘সোফিয়া লরেনের মতো ? ছ’দিকে সার সার টুলের ওপর ফুট-  
বল রাখা থাকতো, মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কোমর ঝাঁকিয়ে  
বলগুলোকে টুলের মাথা থেকে ফেলে দিতো—নিতম্বে ঢেউ তোলা  
এভাবে শেখে সে ।’

শুধু নিতম্বের ঢেউ নয়, চারদিক থেকে ক্লিক ক্লিক শব্দেও অস্থির  
হয়ে উঠলো লিলি । রানার পিছু নিয়ে বারবার ডানে বায়ে ঘাড়  
ফেরাতে হলো তাকে । জিজ্ঞেস করলো, ‘সব্বাই এখানে জুয়াড়ি  
নাকি ?’

স্ট্রট মেশিনগুলোকে একবার দেখ নিলো রানা । প্রতিটি মেশিন  
গোথাসে খুচরো পয়সা গিলছে । ‘এদের তুমি ঠিক জুয়াড়ি বলতে  
পারো না—ক্যাপাটে বলতে পারো । লাস ভেগাসে এদের সংখ্যাই  
বেশি । কে কতো তাড়াতাড়ি পকেট হালকা বা ভারি করতে পারে  
তারই প্রতিযোগিতায় মেতে আছে সবাই । সত্যিকার জুয়াড়িও

আছে, তবে সংখ্যায় তারা কম।' রানা ব্যাখ্যা করলো, সময়টা হপ্তার মাঝামাঝি, লাস ভেগাসে এখন শুধু সেমিনার অনুষ্ঠানের ধুম লেগে থাকবে। জুয়াড়িরা আসতে শুরু করবে শুক্রবার থেকে, সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকবে তারা। মঙ্গল, বুধ, আর বৃহস্পতি, এই তিন দিন লাস ভেগাসের হোটেলগুলো কম পরসায় জুয়া খেলার সুযোগ করে দেয়, তা না হলে সেমিনারে যারা আসে তারা খেলবে না।

ভেগাসে ছাব্বিশ হাজার হোটেল আর মোটেল রুম রয়েছে। তিন লাখ ধর্মভীরু মানুষ স্থায়ীভাবে বাস করে এখানে, ভীতি প্রকাশের জন্যে একশো তেতাল্লিশটা চার্চ ব্যবহার করা হয়। গেমিং টেবিলের সংখ্যা এক হাজার, ষোলো হাজারের কিছু বেশি স্লট মেশিন, এয়ারপোর্টেরগুলো সহ।

শুধু এম. জি. এম. গ্র্যাণ্ড হোটেলেই রয়েছে একুশ শো কামরা, হোটেলটার আকার-আকৃতি আর জৌলুসের সাথে তুলনা করলে তাজমহলকে মনে হবে পুতুল-ঘর। বারোটা সুইমিং পুল, বত্রিশটা রেস্টোরান্ট, আঠারোটা ডান্স ফ্লোর, ক্ষুদ্রতম পোশাক পরা সুন্দরতম ক্যাবারে নর্তকীদের সংখ্যা কয়েক শো, পাঁচশোর বেশি রুলেং টেবিল, এগারোটা টেনিস কোর্ট, দুটো খেলার মাঠ—তালিকা বাড়তেই থাকবে।

দুটো হিলটন রয়েছে ভেগাসে, বড়টায় কামরা রয়েছে দেড় হাজার। সার্কাস সার্কাস নামে একটা সার্কাস পার্টি আছে, টিকেট কেটে যে-কেউ তাদের চারশো পঁচিশটা কামরার যে-কোনো একটায় ঢুকে বন্য, পোষ মানানো পশুদের কাছাকাছি থেকে দেখতে পারে। নামকরা হোটেল, যেমন স্যাণ্ডস, কাইজার'স প্যালেস, রিভারিয়া

থাণ্ডারবার্ড এবং ট্রপিকানা-র রয়েছে নিজস্ব ক্যাসিনো । হোটেলের  
খদ্দের বা ক্যাসিনোর জুয়াড়ি নিঃসঙ্গ বোধ করলে কতৃপক্ষ কোনো  
আলাদা পয়সা ছাড়াই মনোলোভা সঙ্গিনী জুটিয়ে দেবে ।

‘তারমানে গোটা ব্যাপারটা সেক্স-কেন্দ্রিক !’ মন্তব্য করলো লিলি ।

‘সেক্সের কথা কখন বললাম ! আমি টাকার কথা বলছিলাম !’

‘বাট মানি ইজ সেক্স, রবিন !’

‘ইউ আর ব্যানানা । মানি ইজ পাওয়ার,’ দৃঢ় কণ্ঠে ভুলটা শুধরে  
দিলো রানা ।

‘ওই একই হলো । মানি ইজ পাওয়ার ইজ সেক্স, লুইচ এক্স-  
প্লেইনস ক্যাপিটালিজম ।’

টামিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিলো ওরা । আলো-  
চনা থেমে নেই ।

রানা বললো, ‘বলতে চাইছো ধনীরা টাকার পাহাড় গড়ছে,  
আর প্রসেসটাই এমন যে তাতে করে গরীবদের শোষিত না হয়ে  
উপায় নেই ?’

‘একটু বেশি সহজ করে দেখছো ব্যাপারটাকে, তবে ঠিক লাইনে  
এগোচ্ছে । বলতে গেলে তুমি নিজেও এক ধরনের ক্যাপিটা-  
লিস্ট ।’

‘আমি ?’

‘এক অর্থে । তুমি ভালোভাবে বেঁচে আছো, তারমানেই কেউ  
বঞ্চিত হচ্ছে । বিশদ জিজ্ঞেস করো না, কারণ সোশিওলজিতে ভিত্তি  
হয়েও মাত্র এক সেমিস্টারের বেশি টিকতে পারিনি ।’

ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো ড্রাইভার, ‘কোথায় যাবেন,  
স্যার ?’

‘নিস শ্যাভো,’ বললো রানা।

‘কোথায় ওটা, রবিন?’

‘স্টিপ।’

‘ট্যাক্সিতে?’

হাসলো রানা। ‘হোটেলটা স্টিপে। রুট নাইনটি-ওয়ান, সব-  
গুলো ভালো হোটেল এক সারিতে দেখতে পাবে তুমি। জায়গাটার  
নাম স্টিপ।’

‘সুন্দর?’

‘ভেগাস সুন্দর। কিন্তু সবই চড়া দাম দিয়ে কিনতে হয়। সুন্দর  
এবং দামী।’

সুন্দর যে তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল নিয়ন সাইনগুলো  
দেখে। এখনো সন্ধ্যা হয়নি, শহর এখনো এক মাইল দূরে, অথচ  
রঙচঙে অক্ষরগুলো এক একটা এতো বড় যে পরিষ্কার পড়া গেল।  
একদিকের গোটা আকাশকে যেন আলোক সজ্জায় সাজানো  
হয়েছে।

কথা বলছে বটে, কিন্তু কাজের কথা সারাঞ্চণই ভাবছে রানা।  
কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টার থেকে শেষ মেসেজটায় বলা হয়েছে,  
তাড়াতাড়ি করুন। তা না হলে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু বললেই তো তাড়াতাড়ি করা যায় না। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড  
বলতে ওরা বোঝাতে চেয়েছে একশো ছত্রিশজন টেলি-বোমাকে খতম  
করতে আসছে গ্রু। মূল অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এর কোনো  
সম্পর্ক নেই। ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করবে রানা, নাকি গ্রুর  
কমাণ্ডো গ্রুপগুলোকে ঠেকাবে?

ছটোই জরুরী। তবে দ্বিতীয় কাজটা এফ. বি. আই.-কে দিয়ে

করানো যায় । কিংবা আর কাউকে দিয়ে ।

মস্কো তো তাগাদা দেবেই । ওরাও বুঝতে পারছে, কাজ মোটেও এগোচ্ছে না । বুঝতে পারছে, আমেরিকায় পৌঁছে মাছি মারছে মাসুদ রানা । অথচ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাবার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে ।

এলোমেলো হয়ে গেল রানার চিন্তা ভাবনা ।

যদি সফল হই ? ডালচিমস্কিকে যদি ধরতে পারি ? তাহলে আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত । কিন্তু কপালে সম্ভবত একটা বুলেট জুটবে—হয় এদের, নাহয় ওদের ।

একটা ফুয়েল স্টেশনের পাশে ড্রাইভারকে থামতে বললো রানা । গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে, লিলি জিজ্ঞেস করলো, ‘কোথায় যাচ্ছে ?’

‘এফ. বি. আই.-কে ফোন করতে,’ বলে হন হন করে এগোলো রানা । সোজা গিয়ে ঢুকলো ফোন বুদে ।

দু’দিন পরের ঘটনা । ভোর সাড়ে তিনটে । লাস ভেগাস এয়ার-পোর্ট ।

ঝকঝকে তিনটে মাসিডিজ চড়ে এলো ওরা । সবার একই পোশাক—কালো স্যুট, সাদা টাই, কালো হ্যাট । গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে এমনভাবে তাকালো, যেন পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় । একটু খেয়াল করতেই গেটের গার্ড টের পেয়ে গেল, প্রত্যেকে ওরা স্যুটের নিচে শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে । টুল ছেড়ে উঠলো না সে, তবে আশ্বে করে হাত বাড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কারবাইনটা ধরলো । গুলো সে, বারো জন

লোক । কিন্তু এগিয়ে এলো মাত্র দু'জন । হাঁটার ভঙ্গিতেই গন্ধ পাওয়া যায় এফ. বি. আই.-এর, পা ফেলার সাথে তাল মেলাচ্ছে না হাতগুলো, শরীরের কাছ থেকে একটু দূরে আড়ষ্ট ভাবে ঝুলে আছে, সামান্য বাঁকা হয়ে ।

কারবাইনটা কোলের ওপর তুললো গার্ড । এই গেট দিয়ে শুধু টারমাকে ঢোকা যায় । এয়ারপোর্ট অফিসাররা ছাড়া আর কারো ঢোকান অনুমতি নেই, তাদের সবার কাছে পাস থাকে ।

টুল ছাড়লো গার্ড । কারবাইনটা লোক দু'জনের দিকে তাক করলো । প্রাক্তন সৈনিক সে, বোকার মতো ঝুঁকি নিতে অভ্যস্ত নয় ।

ছ'ফুট লম্বা লোক দু'জন তিন হাত দূরে থামলো । 'টু ফাইভ থ্রি, ওয়ান নাইন জিরো ফোর থ্রি,' মার্জিত কিন্তু ভারি কঠিন, দু'জনের একজন বললো গার্ডকে । 'কার নম্বর ?'

'সিকিউরিটি চীফ বনি ওয়ার্ডারের,' বললো গার্ড ।

দ্বিতীয় লোকটা পকেট থেকে দুটো কাগজ বের করলো । একটা পরিচয়-পত্র, অপরটা প্যাডে লেখা নির্দেশ । প্রথমে সে প্যাডের কাগজটা দিলো গার্ডকে । 'পড়ুন ।'

টাইপ করা নির্দেশ, তবে সিকিউরিটি চীফের সইটা চিনতে পারলো গার্ড । পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, টেরোরিস্টদের দুটো গ্রুপকে গ্রেফতার করার জন্যে এফ. বি. আই. অফিসারদের বারো জন সদস্য এয়ারপোর্টে যাচ্ছে । তাদের সাথে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করতে হবে ।

গার্ড মুখ তুলতেই তার হাতে গুঁজে দেয়া হলো আইডেনটিটি কার্ড ।

কাৰ্ডে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকালো গাৰ্ড ।

তাকে জিজ্ঞেস কৰা হলো, 'সবার কাৰ্ড দেখাতে হবে ?'

দ্রুত মাথা নাড়লো গাৰ্ড । 'তার কোনো দরকার নেই, স্যার ।  
বলুন কি করতে হবে আমাকে ।'

'গ্রুপ ছটোকে টারমাক থেকে গ্রেফতার কৰবো আমরা,' এফ.  
বি. আই. অফিসারদের একজন কাৰ্ডটা ফেরত নিয়ে বললো ।  
'টামিনাল ভবনে ঢোকান ঠিক আগের মুহূর্তে । টের পেয়ে যদি  
বাধা দিতে চেষ্টা কৰে, ওখানে নিরীহ লোকদের আহত হবার  
সম্ভাবনা কম । ছ'বারই আমরা এই গেট ব্যৱহাৰ কৰবো । আপনাত  
একমাত্র কাজ এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলা ।'

'কোনো প্রশ্ন থাকলে টু ফাইভ থি ওয়ান নাইন জিরো থি-তে  
ফোন কৰে ছেনে নিন,' বললো দ্বিতীয় লোকটা ।

এক সেকেণ্ড ইতস্তত কৰলো গাৰ্ড । তারপর ঘন ঘন মাথা  
নাড়লো সে । ফোন সে কৰবে, তবে এদের সামনে নয় । 'এখুনি  
ঢুকতে চান আপনারা ? ক'জন ?'

ছ'জনের একজন কোটের আন্তিন সন্নিৱে হাতঘড়ি দেখলো ।  
'হ্যাঁ, এখুনি । মেক্সিকো ফ্লাইট ল্যাণ্ড কৰতে আর সাত মিনিট বাকি ।  
আটজন ।'

'ঠিক, আছে,' বলে গেট খুলে দিলো গাৰ্ড ।

তিনটে গাড়িতে চারজন লোক থেকে গেল, বাকি আটজন গেট  
পেরিয়ে টারমাকে ঢুকলো । রানওয়ের দিকে খানিকটা এগিয়ে অন্ধ-  
কাৰে হাৰিয়ে গেল তারা ।

কিছুক্ষণ টুলে বসে থাকার পর গেট হাউসে ঢুকলো গাৰ্ড । একটা  
সিগারেট ধৰিয়ে জানালার পর্দা আধ ইঞ্চি সৰালো । মাসিডিজগুলো



থেকে কেউ এদিকে আসছে না। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো সে।

অপরপ্রান্তে বেল বাজছে, কিন্তু রিসিভার তুলছে না কেউ। পাঁচ-বার, ছয়বার। কানেকশন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করলো গার্ড। চারবার, পাঁচবার বেল বাজলো। তারপর রিসিভার তুললো কেউ। ঘুম জড়ানো, ভারি, তিক্ত কণ্ঠস্বর, ‘কোন্ বেআক্কেল!’

‘স্যার, সাউথ গেট-বি থেকে আমি...।’

‘হ্যাঁ, জনসন দ্য ইডিয়ট। কি চাই তোমার?’

‘স্যার, আপনার সহী করা নির্দেশ নিয়ে বারো জন এফ. বি. আই. এজেন্ট...।’

‘জানি। কি হয়েছে তাই বলো!’ ভারি কণ্ঠস্বর হঠাৎ খাদে নামলো। ‘তোমার সাথে প্যাচাল পাড়তে গিয়ে মিসেসের যদি ঘুম ভেঙে যায়, আস্ত রাখবে না!’

ফিক্ করে হেসে ফেললো গার্ড জনসন। ‘কিছু হয়নি, স্যার। জানতে চাইছিলাম...।’

‘জানি কি জানতে চাইছো। ওদের সাথে সহযোগিতা করবে কিনা। কোরো না।’

‘স্যার। কি বললেন, স্যার?’

‘সহযোগিতা কোরো না। তাহলে তোমার মতো ইডিয়টের চাকরি খাওয়ার একটা অজুহাত তৈরি হবে। বেশি করে ঘাড়তেড়ামি কোরো, তাহলে নিজের সাথে আমারও বারোটা বাজাতে পারবে। যত্নোসব!’ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আপনমনে হাসতে লাগলো গার্ড। একটা গোপন কথা জানা গেল আজ। অমন রগচটা বস, তিনি-ও কিনা বউকে যমের মতো

ভয় করেন !

নয় মিনিট পর, দু'মিনিট দেয়ি করে ল্যাণ্ড করলো মেম্ব্রিকো ফ্লাইট । পাসপোর্ট আর কাস্টম্‌স্ চেকিংয়ের ঝামেলা চুকিয়ে একশো বাইশ জন আরোহী এক এক করে বেরিয়ে এলো শেড থেকে, সোজা টার্মিনাল ভবনের দিকে এগিয়ে আসছে তারা ।

আটজন এফ. বি. আই. এজেন্ট দু'সারিতে দাঁড়ালো, চারজন চারজন করে । আরোহীদের কেউ কোনো নির্দেশ দেয়নি, তবু সারি দুটোর মাঝখানটাকে গলি ধরে নিয়ে এক এক করে সবাই ঢুকলো সেটার ভেতর, একদিক দিয়ে ঢুকছে এবং অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে । মানুষের এ এক অদ্ভুত প্রবণতা, একজন কিছু করলে সবাই তাকে অনুসরণ করে ।

এর চারজন কমাণ্ডো আছে আরোহীদের মধ্যে । একশো বাইশ-জনের মধ্যে থেকে তাদের চিনে বের করতে হবে । তারা কে কেমন দেখতে বা কে কি পরে থাকবে জানা নেই । তারা আসছে শুধু এই তথ্যটাই জানানো হয়েছে টেলিফোন করে । তবে আটজনের মধ্যে সাতজন ব্যাপারটা নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তায় ভুগছে না । তারা জানে, শেষ অর্থাৎ অষ্টম ব্যক্তি কমাণ্ডো চারজনকে দেখিয়ে দেবে । ওদের কেউ নয় সে, মাত্র আধ ঘণ্টা আগে টার্মিনাল ভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে । কমাণ্ডো চারজনকে রিসিভ করে নিয়ে যাবার জন্যে একটু আগেভাগেই এয়ারপোর্টে পৌঁচেছিল বেচারী ।

কিছুটা ভাগ্য, বাকিটা দূরদৃষ্টির কল্যাণে লোকটাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে । কমাণ্ডো দলটাকে রিসিভ করার জন্যে কেউ না কেউ আসবে, এই ধারণা থেকেই টার্মিনালে লোক রাখা হয়েছিল । আগের দিন পাওয়া একটা তথ্য অবশ্য উৎসাহিত করে ওদেরকে ।

কাল ওরা হোটেলগুলোয় খবর নেয়, কোথাও চারজনের জন্যে কামরা রিজার্ভ করা হয়েছে কিনা। প্রথমে নামকরা হোটেলগুলোর সাথে যোগাযোগ করে ওরা। বেশি খাটতে হয়নি, পিকানা-র সাথে যোগাযোগ করতেই রিসেপশন থেকে জানানো হলো, হ্যাঁ, এক ভদ্রলোক সশরীরে এসে চারজনের জন্যে চারটে কামরা রিজার্ভ করে গেছেন, তাঁরা আগামী কাল ভোর তিনটে চল্লিশ মিনিটের মেক্সিকো ফ্লাইটে ভেগাসে আসছেন। এফ. বি. আই. কার্ড দেখানোর পর লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে আপত্তি করেনি রিসেপশনিস্ট। এখানেই ওরা থেমে থাকেনি, অন্যান্য আরো হোটেলের সাথে যোগাযোগ করলো। জানলো, একই চেহারার লোক আরো তিনটে হোটলে মোট আরো বারো জনের জন্যে কামরা রিজার্ভ করেছে।

সেই বর্ণনা অনুসারে আধ ঘণ্টা আগে লোকটাকে চেনা সম্ভব হয়েছে। টয়লেটে নিয়ে গিয়ে তাকে এবং নিজেদের একজন লোককে বিবস্ত্র করানো হয়, কাপড় বদল করে তারা। নিজেদের লোকটাকে তারা টার্মিনাল ভবনে পাহারায় রেখেছে। রাশিয়ানটাকে নিয়ে এসেছে নিজেদের সাথে। অস্ত্রের মুখে বেচারী একদম কেঁচো বনে গেছে। জানে, তার পরিচয় যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, মস্কো যতোই চেষ্টামেচি করুক, মার্কিন আইনে তার যাবজ্জীবন হতে বাধ্য। তবে ওরা তাকে কথা দিয়েছে, সে যদি সহযোগিতা করে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হতে পারে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ও দেয়া যেতে পারে।

কিন্তু যদি সে সহযোগিতা না করে ?

কোনো বিচার হবে না। তবে কাল তার একটা খবর বেরুবে

কাগজে । তার খবর, কিন্তু সে পড়তে পারবে না । কারণ সেটা হবে তার মৃত্যুর খবর ।

মন খারাপ করে দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে আছে বেচারী, নিরস্ত্র । এফতার করার সময়ই সার্চ করে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েছে ওরা । ‘চারজন একসাথে আসছে,’ বিড়বিড় করে বললো সে । ‘হু’জন ছাই রঙের স্যুট পরে, একজন বা...হ্যাঁ, বাদামি স্যুট । তার পাশে জ্যাকেট পরা লোকটা ।’ ঢোক গিললো সে ।

তার পাশ থেকে সারির প্রথম অফিসার বললো, ‘স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করুন । ওরা তো আর আপনাকে চেনে না ।’ কমাণ্ডো চারজনকে হু’সারির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যেতে দিলো ওরা, কোনো রকম বাধা দিলো না । কমাণ্ডোরা কে কি ভাবলো কে জানে, কেউ তারা হু’পাশে দাঁড়ানো অফিসারদের দিকে ভুলেও একবার তাকালো না । কমাণ্ডো চারজনের পিছনে যারা ছিলো বাধা দেয়া হলো তাদের । অফিসারদের একজন এক হাতে কার্ড আর অপর হাতে পিস্তল নিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো । বাকি সাতজন অনুসরণ করলো কমাণ্ডো চারজনকে । টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে অফিসারদের তিন জন কমাণ্ডোদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল । তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো । একই সময়ে পিঠে শক্ত কিছুর গুঁতো অনুভব করলো রুশ আততায়ীরা ।

দাঁড়িয়ে পড়লো কমাণ্ডোরা । হতচকিত এবং বিহ্বল ।

‘এফ. বি. আই.,’ অফিসারদের একজন বললো । ‘কিছু প্রশ্ন করার আছে, সবাইকে হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে ।’

কোনো ধস্তাধস্তি হলো না, তর্ক-বিতর্ক হলো না । ছয়জন অফিসার চারজন কমাণ্ডোকে ঘেরাও করে সাউথ গেট-বি অভিমুখে

এগোলো। কয়েক সেকেন্ড পর তাদের সাথে যোগ দিলো বাকি দু'জন অফিসার।

পরবর্তী মেক্সিকো ফ্লাইট বেলা এগারোটায়। সাউথ গেট-বি এবং টারমাকে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হলো।

তৃতীয় ফ্লাইটের কমাণ্ডোদের গ্রেফতার করা হলো লাউঞ্জ থেকে বেরুবার মুখে। এখানে তুমুল ধস্তাধস্তি হলো, ছুটে এলো এয়ার-পোর্ট সিকিউরিটির লোকজন, হৈ-হট্টগোলের মধ্যে দৌড় দিলো একজন কমাণ্ডো। মাসিডিজ নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল অফিসারদের তিনজন লোক, নিরস্ত্র কমাণ্ডোকে ধরে ফেললো তারা। লাউঞ্জের বাইরে এফ. বি. আই. এজেন্টদের চ্যালেঞ্জ করে বসলো এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির লোকজন। ব্যাজ, পরিচয়-পত্র, ইত্যাদি দেখে তারা অবশ্য একটু পরই ক্ষমা চেয়ে নিলো।

চার এবং শেষ কমাণ্ডো গ্রুপটাকে টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দিলো ওরা। মাসিডিজ নয়, ভাড়া করা ট্যাক্সি নিয়ে স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিল বারো জনের দলটা। এখানে পালাতে গিয়ে গুলি খেলো একজন কমাণ্ডো, তবে আঘাতটা মারাত্মক নয়।

প্রতিটি ঘটনাই দূর থেকে চাক্ষুষ করলো রানা। পরম স্বস্তি বোধ করলো ও, ভালোয় ভালোয় কয়েদ করা গেছে গ্রুর লোক-গুলোকে। একশো বত্রিশ জন রুশ ডীপ-কাভার আপাততঃ বেঁচে গেল ওদের হাত থেকে।

কিন্তু ডালচিমস্কির হাত থেকে ওদের সে বাঁচাবে কিভাবে?

পরদিন সন্ধ্যায় বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। লিলি

কাপড় পরছে, জ্যাকেটের ডান পকেটে সাইলেন্সারটা রাখলো রানা। রিলোড করা পয়েন্ট টু-টু রেখেছে ভেতরের ব্রেস্ট পকেটে।

নিস শ্যাটোর লাউঞ্জে বিয়ার খেলো ওরা। ‘চলো দেখি বড়লোক হওয়া যায় কিনা,’ বলে হাত ধরে টানতে টানতে পাশের কামরায় রানাকে নিয়ে এলো লিলি। একশো নব্বই ডলার হারার পর লিলিই আবার টেনে বের করে আনলো ওকে। বললো, ‘আমি একটা কুফা। যতোকণ সাথে থাকবো কোনো কাজই হবে না তোমার।’

ট্যাক্সি নিয়ে আরেক হোটেলে এলো ওরা। বিয়ারের বদলে শ্যাম্পেন চাইলো লিলি, অনেকটা বাধ্য হয়েই হুইস্কি নিতে হলো রানাকে। আটটা দশ পর্যন্ত এখানে থাকলো ওরা, সময় কাটলো ক্যাবারে দেখে। তারপর ওরা প্রচুর সময় নিয়ে ডিনার খেলো। আধ ঘণ্টা পর পর তিন বার টেলিফোন করার জন্যে উঠে গেল রানা। প্রতিবার ফিরে এলো আগের চেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে।

সাড়ে দশটা থেকে রাত ছটো পর্যন্ত বিভিন্ন নাইট ক্লাবে ঢুঁ মারলো ওরা। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁটলো কিছুক্ষণ। লিলিকে একটা বুকস্টলে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার ফোন বুদে ঢুকলো রানা।

ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি থামালো রানা। আড়াইটা বাজে। আগের মতোই গম্ভীর ও। ড্রাইভারকে বললো, ‘থাণ্ডার-বার্ড।’

‘একা একা কষ্ট পাও, আমার কি!’ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে লিলি, যান চেহার।

‘লোকটাকে পেয়েছি।’

‘কাকে পেয়েছো, কোথায় পেয়েছো, কিছুই আমি জিজ্ঞেস করবো

না,' বললো লিলি। রানার দিকে ফিরলো সে, ওর একটা হাত ধরলো। 'শুধু লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করবো তুমি পাশে থাকা সত্ত্বেও আমি যেন নিঃসঙ্গ বোধ না করি।'

থাণ্ডারবার্ডের সবচেয়ে বড় রেস্টোর'ায় বসলো ওরা। ফোন করে আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে টেবিলটা। হালকা, মুছ মিউজিকের সাথে ফ্লোরে অর্ধনগ্ন ফ্রেঞ্চ মেয়েরা নাচছে। রেস্টোর'ায় একজন লোক ঢুকলো—ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, ব্রাউন হ্যাটের কিনারা থেকে বেরিয়ে আছে লালচে চুল, শক্ত-সমর্থ বলিষ্ঠ গড়ন, পরনে অ্যাশ কালারের স্যুট, হাতে একটা বড় আকারের সাদা গোলাপ। কোনো দিকে না তাকিয়ে রেস্টোর'ার ভেতর দিয়ে ক্যাসিনোর দিকে চলে গেল সে। রানা তাকে একবার মাত্র দেখলো, তারপর আর সেদিকে তাকালো না।

বিশ মিনিট পর চেয়ার ছেড়ে উঠলো রানা, 'আসছি।'

'টেলিফোন, না টয়লেট?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

রানা হাসলো না। 'দুটোই।'

ক্যাসিনোয় ঢুকে এদিকে ওদিকে তাকালো রানা। ছিয়াশি নম্বর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেন্ট গগল। দু'জন সামনা-সামনি হলো, কিন্তু কথা বললো না। পাশাপাশি হেঁটে আরেক দরজা দিয়ে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। চারতলার রেস্টোর'ায় আরেকটা টেবিল রিজার্ভ করা আছে।

টেবিলটা কেবিনের ভেতর। সামনাসামনি বসলো ওরা। সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দেবে রানা, এই সময় গোলাপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলো গগল। হাত বাড়িয়ে নিলো রানা, কিন্তু ফুলের দিকে নয় তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

‘ডন আর. কে. আমার স্কটল্যান্ডের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন,’ বললো গগল।

কেবিনে বোমা পড়লেও এতোটা চমকাতো না রানা। ওর সমগ্র অস্তিত্ব একটা ঝাঁকি খেয়ে অবশ হয়ে গেল যেন।

‘ভয়ের কিছু নেই, এখন তিনি সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত,’ আশ্বাস দিলো গগল। ‘পড়ে দেখো।’

কি পড়ে দেখতে হবে রানাকে বলে দিতে হলো না। সাদা গোলাপের পাপড়ির ভেতর ছোট্ট একটুকরো কাগজ লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেল। চিরকুটে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান লিখেছেন, ‘রানা, মস্ত একটা ফাঁড়া গেল। প্রথম স্ট্রোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে এখন থেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার তোমার, দায়িত্ব তো তোমাকে নিতেই হবে। কাজ কেমন এগোচ্ছে?’

রানা মুখ তুলতেই গগল বললো, ‘কি একটা কাজে স্কটল্যান্ডে এসেছিলেন। আসার পরদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্ট্রোক, তবে জোরালো নয়। ডাক্তাররা কমপ্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন, ক’দিন পর আবার পরীক্ষা করবেন।’ অপারেশনও দরকার হতে পারে, কিন্তু সে-কথা চেপে গেল গগল। ‘আশ্চর্য মানুষ তোমার বস,’ বললো সে। ‘তোমার খোঁজ জানেন না, কিন্তু আমি জানি সে-খবর ঠিকই রাখেন। হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলেন তিনি, প্লেন নিয়ে একাই তাঁকে আমি দেখতে চলে যাই। খানিক আগে ফিরেছি, তাই টেলিফোনে পাওনি আমাকে। ডনকে জোর করে আমার বাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছি।’

‘আমি যাবো,’ বললো রানা। বস গগলের বাড়িতে বিশ্রাম নিতে



উঠেছেন। প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।

‘উনি নিষেধ করেছেন।’

‘আমাকে যেতে হবে।’

‘তোমাকে দেখে উনি রেগে যাবেন,’ বললো গগল। ‘তাতে তাঁর ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি। কাজ শেষ হলে যেতে বলেছেন। ভালো একটা হাটিং রাইফেল নিয়ে যেয়ো।’

হাটের রোগীকে উত্তেজিত করা চলে না। ওকে দেখে বস যে রেগে যাবেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সিদ্ধান্তটা বদলাতে হলো। হাটের কাজ শেষ করে দেখতে যাবে বসকে। হাটিং রাইফেল? কিসের লোভে গগলের বাড়িতে উঠেছেন বস, পরিষ্কার হয়ে গেল। স্কটল্যান্ডে বিশাল বনভূমির মালিক গগল, হরিণের স্বর্গ-রাজ্য। ‘বনি ওয়ার্ডারের খবর কি?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘বারো ঘণ্টা আটকে রেখে ছেড়ে দিয়েছি,’ বললো গগল। ‘এয়ারপোর্ট থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়, তাকে দিয়েই রিসিভ করিয়েছি সবগুলো। পিস্তলের মুখে শেখানো বুলি আঙড়ে গেছে।’

‘ছেড়ে দেয়ার পর?’

‘সাউথ গেট-বি আর টার্মিনালের তিনজন গার্ডকে সাসপেন্ড করেছে, বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হয়েছে দু’জন সিকিউরিটি অফিসারকে।’

‘এফ. বি. আই.?’

‘ওরা রহস্যের কোনো কিনারাই করতে পারছে না।’ ফিক্ করে হাসলো গগল।

‘কোথায় রেখেছো ওদের?’

‘গোটা আমেরিকা আমার সেফ হাউস, যেখানেই রাখি, কারো

সাহায্য নেই খুঁজে বের করে। ওদের কি মস্কোয় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো?’

‘এখন না। আমি বলবো।’

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওয়েটার। অর্ডার দিলো গগল। ওয়েটার বেরিয়ে যেতে রানাকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমার আরো সাহায্য দরকার না হলে দেখা করতে বলতে না, ঠিক?’

মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘আমাকে একজন অসৎ পুলিশের সন্ধান দিতে পারো? আর, পনেরো বছরের পুরনো রাশিয়ান নোটবুক দরকার একটা।’

‘কি কাজের জন্যে তাকে চাইছো বললে বুঝতে পারতাম কি ধরনের অসৎ লোক দরকার তোমার।’

সিগারেট বের করলো রানা। অফার করলো গগলকে। মাথা নাড়লো গগল। ট্রে-তে করে জনি ওয়াকারের একটা বোতল আর ছোটো গ্লাস দিয়ে গেল ওয়েটার।

‘আমি একজন লোককে খুঁজছি। সে কোথায় আমি জানি না। তবে আমেরিকাতেই আছে বলে আমার ধারণা। তাকে খুঁজে বের করতে হলে পুলিশ আর এফ. বি. আই.-এর সাহায্য দরকার, কিন্তু সরাসরি ওদের সাহায্য চাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি অসৎ একজন পুলিশের সাহায্য নেবো, যার পক্ষে পুলিশ বিভাগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধে কাজে লাগানো সম্ভব।’

প্রথমে নিজের গ্লাসে, তারপর রানার গ্লাসে ছইস্কি ঢাললো গগল। বরফ মিশিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলো। রানার গ্লাসে রানাকেই বরফ মেশাতে হলো।

সময় বয়ে চলেছে। নিঃশব্দে পান করছে ওরা। রানার সিগারেট

প্রায় শেষ হয়ে এলো। দু'জনের গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢাললো গগল। সে হয়তো মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করছে, কিন্তু চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

আরো পাঁচ মিনিট পর গগল বললো, 'অ্যালিস টেনডেল।'

'অ্যালিস টেনডেল,' পুনরাবৃত্তি করলো রানা। 'পদ?'

'সার্জেন্ট,' বললো গগল। 'তোমাকে ভালোই সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করি। সাহায্য করার অভ্যাস আছে।'

'তোমার মতো,' বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো রানা, ওর এই বন্ধুটি অদ্ভুত রকমের স্পর্শকাতর, কি কথার কি মানে করে বসবে বলা কঠিন। মুশকিল হলো, কোনো প্রতিক্রিয়া হলে সেটা ধরতে পারা যায় না। অনেক মাস বা অনেক বছর পর হয়তো ছোট্ট একটা মন্তব্য করবে, তখন বোঝা যাবে কথাটা তাকে আঘাত করেছিল।

'তাকে বলবে আমি তার প্রশংসা করেছি,' অনুরোধ করলো গগল। 'কখন দেখা হবে ফোনে জানাবো।'

'এনভেলাপে ভরে যদি হাজার পাঁচেক ডলার দিতে চাই, মাইণ্ড করবে না তো?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

'এক হাজার! নোটবুকটা পেতে দেরি হবে।'

রানা কিছু বলতে গিয়ে বাধা পেলো।

আবার বললো গগল, 'দরকার হলে পরে বাড়িয়ে।' হঠাৎ রানার দিকে ঝুঁকলো সে। 'তোমার বস সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমার জানা নেই। উনি কি খান, কিসে অভ্যস্ত, কি লাগবে না লাগবে, কিছুই আমি জানি না। বুঝতেই পারছো মেহমানের খাতির যত্নে ক্রটি থাকুক তা আমি চাই না।'

‘হার্টের রোগী যা খায় তাই খাবেন,’ অবাক হয়ে বললো রানা।  
‘কি লাগবে না লাগবে, তোমার লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই  
তো পারে।’

‘আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো না,’ বললো গগল। একটু যেন  
গম্ভীর মনে হলো তাকে। ‘সব কথা কি সবাইকে জিজ্ঞেস করা যায় ?  
আমি বলতে চাইছি, মানে নেশা-টেশা, মেয়ে-টেয়ে...।’

চোখে পানি এসে গেল রানার, হাসতে হাসতে। এমন প্রাণ-  
খোলা, ঝাঁধনহীন হাসি সারা বছর হাসেনি ও। এক সময় হঠাৎ  
করেই থামলো। গগলের দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারলো না  
হৃৎজনের সম্পর্ক ইতিমধ্যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গগল স্থির পাথর।

‘তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি, গগল,’ বললো রানা। ‘তোমার ডন  
আর কে. একজন ঋষি, যোগীপুরুষ। এ-সব বিষয়ে তাঁর কোনো  
মোহ নেই।’

‘মিলে গেল,’ বলে উঠে দাঁড়ালো গগল, চেহারা সেই আগের  
মতো নিলিপ্ত। ‘পাঁচ মিনিট পর যেয়ো। বিল আমি দিচ্ছি।’ কেবিন  
থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কি মিলে গেল ? গগলও কি তাই ভেবেছিল, রাহাত খান এসবে  
অভ্যস্ত নন ? তাহলে জিজ্ঞেস করলো কেন ? আপনমনে কাঁধ  
ঝাঁকালো রানা। লোকটাকে আজও সে ভালোমতো বুঝে উঠতে  
পারলো না। পাঁচ মিনিট পর কেবিন থেকে বেরিয়ে টয়লেটে  
ঢুকলো ও। বেসিনে ফেলে চিরকুটটায় আগুন ধরালো, ট্যাপ খুলে  
দিতে পানির সাথে পাইপে নেমে গেল ছাইটুকু। রেস্টোরায়, লিলির  
কাছে ফিরে এসে রানা জিজ্ঞেস করলো, ‘শো কেমন লাগলো ?’

ম্লান মুখে লিলি বললো, ‘ভালো ।’

হাত বাড়িয়ে লিলির মুখে আলতো করে আঙুল বুলালো রানা ।  
‘দেরি হলো বলে ছুঁখিত । আমার বন্ধু... ।’

এতোক্ষণে রানার দিকে ফিরলো লিলি । ‘কোনো অজুহাত  
দেখাতে হবে না, রবিন । আমি খুব ক্লান্ত, বিছানায় যেতে চাই ।’

কিন্তু বিছানায় ওঠার পর রানা আবিষ্কার করলো, লিলি মোটেই  
ক্লান্ত নয় ।

## তিন

---

বার্কশায়ারকে ভালো লেগে গেল ডালচিমস্কির । এর আগে ডেটনে  
ছিলো সে, তার তুলনায় ম্যাসাচুসেটস-এর উপত্যকা আর পাহাড়  
দশ ডিগ্রী বেশি ঠাণ্ডা । বিশাল ধড় নিয়ে গরমে হাঁসফাঁস করছিল  
সে, এখানে পৌঁছে শান্তি পেলো । আমেরিকার গ্রীষ্মকাল এরকম  
জঘন্য তার ধারণা ছিলো না, জুলাই মাসের মস্কোর চেয়ে পুরোপুরি  
বিশ ডিগ্রী বেশি গরম । ওহায়ো এবং বার্কশায়ারের আবহাওয়া  
তুলনা করলে, আর সেই সাথে দিগন্তের কাছে পাহাড়ী ঢালের  
দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যায় শীতকালে কেন এলাকাটা স্কি-র

জন্যে এতো জনপ্রিয় ।

আলবানি পর্যন্ত প্লেনে করে, তারপর বাসে চড়ে পিটসফিল্ড, সেখান থেকে ভাড়া করা কার নিয়ে এখানে পৌঁচেছে সে । অটো রেন্টাল এজেন্সির ম্যানেজার ছোটো শহর স্টকব্রিজে একটা হোটেল কামরা পাইয়ে দিতে সাহায্য করে তাকে । হোটেলটার নাম গ্রে লায়ন ইন, রুট সেভেনের সাথেই । হপ্তার শেষ দিকে ট্যুরিস্টদের প্রচণ্ড ভিড় লেগে যায়, পৌছবার আগেই কামরা রিজার্ভ করে রাখে তারা, তবে হপ্তার মাঝামাঝি সময়ে চেষ্টা করলে দু'দিনের জন্যে কামরা পাওয়া সম্ভব । ডালচিমস্কির জন্যে দু'দিনই যথেষ্ট, কারণ এখনো সে কোথাও দু'দিনের বেশি থাকার বুঁকি নিতে রাজি নয় ।

গ্রে লায়ন ইন পুরনো ধাঁচের হোটেল । কামরাগুলো বড় বড়, সিলিং অস্বাভাবিক উঁচু, বারান্দাগুলোয় ফুটবল খেলা যেতে পারে । হোটেলের চার পাশেই বাগান । রান্নাবান্না করে সুইস শেফ । শহরটাও খুব সুন্দর, প্রতিটি রাস্তার দু'পাশে সার সার গাছ । পাবলিক লাইব্রেরীটা এতো বড়, অবাক না হয়ে পারা যায় না । মিউজিয়ামটাও ছোটো নয়, পুরোটা দেখতে হলে সারা দিন লেগে যাবে । সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো আর্ট গ্যালারি—এতো বিচিত্র ধরনের ন্যূড ছবি আছে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল । আরেকটা জিনিস খুব আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেছে ডালচিমস্কি । প্রকাণ্ড একটা বাড়ি । ওটা নাকি শিশুদের মানসিক হাসপাতাল । রোগী পিছু প্রতি হপ্তায় পাঁচশো ডলার চার্জ করা হয়, তারমানে ধনীর ছুলাল যারা পাগল-টাগল হয়ে যায় বা যাচ্ছে শুধু তারাই এখানে থাকতে পারে । মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি কেমন যেন একটা তাক্কিল্য মেশানো কৌতূহল আছে ডালচিমস্কির, সেজন্যেই ভেতরে ঢোকার চেষ্টা

শান্তিদত্ত-১

করেছিল সে। কিন্তু তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। দারোয়ান ফিরিয়ে দেয়ার সময় তাকে জানিয়েছে কত পক্ষের কাছ থেকে আগে অনুমতি নিতে হবে।

অনুমতির জন্যে ছুটোছুটি করার ধৈর্য বা সময় কোনোটাই নেই তার। তবে হাসপাতালটায় ঢুকতে পারলো না বলে মনে একটা ক্ষোভ জমা হলো।

হোটেলে ফিরে এসে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকলো ডালচিমস্কি। বার বার ফোনের দিকে তাকালো। দেবে নাকি ডায়াল করে? দিই, দিই আরেকটা ফাটিয়ে?

কিন্তু প্ল্যানটা অন্যভাবে করা হয়েছে। আরেকটা টেলি-বোমা ফাটাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা আজ নয়—কাল। তবে প্ল্যান বদল করতে অস্বিধে কি? এখন আমি রেগে আছি, এখন নয় কেন? সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে নিচের ডাইনিং রুমে ডিনার খেতে নামলো সে।

ভালো ভালো সব খাবারের অর্ডার দিলো ডালচিমস্কি। কিন্তু খেলো খুব অল্প, বেশিরভাগ পড়েই থাকলো। কিন্তু অর্ডার আমি ঠিকই দিয়েছিলাম, মনে মনে বললো সে। আমি তো সে-ই লোক যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। আমি খেতে বসলে সামনে তো ভালো ভালো সব খাবার থাকতেই হবে। মাথায় কতো যে আবোলতাবোল চিন্তা-ভাবনা আসছে! সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হলো, আশপাশের লোকজন কেউ তাকে চিনতে পারছে না। জানে না, ছোটো একটা খাতা রয়েছে তার পকেটে, সেই খাতার কি ক্ষমতা! যারা খাচ্ছে তাদের খাওয়া বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে করলো একবার। ‘তোমাদের সবার জীবন আমার হাতে,’ চিৎকার

করে এই কথাটা বললেই হবে। আচ্ছা, একজন সুস্থ মানুষ কি এভাবে চিন্তা করে ? এতো কিছু ভাবছি, এ-সব কি অশুভ কোনো লক্ষণ ? মাথা খারাপের লক্ষণ নয় তো ?

প্ল্যান বদল করার পোকা মাথায় ঢোকার পর থেকে অস্থিরতা বেড়ে গেছে তার। পোকাটা মাথায় ঢুকলো কেন ? বাচ্চাদের মানসিক হাসপাতালে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ওখানে ঢুকলে কি হতো ? কি দেখতে পেতো সে ?

আমি জানি না।

হয়তো আমি আমার বাল্যকালটা দেখতে পেতাম ওখানে।

হ্যাঁ, অবশ্যই। ছোটবেলায় আমিও তো ওদের মতো ছিলাম। একটু পাগলাটে।

কিন্তু এখন আর আমি পাগলামি করি না। আমি যা করছি তাকে অ্যাকশন বলা যাবে না কোনোমতে, শুধুই রিয়্যাকশন। টিল মেরেছো পাটকেল খাও। এক আঙুল দেখিয়েছো, দু'আঙুল দেখাবো। টিট ফর ট্যাট। বিদ্রোহ করেনি, করতে পারে এই অভিযোগে ওরা মেরে ফেললো সবাইকে। পাষাণ, নরাধম। কি সুন্দর সেট হয়ে গিয়েছিল জীবনটা। ইচ্ছে করলেই নতুন নতুন সহকারিণী পাচ্ছিলাম, একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা পেতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। হঠাৎ করে আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো মাথায়। কিছুই করিনি, করতে পারি এই অভিযোগে ধরতে আসছে, ধরা পড়লে মেরে ফেলবে ! বললাম, রসো, তাহলে আমিও একহাত দেখাচ্ছি !

এখন ? এখন কেমন লাগছে ? হাহ-হা !

না, শিডিউল বদলাবার কোনো মানে হয় না। ইচ্ছে করলে রাগটাকে আমি সামলে রাখতে পারি। তারচেয়ে নতুন নতুন প্ল্যান



তৈরি করে সময় কাটানো যাক ।

নিজের কাছে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ডলার আছে । এক অর্থে অনেক টাকা, আরেক অর্থে কোনো টাকাই নয় । টাকার আমার দরকার হবে যদি আগের জীবনটা ফিরে পেতে চাই । মস্কোর কাছে চাইলে দেবে না, কিন্তু ওয়াশিংটন কি না বলতে পারবে ? সবগুলো টেলি-বোমা ফাটিয়ে দিলে ওদের ক্ষতি হবে...আন্দাজ করা যাক—তিনহাজার মিলিয়ন ডলার । দূর, ক্ষতি আরো বিশ গুণ বেশি হতে বাধ্য । আহা, নাহয় ধরোই না তিন হাজার মিলিয়ন ডলার । তা-ও তো খুব কম নয় । ঠিক আছে, তাই । এখন আমি যদি ওদের কাছ থেকে এক হাজার...না...একশো মিলিয়ন ডলার দাবি করি, দেবে না ?

একশো মিলিয়ন ডলার কম হয়ে যায় । যদি চাই, বেশি করে চাওয়াই ভালো । দর কষাকষির একটা ব্যাপার তো থাকবেই । আমেরিকানরা আবার এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক পটু । ঠিক আছে, পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দিয়ে শুরু করবো । তিনশো মিলিয়নের কমে রাজি হবো না ।

নিজের ঘরে ফিরে এসেও হিসেবটা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো ডাল-চিমস্কি । কিন্তু টাকার চেয়ে বড় একটা নেশার দিকে আকৃষ্ট হলো সে । টেলি-বম বুক ।

খাতাটা দেখতেই তার ভালো লাগে । খাতায় হাত বুলোবার সময় প্রায় যৌন উত্তেজনার মতো একটা আনন্দ, একটা শিহরণ বয়ে যায় তার শরীরে ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর ডালচিমস্কি দেখলো, খাতাটা বুকের সাথে নিয়ে শুয়ে আছে সে । টাকার ভূত নেমে গেছে ঘাড়

থেকে, আরো বড় নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। বিশ্রাম নেয়ার পর তাজা হয়ে গেছে শরীর, মাথাটাও ভালো খেলছে। টাকা দিয়ে কি হবে, শুনি? টাকা দিয়ে কি সব কেনা যায়? একটা টেলি-বম ফাটার আর যে আনন্দ, আর কিছুর সাথে তার তুলনা চলে? বিশ্বব্যাপী একটা পারমাণবিক যুদ্ধ রাধিয়ে দেয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি, আর কিছুতে কি তা পাওয়া সম্ভব? বৈষম্য, দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার নির্ধাতন, আর বিকৃতি—ছনিয়ার যেদিকেই তাকাও, শুধু এই সব দেখতে পাবে তুমি। কি কমিউনিস্ট দেশ, কি পুঁজিবাদী দেশ, সবখানে এক অবস্থা। মানুষের সভ্য হবার সমস্ত চেষ্টা মানুষ নিজেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। ছ'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে বটে, কিন্তু চারপেয়েদের কোনো খারাপ গুণই ত্যাগ করতে পারেনি, বুদ্ধি আর মেধা দিয়ে আরো বরং স্নকৌশলে প্রয়োগ করতে শিখেছে। মানুষ-জাতির ভবিষ্যৎ কি, এই প্রশ্নের উত্তর যে-কেউ দিতে পারবে ধ্বংস।

সেই ধ্বংস আমি ভরানিত করতে পারি, সে ক্ষমতা আমার আছে। সেই ধ্বংসের কারণ যদি আমি হই, কোথাও লেখা থাক বা না থাক, আমিই হবো মানব সভ্যতার ইতিহাসে শেষ চরিত্র।

কল্পনা করতে গিয়ে পুলক অনুভব করলো ডালচিমস্কি, তার গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠলো। দেখলো পারমাণবিক বিষবাস্তব ঘাস করছে পৃথিবীকে। প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি মানুষ মার যাচ্ছে। ইউরোপ উজাড় হয়ে গেল। গোটা আমেরিকায় ঘাসের একটা কণা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাশিয়া নো ম্যান'স ল্যান্ডে পরিণত হয়েছে। এশিয়ায় প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। নিউন নিস্তর পৃথিবী। অন্তর্বর. বক্ষা। পাঁচশো কোটি ছোটো বড় ক-কালের

মধ্যে তারটাও থাকবে ।

কল্পনা করছে, আর খাতাটায় হাত বুলাচ্ছে ডালচিমস্কি । সারা শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ । অসম্ভব—সুযোগ যখন পাওয়া গেছে নিজেকে সে বঞ্চিত করতে পারে না । প্ল্যান বদলানোর প্রশ্নই ওঠে না । নামটা আগে সেই করা হয়ে যাক, মস্কোর রাথব-বোয়ালদের আরো একটু খাম বরুক, তারপর একসাথে সব ক’টা ফাটিয়ে দেবে সে । এক রাতে সবগুলো । প্রথম ফোনটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে করবে সে । বলবে, ‘আমি রাশিয়া । এক রাষ্ট্রে যেমন দু’জন প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে না, তেমনি এক পৃথিবীতে দুই মাতবর থাকতে পারে না । তুমি আমেরিকা, তোমাকে বিদায় দিতে হচ্ছে । যদি পারো তো ঠেকাও ।’ এরপর সারা রাত ধরে ডায়াল করবে সে । একশো ছত্রিশটা টেলি-বম ফাটিয়ে দেবে । জানা কথা, আমেরিকানরাও বসে থাকবে না । রাত শেষ হবার আগেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মস্কো । রাশিয়ার মিসাইলগুলো আঘাত হানবে ওয়াশিংটনে । শুরু হয়ে যাবে খেল । ডালচিমস্কি তখনো ফোন করছে, কানাডা থেকে ।

কয়েক দিন থেকেই পরবর্তী টার্গেট কাকে করবে ভাবছে ডালচিমস্কি । ধীরে ধীরে খাতার পাতা ওল্টাতে শুরু করলো সে । একটু অধৈর্য বোধ করলো, টার্গেট আগেই বেছে রাখা উচিত ছিলো ।

খাতা বন্ধ করে বাথরুমে গেল ডালচিমস্কি । মনের যা অবস্থা, মুখে কিছু রুচবে না এখন । কাজটা সেরে তারপর নাস্তা খাবে । বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্যস্তভাবে কাপড় পরলো সে । তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাতে গিয়ে এক জারগায় কেটে গেছে গাল, ছালা করছে ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ডালচিমস্কি । রাস্তা পেরিয়ে হন হন

করে হাঁটছে। হোটেলের কাছাকাছি কোনো কোন বৃদ্ধ ব্যবহার না করাই ভালো। একটা বাজারের ভেতর দিয়ে এগোলো সে। মানুষ ইচ্ছে করলে কি না পারে, হঠাৎ মনে হলো কথাটা। আজ কতো দিন হয়ে গেল কোনো মেয়ের গন্ধ পর্যন্ত নেইনি! কে জানতো আমার মধ্যেও সংযম আছে!

সকালটা গরম। মেয়েরা শুধু বুক আর নাভির নিচেটা ঢেকে রাস্তায় বেরিয়েছে। বুড়ো এক লোককে রাস্তা পেরোতে সাহায্য করছে এক যুবক। দেখে হাসি পেলো ডালচিমস্কির। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে, 'ওহে, কোনো লাভ নেই!' আবার রাস্তা পেরোলো সে। প্রায় ছুটতে শুরু করেছে। দেরি আর সহ্য হচ্ছে না তার।

রাস্তার মোড়ে খালি একটা বৃদ্ধ পাওয়া গেল। হোটেল থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে সে। বৃদ্ধে ঢুকে হাঁপাতে লাগলো ডালচিমস্কি। ভুরুতে লোমের গোড়াগুলো ঘামে ডুবে আছে। চটচট করছে বগলের তলা। রিসিভার তুললো সে। ডায়াল করলো ইন্ডিয়ান গর্জ, টেক্সাসে।

অপরপ্রান্ত থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এলো, 'বেকারি।' কথার সুরে টেক্সাসের টান।

'মিঃ হ্যারি মার্কস?'

'বলছি।'

'মিসেস রোয়েনা যা বলেছে সত্যি কিনা, আপনাদের ওখানে নাকি নয় ইঞ্চি লম্বা প্যানকেক পাওয়া যায়?' জিজ্ঞেস করলো ডালচিমস্কি।

অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেন্ড কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

চোখে ঘাম পড়লো ডালচিমস্কির । অপেক্ষা করছে সে ।

টেব্লাস থেকে লোকটা বললো, ‘ছঃখিত, প্যানকেক শেষ হয়ে গেছে ।’

ফোন বৃদ থেকে বেরিয়ে হোটেল ফিরে এলো মৃতিমান শয়তান । ব্রেকফাস্ট করতে বসে প্যানকেকের অর্ডার দিলো সে ।

নাস্তা শেষ করে বিল মেটালো ডালচিমস্কি, মোটা বকশিশ দিলো ওয়েটারকে । সিঁড়ি বেয়ে নিজের কামরায় যাবার সময় আপনমনে হাসতে লাগলো সে ।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডিওতে শোনা যাবে খবরটা ।

প্রথমবার রানার ঘুম ভাঙলো বেলা সাড়ে এগারোটায় । রিসিভারটা খাটের পাশেই, কিন্তু সেটা তুলতে হলে টপকাতে হবে লিলিকে । বেচারির ঘাতে ঘুম না ভাঙে সেজন্যে সাবধানে ঘুরপথে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে যাবে রানা, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা মেয়েটা কথা বলে উঠলো, ‘স্টীম রোলারে চ্যাপ্টা হতে চাইছি ।’

তৃতীয়বার বাজতে শুরু করলো ফোনের বেল । রিসিভার তুললো রানা, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো, ‘হ্যালো ?’

অপরপ্রান্ত থেকে ওর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো গগল । একাই কথা বলে গেল সে । তার কথা শেষ হতে রিসিভার নামিয়ে রাখলো রানা, গড়ান দিয়ে লিলির ওপর থেকে বিছানায় নামলো ।

‘কে, কেন—কিছুই আমি জিজ্ঞেস করবো না,’ বললো লিলি । চাদরের বাইরে শুধু তার সুন্দর মুখটা বেরিয়ে আছে । চোখ বন্ধ, নড়লো শুধু ঠোঁট জোড়া । ‘কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমি তোমার স্ত্রী আছি । কি করছো ।’ টিউরে উঠলো সে । চাদরের তলায় ঢুকে

লিলিকে বুকে টেনে নিয়েছে রানা আবার। ‘ছাড়ো ! এখন ঘুমাবো...  
ধ্যোং ! কি হচ্ছে ! হি হি !’

তারপর দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙলো একটা পঞ্চাশ মিনিটে। ঘরের  
ভেতরটা অন্ধকার, ভারি পর্দা গলে রোদ বা আলো কিছুই ঢুকতে  
পারছে না। বাইরে দিনের সবচেয়ে বেশি গরম এখন, একশো এক  
ডিগ্রী, তবে কামরার ভেতরটা ঠাণ্ডা। হাতঘড়ি দেখে সতর্ক হয়ে  
গেল রানা, বেশি সময় নেই। ডালচিমস্কি এখন কি করছে ? পর-  
মুহূর্তে ভাবলো, এ-ধরনের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো শ্রেফ বিলা-  
সিতা। সরাসরি কাজে নেমে পড়তে হবে ওকে। পা টিপে টিপে  
বিছানা থেকে নামলো ও। তারপর বিছানার ওপর খুঁকে চাদর  
দিয়ে ঢেকে দিলো নগ্ন নারীদেহ।

‘আমি কি এতোই কুৎসিত ?’ এবারও ঘুম ভেঙে গেছে লিলির।  
হেসে ফেললো রানা। উত্তর না দিয়ে বাথরুমে ঢুকলো ও।  
শাওয়ার সেরে দাড়ি কামালো, টয়লেটে ঢুকে আমেরিকান এক্সপ্রেস  
কার্ডের পিছন থেকে বের করলো পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটো,  
তুই প্রেস্ট প্লাস্টিকের মাঝখানে লুকানো ছিলো ওটা। কামরায় ফিরে  
এসে দ্রুত কাপড় পরলো ও।

‘কোনো মেয়ের কাছে না গেলেই হলো।’ রানার দিকে পিছন  
ফিরে শুয়ে রয়েছে লিলি।

‘দরজাটা বন্ধ করবে না ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘তারচেয়ে বাইরে থেকে আমাকে তালা দিয়ে রাখাই তো  
ভালো,’ বললো লিলি। ‘চাইলেও পালাতে পারবো না।’

‘পালিয়ে যাবে কোথায়। খুঁজে বের করে ফেলবো না।’

‘কেমন খুঁজতে জানো সে তো দেখতেই পাচ্ছি,’ খোঁচা দিয়ে

বললো লিলি ।

লাগলোও রানাকে । নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিলো 'ও' । হোটেলের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসে অটো রেন্টাল কোম্পানী থেকে গাড়ি ভাড়া করলো একটা ।

ক্রীম কালারের মার্সিডিজটা বেলা সাড়ে তিনটের সময় একটা ফটো স্টুডিওর সামনে দাঁড় করালো রানা । পাঁচটার সময় দেখা করলো অ্যালিস টেনডেলের সাথে ।

একেবারে বাঘের ঘরে, পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতর । রিসেপশনে অপেক্ষা করার সময় অস্বস্তি বোধ না করে পারলো না রানা । শরীর এবং অবচেতন মনের জানা আছে, পুলিশ মাত্রই তার শত্রু । স্বদেশী, বিদেশী, সব পুলিশ সম্পর্কেই কথাটা খাটে । এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বেশিরভাগ সময়ই আইন ভাঙছে রানা, ওর প্রায় প্রতিটি কাজ গোপনীয় আর বেআইনী । আইন ভাঙার সুযোগ ভোগ করে বলেই ওর ক্ষমতা একজন পুলিশ অফিসারের চেয়ে কয়েক শো গুণ বেশি । কিন্তু পুলিশ যদি ওকে চ্যালেঞ্জ করে, লেজ দাবিয়ে পালানো ছাড়া ঝামেলা বা বিপদ এড়াবার পথ থাকে না ।

খানিক পর ভেতরের একটা অফিস থেকে বেরিয়ে এলো অ্যালিস টেনডেল । মাথা নেড়ে কথা বলতে নিষেধ করলো সে, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে আবার ভেতরে ঢুকে গেল । তার পিছু পিছু ছোট্ট একটা অফিস কামরায় ঢুকলো রানা । কামরার চারদিকে দেয়াল রয়েছে, মাঝামাঝি অংশ থেকে সিলিং পর্যন্ত কাঁচ ।

‘ভিনসেন্ট গগল আপনার খুব প্রশংসা করলো,’ একটা চেয়ারে বসে বললো রানা ।

‘বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি,’ জিজ্ঞেস করলো সার্জেণ্ট অ্যালিস টেনডেল ।

লোকটার গায়ের রঙ তামাটে, পেশীবহুল শরীর । মুখটা সব সময় হাসি হাসি । বছরে ষোলো থেকে আঠারো হাজার ডলার বেতন পায়, সেদিক থেকে বিচার করলে তার পরনের স্যুটটা একটু বেশি দামী হয়ে গেছে বলতে হবে । হীরে বসানো সোনার আঙটি আর রোলেঞ্জ হাতঘড়িও অন্য রকম গল্প শোনায় ।

‘একজন নিখোঁজ লোকের সন্ধান চাইছি,’ বললো রানা । ‘হতে পারে তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে ।’

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লো সার্জেণ্ট । তারপর আবার হাসি হাসি মুখ করলো । ‘কে, মিস্টার প্লেয়ার ?’

‘একজন বুককিপার, আমাদের পারিবারিক এক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছিল । দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হয়—অনেক দূর সম্পর্কের ।’

সার্জেণ্টের চোখে কৌতূহলের আলো ফুটে উঠলো । ‘এটা কি তাহলে একটা পারিবারিক ব্যাপার, স্যার ?’

পরিবার বা পারিবারিক, এ-সব শব্দের একটাই মানে—মাফিয়া । অ্যালিস টেনডেল জানতে চাইছে কেসটার সাথে কোনো প্রতাপ-শালী মাফিয়া পরিবার জড়িত কিনা ।

‘হ্যাঁ—পূর্ব উপকূলের একটা পরিবার তাকে হারিয়ে শোকে কাতর হয়ে পড়েছে,’ বললো রানা । মাফিয়া পরিবারের নিজস্ব ভাষায় শোকে কাতর এই শব্দ দুটোর আলাদা অর্থ আছে । শোকে কাতর মানে রাগে অন্ধ ।

সার্জেণ্টের চেহারায় স্থায়ী আসন গাড়তে যাচ্ছে গাম্ভীর্য । ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো সে । আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কতো টাকা আশা



করা উচিত হবে। নেহাত ঠেকায় না পড়লে মাফিয়ারা পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্যে আসে না। তবে নিজেকে লোকটা স্মরণ করিয়ে দিলো, ভিনসেন্ট গগলের দোস্ত, বুঝে শুনেহাত পাততে হবে।

আবার মুখ খুললো রানা, ‘লোকটা মাস কয়েক আগে নিখোঁজ হয়েছে, সার্জেন্ট। আমরা সবাই তার ব্যাপারে উদ্বেগের মধ্যে আছি। এখানেও থাকতে পারে, আবার অন্য কোথাও-ও থাকতে পারে—কিছুই জানি না’।

‘সাথে যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে?’

‘ফার্মের মোটা একটা টাকা তার সাথে থাকার কথা। আমরা সন্দেহ করছি সে তার স্মরণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।’

প্রাণটাও হারাতে যাচ্ছে, মনে মনে ভাবলো টেনডেল। মাফিয়ার টাকা মেরে দিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত পার পায়নি। যতোখরচই পড়ুক ওরা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে। এটা একটা নীতির প্রশ্ন। সে নিজের নীতি মেনে চলে, কাজেই এ-ধরনের কাজে তার সমর্থন এবং শ্রদ্ধা আছে। হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িতে না হলে ওদের সে সাহায্য করবে।

জন প্লেয়ার নামে পরিচয়-দাতা লোকটা টেবিলের ওপর একটা ফটো রাখলো। ফটোর পাশে রাখলো মোটা একটা সাদা এনভেলোপ। ‘ওর নাম নিক,’ বললো রানা। ‘নিক ডালো। কালো চোখ, কামানো মাথা, তবে পরচুলা পরে থাকতে পারে। চোকে, ছয় ফিট লম্বা। ভালো ইংরেজী বলতে পারে না, কথার মধ্যে বিদেশী টান আছে।’

সার্জেন্ট ভাবছে, এনভেলোপে কতো টাকা? ‘কতো দিন ধরে নিখোঁজ?’

‘সম্ভবত দু’তিন মাস। আমরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। আপনারা হয়তো তার নামটা মিসিং পারসন তালিকায় তুলে দিতে পারবেন, তারপর টেলিটাইপ...।’

কৌতুক বোধ করলো সার্জেন্ট টেনডেল। মাফিয়া পরিবারগুলোর নার্স আছে বলতে হবে! নিজেদের কাজে তারা এমনকি জাতীয় পুলিশ টেলিপ্রিন্টার সাভিসকেও কাজে লাগাতে চায়! ‘ঠিক আছে, ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করে দেখবো,’ আশ্বস্ত করলো সে।

ফটো আর এনভেলাপ নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল টেনডেল। সন্দেহ নেই, টয়লেটে বসে টাকা গুণতে গেল। খানিক পরই ফিরে এলো সে, হাতে শুধু ফটোটা রয়েছে, এনভেলাপটা সম্ভবত পকেটে। ‘মিস্টার প্লেয়ার, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।’

‘ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।’ ছটো আঙুল দেখালো রানা। ‘খুঁজে বের করতে পারলে।’

‘আপনি শুধু জানতে চান, মিস্টার ডালো-কে কোথায় পাওয়া যাবে, এই তো? নাকি চান আমরা তাকে আটক করবো?’

‘না, সার্জেন্ট, না। তেমন যারাত্মক কিছু করেনি সে। বেচারী শুধু ভুলে গেছে সে কে আর তার আসল ঠাই কোথায়।’

‘কোথায় উঠেছেন আপনি, মিস্টার প্লেয়ার?’

‘নিস শ্যাভো, খুব সুন্দর হোটেল।’

‘কিন্তু ওখানে স্ট্রিপটিজ হয় না,’ অভিযোগের সুরে বললো সার্জেন্ট টেনডেল।

‘সময় কাটাবার কথা যদি বলেন, স্ট্রিপটিজের চেয়ে রাইফেল রেঞ্জ আমাদের বেশি টানে,’ বললো রানা। ‘ভাবছি একটু ঠাণ্ডা পড়লে শিকারে বেরবো।’

রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো সার্জেন্ট টেনডেল। সাইপার ? হিট ম্যান ? কিন্তু পেশাদার খুনীদের চেহারা তো এরকম হয় না। দেখে তো মনে হয় যেন কলেজে অধ্যাপনা করে, তবে অ্যাথলেটিক্সে অলিম্পিক স্বর্ণপদক ছিনিয়ে এনেছে।

কিন্তু আজকাল অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না। হতে পারে, এই চেহারার আড়ালে লোকটা পেশাদার খুনীও হতে পারে। রানাকে সে জানালো, চার মাইল দূরে একটা নাইট রেঞ্জ আছে, আলোর ব্যবস্থা ভালোই, তাপমাত্রা আশি ডিগ্রীতে নামলে ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করা যেতে পারে। পরামর্শের জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলো রানা।

হোটেল কামরায় ফিরে লিলিকে পেলো না রানা। সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটাই আগে জাগলো মনে। তবে একটু পরই জানা গেল কেউ লিলিকে খুনও করেনি, এফ. বি. আই. তাকে গ্রেফতার করেও নিয়ে যায়নি। আরেকটা চাবি ছিলো তার কাছে, দরজা খুলে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। ফিরতে অবশ্য দেরি হয়েছে, কারণ প্রোট এক লোক গদগদ হয়ে কাছে ভেড়ার চেষ্টা করেছিল। রাজকীয় ডিনার খাওয়ার প্রস্তাব পায়ে ঠেলে ফিরে এসেছে লিলি। রানাকে সে বললো, ‘আমি যে তোমার সতী সাক্ষী স্ত্রী, প্রমাণ হলো?’

একবারও জিজ্ঞেস করলো না কোথায় গিয়েছিল রানা। রাত দশটার পর ডিনার খেয়ে আবার যখন বেরুলো রানা, তখনো লিলি জানতে চাইলো না কোথায় যাচ্ছে সে। মাসিডিঙ্গ নিয়ে সরাসরি ক্লাবে চলে এলো রানা। কতৃপক্ষের সাথে কথা বলে রাজি করালো তাদের, কিছু টাকা হাত-বদল হলো। এক ঘণ্টা প্র্যাকটিস করতে

পারবে রানা। ইচ্ছে করলে অতিরিক্ত অ্যামুনিশনও কিনতে পারবে।

একের পর এক, বারবার ফায়ার করলো রানা। প্রতিবার ভালো রেজাল্ট করলো। নতুন রাইফেল নিয়ে রাতের বেলা প্র্যাকটিস করার অভিজ্ঞতা কাজে লেগে যেতে পারে। কেউ জানে না কখন কোথায় ডালচিমস্কির সাথে দেখা হয়ে যাবে তার।

## চার

---

সন্ধ্যা ছ'টার খবরে কিছুই বলা হলো না, হতাশায় ম্লান হয়ে গেল ডালচিমস্কির চেহারা। কোথাও কিছু ধ্বংস হলে তার খবর যোগাড় করার ব্যাপারে মার্কিন রিপোর্টাররা ভারি পটু। রেডিও বা টিভিতে দুর্ঘটনার কথা দিয়েই শুরু করা হয় খবর পড়া। প্রায়ই শোনা যায়, শিকাগোর একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে আগুন লেগে যাওয়ায় পঞ্চান্ন ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে, ডালাস কিংবা নিউ অলিয়ন্সে উদ্ভাদ এক স্নাইপার বিনা কারণে সতেরোজন শিশুকে গুলি করে মেরেছে, স্কুল বাস খাদে পড়ে যাওয়ায় শিক্ষক সহ বাহান্নজন ছাত্রের সলিল সমাধি ইত্যাদি। এ-সব খবর দৈনিক পত্রিকাগুলোতেও প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপা হয়। তবে টোকিও বা কাঠমণ্ডুতে প্রাক-

তিক ছবিপাকে পাঁচ-সাতশো লোক মারা গেলে রেডিও বা টিভিতে খবরটা এলেও, একেবারে শেষের দিকে ছ'এক কথায় সেরে দেয়া হয়, আর কাগজগুলোয় ছাপা হয় ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে। সাক্ষ্য সংস্করণ কিনে প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলালে ডালচিমস্কি। কোনো খবর নেই। আশ্চর্য ব্যাপার তো, টেক্সাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশ! ঘটনা ঘটেছে অথচ গুরুত্ব পায়নি, এমন হতেই পারে না।

তাহলে কি কতপক্ষে ব্যাপারটা চেপে গেছে

অস্বস্তিকর হতে পারে মনে করে সোভিয়েত সরকার প্লেন দুর্ঘটনা সহ আরো অনেক ঘটনার কথা চেপে যায়। দেখাদেখি আমেরিকান সরকারও সে-পথ ধরেছে নাকি ?

ডিনার খেতে খেতে আপনমনে মাথা নাড়তে লাগলো ডালচিমস্কি। উহু, তা সম্ভব নয়। এ-ধরনের একটা খবর ইচ্ছে করলেই চেপে রাখা যায় না। একটানয়, দুটোনয়, চল্লিশটা নিউক্লিয়ার ওঅ-রহেড! সবগুলো বিক্ষোভিত হলে কল্পনার বাইরে আওয়াজ হবে। সে আওয়াজ চেপে রাখা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর আগুন? তা-ও তো আকাশ ছোঁবে! একশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাবে মানুষ।

হয়তো সবগুলো বিক্ষোভিত হয়নি।

হয়তো এয়ারফোর্সের 'স্পেশাল উইপনস' বাক্সারের কাছে সিকিউরিটি গার্ডরা হ্যারি মার্কসকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।

ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা করো। সে-ধরনের কিছু ঘটে থাকলেও, এগারোটার খবরে নিশ্চয় বলা হবে। এগারোটার খবরে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও বাদ পড়ে না।

সাড়ে দশটা থেকে রুট সেভেনের নামকরা একটা বারে বসে আছে ডালচিমস্কি। এগারোটার খবরে ইণ্ডিয়ান গর্জ, টেক্সাস, বা কাছে-পিঠের এয়ার বেস সম্পর্কে একটা কথাও বলা হলো না। প্রাক্তন কে. জি. বি. ডকুমেন্টস এক্সপার্ট অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা না থেকে পারে না। আবিষ্কার করলো, মাত্রা ছাড়িয়ে উদ্ভিন্ন হয়ে পড়ছে সে।

নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। এর আগে প্রতিবার সব কিছু ঠিকঠাক মতো সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু এবারের ব্যাপারটা কেঁচে গেছে। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এসে স্যুটকেস গোছাতে লাগলো সে, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। গোলমাল কিছু যদি ঘটেই থাকে, সবচেয়ে নিরাপদ হবে কেটে পড়া। মুহূর্তের মধ্যে গায়েব হয়ে যাওয়া।

না।

রাত দুপুরে হোটেল ছেড়ে চলে গেলে লোকের মনে সন্দেহ হবে।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের বিল মেটালো ডালচিমস্কি, পিটসফিল্ডের রেন্টাল এজেন্সিতে ফিরিয়ে দিলো গাড়িটা। সকাল এগারোটায় বাসে চড়লো, ম্যাসাচুসেটস টার্নপাইক হয়ে বোস্টনের দিকে ছুটলো বাস। বার্কশায়ারে আসাটাই তার বোকামি হয়ে গেছে, কারণ এখানে কোনো রেল বা এয়ার সার্ভিস নেই। বোস্টনের মতো বড় শহরে থাকলে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দিকে রওনা হওয়া সম্ভব। তাছাড়া প্রচুর লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ করবে সে। ওখান থেকে ইচ্ছে করলে মন্টি-অলও চলে যেতে পারে।

মুখ তুললো। ডালচিমস্কি, আর্টস্ট রাউজ পরা যুবতী এক মেয়ের  
 টাউস বুকের ওপর চোখ আটকে গেল। ধীর পায়ে 'রেস্ট রুম'-এর  
 দিকে চলে গেল। রেস্ট রুম মানে টয়লেট, রাশিয়ার বাসগুলোয়  
 এ-ধরনের সুযোগ সুবিধে থাকে না। কিন্তু টয়লেটের কথা বা  
 আমেরিকায় কি আছে আর রাশিয়ায় কি নেই এ-সব সে ভাবছে  
 না। ভাবছে মেয়েটার কথা। না, তাও সে ভাবছে না। কিছুই ভাবছে  
 না। যুবতী মেয়েটার যৌবন দেখে রিয়াক্ট করছে তার শরীর।  
 তার ভেতর কি যেন একটা আপনাআপনি নড়ে উঠেছে, নড়ে উঠে  
 নিঃসঙ্গতার কথা আর নিজের শরীরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।  
 শরীর আর মনের চাহিদা দমন করার চেষ্টা করলো সে, তিরস্কার  
 করলো নিজেকে, কিন্তু মেয়েটাকে রেস্ট রুম থেকে বেরিয়ে আসতে  
 দেখে ঘন ঘন ঢোক গিললো, চোখ ফেরাতে পারলো না। নিজেকে  
 সে বোঝাবার চেষ্টা করলো, একটা মেয়ে বা তার নিজের শরীরের  
 চাহিদার চেয়ে মিশনট' অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। টেলি-বম ফাটাবার  
 আনন্দের সাথে আর কিছুই কোনও তুলনা চলে না।

কিন্তু কোথায় সে আনন্দ ? হ্যারি মার্কস বিস্ফোরিত হয়নি।

একবার না পারিলে দেখো শতাবার ! একজোড়া স্তনের কথা  
 ভুলে গিয়ে কাজের কথা ভাবো।

বোস্টনের পার্ক স্কয়ারে বাস থেকে নামলো সে। আরলিংটন স্ট্রীট  
 খুব বেশি দূরে নয়, হেঁটেই চলে এলো হোটেল হিলটন পর্যন্ত। বড়-  
 সড় হোটেল, এগারো শো কামরা। লোকজনের ভিড়ে নিরাপদ বোধ  
 করলো সে। তবু সারাটা দিন উদ্বেগ আর চিন্তিত্বের মধ্যে কাটলো।  
 মারাত্মক কিছু একটা যে ঘটেছে তাতে আর সন্দেহ কি। হেরাল্ড  
 আমেরিকান-এর সাক্ষ্য সংস্করণেও কোনো খবর থাকলো না।

বিপদের আশংকা করতে লাগলো ডালচিমস্কি। তার মনে হতে লাগলো, কারা যেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হোটেল কামরায় পায়চারি করেও উত্তেজনা কমানো গেল না। রুম সার্ভিসকে ডেকে ঘরেই ডিনার দিতে বললো, টেলিভিশনের সামনে থেকে নড়তে চায় না। নতুন একটা ভয় উঁকি দিচ্ছে মনের অনাচে কানাচে—হোটেলের নিচে হয়তো ওত্ পেতে আছে অজানা কোনো বিপদ। পুলিশ হতে পারে, এফ. বি. আই. হতে পারে। গোটা হোটেল ঘিরে রেখেছে। অপেক্ষা করছে কখন সে নামবে।

দূর, নিজেকে ধোঁকা দেয়ার কোনো মানে হয় না! আমেরিকান পুলিশ বা এফ. বি. আই. তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। জানে রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স আর কে. জি. বি.। কে. জি. বি. এজেন্টদের পাঠানো হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ তাদের মধ্যে কে স্ট্যালিনপন্থী আর কে নয় কেউ তা জানে না। এলে আসলে গ্রুর কমাণ্ডোরা আসবে, এসেছেও তারা।

তা আসুক। খাতাটা ওদের পেতে হচ্ছে না।

পায়চারি করতে করতে বিড় বিড় করছে ডালচিমস্কি। সত্যি যদি দেখি হোটেলটা ঘিরে ফেলছে ওরা, সাথে সাথে টেলিফোন করতে শুরু করবো। তার আগে দরজায় চেয়ার-টেবিল-ওয়ার্ডরোব ঠেকিয়ে ভেতরে ঢোকার পথটা বন্ধ করতে হবে। বিশটা ফোন করতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে তার। এখন থেকে শুরু করলে মাঝরাতে মধ্য সবগুলো টেলি-বম ফাটিয়ে দিতে পারবে সে।

জানালার দিকে হেঁটে গেল ডালচিমস্কি। সাততলা নিচে রাস্তা। গ্রুর লোকদের যদি দেখা যায়, আমেরিকা আর রাশিয়ার দুর্ভাগ্য



বলতে হবে সেটা। গোটা ছনিয়ার ছুঁভাগ্য।

কিন্তু নিচের রাস্তা প্রায় ফাঁকা। ছ'একজন পথিক ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ দাঁড়িয়ে নেই। রাস্তার কিনারায় কোনো গাড়িও থেমে নেই।

রাত দশটার কিছু পর কামরা থেকে বেরুলো ডালচিমস্কি। পিছনের সিঁড়ি ব্যবহার করলো সে, এলিভেটরে চড়তে ভয় করছে। জানে, এলিভেটরে বোমা ফিট করে রাখতে খুব পছন্দ করে গ্রুর কমাণ্ডার।

বিশাল ধড় নিয়ে সাততলা থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এসে হাঁপাতে লাগলো সে। টয়লেটে ঢুকে বসলো, জিরিয়ে নিচ্ছে। তার পর লাউঞ্জে বেরিয়ে এসে চারদিকে সতর্ক চোখে তাকালো। লোক-জনের মধ্যে কেউ তার শত্রু থাকতে পারে। যুবক-যুবতীদের একটা দল দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, গলা ছেড়ে হাসছে তারা, বুদ্ধি করে তাদের সাথে ভিড়ে গেল সে। হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে পিছন দিকটা দেখে নিলো। না, কেউ অনুসরণ করছে না। হন হন করে হাঁটতে শুরু করলো সে। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে, নোংরা কোনো এলাকায় যেতে হবে। যেখানে সস্তা ছায়াছবি দেখানো হয়, থিয়েটারের মঞ্চে প্রায় উলঙ্গ হয়ে অভিনয় করে মেয়েরা, অলিতে গলিতে ঘুর ঘুর করে বেশ্যাগুলো।

দুশ্চিন্তা-মুক্ত হবার জন্যে খানিক আনন্দ-ফুটি করা দরকার তার আজ।

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর জায়গামতো পৌঁছে গেল ডালচিমস্কি। রাস্তার দু'ধারে সার সার দরজা, প্রতিটি দরজা আলোকমালায় সাজানো। দরজার পাশেই টিকেট কাউন্টার। ভেতরে লম্বা একটা

করিডর, করিডরে সার সার বাস্ক আকৃতির ঘর। ঘরের ভেতর একটাই টুল, সেটায় বসে একটা গোল ফুটোয় চোখ রাখতে হয়। ফুটোর ওদিকে আলোকিত মঞ্চ, এক জোড়া যুবক-যুবতী আদিম প্রযুক্তি চরিতার্থ করছে। অন্তত দরজার পাশের দেয়ালে সাঁটানো পোস্টারে সে প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে।

একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগলো ডাল-চিমস্কি। টিকেট ঘরে বসা লোকটা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকালো। এ ধরনের প্রৌঢ় খদ্দেরদের স্বভাব তার জানা আছে। প্রায় সবাই প্রথম প্রথম ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত বোধ করে। কিন্তু একবার শো দেখার পর নিয়মিত দর্শক বনে যায়। চোখাচোখি হলে লজ্জা পেয়ে সরে যেতে পারে।

চোখাচোখি হলো না, তবু সরে গেল ডালচিমস্কি। প্রায় ছুটে শুরু করলো সে। রাস্তার ছ'পাশে হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ তার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে ফোন বদলের ভেতর ঢুকলো ডালচিমস্কি। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে খুচরো পয়সাগুলো স্পর্শ করলো। খুচরো পয়সা কোনো সমস্যা নয়। উত্তর আমেরিকায় পা দেয়ার পর থেকে সব সময় তিন ডলারের মতো খুচরো পয়সা পকেটে রাখছে সে। দরকার হলেই যাতে বোমাবাজি শুরু করে দিতে পারে। পকেটে পয়সা থাকায় নিজেকে তার সশস্ত্র বলে মনে হচ্ছে।

ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকলো ডালচিমস্কি। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, তবে শীত, গরম বা শরীরের কথা ভাবছে না সে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, খেয়াল করলো না। ধড়াস ধড়াস করছে

বুকের ভেতরটা। রিসিভার তুলে টেক্সাসের নম্বরে ডায়াল করতে শুরু করলো। কাজটা হয়তো বোকামি কিংবা নেহাতই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবু তাকে জানতে হবে।

‘হ্যালো,’ নারীকণ্ঠ, গলায় টেক্সাসের সুরে, খুব একটা কম নয় বয়স।

‘মিঃ হ্যারি মার্কস...?’

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড কোনো শব্দ হলো না, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল। ‘আপনি বোধহয় খবর পাননি। মিঃ মার্কস অ্যান্ড্রিডেন্ট...।’

তাকে শেষ করতে না দিয়ে প্রায় চিৎকার করে জানতে চাইলো ডালচিমস্কি, ‘নিশ্চয়ই সিরিয়াস কিছু নয়?’

আবার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ হলো। ‘সিরিয়াস,’ মহিলা বললো। ‘ইন্টারস্টেট ধরে কাল তিনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এয়ার বেসের দিকে। বড় একটা ট্রেইলর ট্রাক পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তার পিছু পিছু নামছিল, ব্রেক ফেল করে। ধাক্কা লাগার সময় ট্রাকের স্পীড ছিলো আশি, তাঁর গাড়ি খাদে পড়ে যায়।’

চোখ বুজলো ডালচিমস্কি, দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো। খাদের কিনারা থেকে চ্যাপ্টা গাড়িটা খসে পড়ছে। ‘মিঃ মার্কস...?’

‘মারা গেছেন,’ মহিলা বললো। ‘ভয়াবহ, এক কথায় ভয়াবহ। তিনি কোনো সুযোগই পাননি।’

অ্যামবুশ?

ফাঁদে ফেলে মারা হয়েছে তাকে?

এরু কমাণ্ডোরা এ-ধরনের দুর্ঘটনার আবরণেই শত্রুদের যমের বাড়ি পাঠায়, জানা আছে ডালচিমস্কির। ডীপ-কাভার এজেন্টদের

সে ব্যবহার করার আগে কমাণ্ডোরা তাদের মেরে ফেলবে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রু ? ‘হুঃখজনক, মর্মান্তিক...,’ বিড়বিড় করে বললো সে ।

‘সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে । আপনি তাঁর বন্ধু ?’

‘ঠিক তা নয়, জানাশোনা ছিলো । দয়া করে মিসেস মার্কসকে আমার সহানুভূতি জানাবেন ।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই । আমি তার বোন ।’

রিসিভার রেখে দিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো ডালচিমস্কি, কাঁপছে । শুধু উদ্ভিন্ন নয়, ভয়ও পেয়েছে । মার্কসকে যদি মেরে থাকে, অন্যান্যদের ওপরও তাহলে চোখ রাখছে ওরা । হয়তো পঞ্চাশ জনের একটা দল পাঠিয়েছে গ্রু । মেক্সিকো আর কানাডায় এরকম দল আছে ওদের । তারা হয়তো ওকেও খুঁজছে । পরচুলা পরেছে, নতুন গোঁফ গজিয়েছে ঠোঁটের ওপর, তবু ওকে তারা চিনে ফেলতে পারে । ট্রেনিং পাওয়া শিকারী তারা, শিকারের খোঁজে বেরিয়ে খালি হাতে ফেরে না । ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বিড়বিড় করে বললো সে, ‘আমাকে ধরা অতো সহজ নয় !’

‘কিন্তু আমি তোমার হাতে ধরা দিতে চাই, প্রিয়তম ।’ হেসে উঠে প্রায় ডালচিমস্কির গায়ে গড়িয়ে পড়লো মেয়েটা । সেই বাসে দেখা মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ডালচিমস্কির । এই মেয়েটার বুকজোড়া তার চেয়েও বড় । ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর বয়স, চোখ আর ভুরু নাচিয়ে নিজেই বলে দিচ্ছে, পতিতা । ঠোঁটে সবজান্তার হাসি, কাপড় থেকে ভুর ভুর করে সেণ্টের কড়া গন্ধ বেরুচ্ছে । সস্তা-দরের কীট একটা, পশুশক্তি প্রয়োগ করার জন্যে আদর্শ পাত্রী হতে পারে । ওর সাথে গেলে অন্তত ঘণ্টাখানেক গ্রুর কথা ভুলে থাকা যায় ।

ডালচিমস্কিকে ইতস্তত করতে দেখে খিল খিল করে হাসলো মেয়েটা। ‘নিজেকে ঠকিয়ে না হে, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে না ! বোঝাই যাচ্ছে, অ্যাকশন দরকার তোমার।’

‘তা দরকার,’ স্বীকার করলো ডালচিমস্কি।

‘এসো তাহলে একটা পার্টির ব্যবস্থা করি,’ প্রস্তাব করলো মেয়েটা। ‘আমার এক গার্লফ্রেন্ড আছে, একই কামরায় থাকি আমরা। সোনালি মেয়ে। ভা-আ-আ-রি ছুটু। আর এতো সব মজারমজার কৌশল জানে না, কি বলবো। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছো?’

‘মন্দ কি!’ রাজি হয়ে গেল ডালচিমস্কি। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। এতোটা অসংযমী হওয়া কি উচিত হচ্ছে? বিশেষকরে নিজেকে যখন চিনি? বন্ধ ঘরে ছোটো মেয়েকে পেয়ে যদি নিজেকে সামলে রাখতে না পারি? আরে দূর, আমি কি অবোধ শিশু? ‘চলো তাহলে। কোথায়?’

‘পঞ্চাশ ডলার, ঠিক আছে?’ জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা। ‘কাজ দেখে তোমার অবশ্য পাঁচশো ডলার দিতে ইচ্ছে করবে।’ জিভের ডগা বের করে ঠোট ভেজালো সে। ডালচিমস্কিকে যেন বিশ্বাস করতে হবে মেয়েটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে আছে।

তৃতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলে এলো ওরা। লাল চোখে ঘুম নিয়ে দরজা খুলে দিলো দ্বিতীয় মেয়েটা। হাড়িসারাই বলা চলে, অস্বাভাবিক লম্বা, শেষবার কবে গোসল করেছে বলা মুশকিল। সোনালি চুল, কিন্তু রঙ করা। আগে পঞ্চাশ ডলার দিতে হলে, তারপর ওরা বিবস্ত্র করলো ডালচিমস্কিকে। দু’জন ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলো তাকে। তারপর বিবস্ত্র হলো নিজেরা। সবই যান্ত্রিক-

ভাবে ঘটছে, এর আগে বহু বার এ-সব করেছে ওরা। চোখ বুজে পড়ে থাকলো ডালচিমস্কি। শরীরটাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মাথাটাকে চিন্তা-শূন্য করার চেষ্টা করলো সে।

‘তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে আসছো, ডালিং ?’ লম্বা মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো।

‘হ্যাঁ, তবে আমার জন্ম হল্যাণ্ডে।’

‘কথা শুনে ঝাঁচ করা যায়।’

আদরের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো।

‘তুমি ক্লান্ত,’ প্রথম মেয়েটা বললো। ‘হাত-পা কিছুই তোমাকে নাড়তে হবে না, যা করার সব আমরা করছি।’

মেয়েটা বলার পর ডালচিমস্কিরও তাই মনে হলো, সে ভীষণ ক্লান্ত। কতোক্ষণ পর জানে না, হঠাৎ চোখ মেলে উপলব্ধি করলো, ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অন্তত কয়েক মিনিট তো বটেই। ঘুমটা ভেঙেছে ইঞ্জিনের শব্দে, রাস্তা দিয়ে ভারি একটা ট্রাক ছুটে গেছে বলে মনে হলো। সোনালি মেয়েটা এখনো তার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, আদর করছে তাকে। কিন্তু প্রথম মেয়েটা বাথরুমে। খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখতে পেলো ডালচিমস্কি, সিন্ধের ওপর আয়নায় তার প্রতিবিম্ব।

ডালচিমস্কির মানিব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখছে সে।

সাথে সাথে বুঝতে পারলো ডালচিমস্কি কি করতে হবে। ছ’হাত তুলে থপ্ করে সোনালি চুল মেয়েটার গলা পেঁচিয়ে ধরলো সে, তারপর হ্যাঁচকা টান দিয়ে মট্ করে ভেঙে ফেললো ঘাড়। তৃপ্তির একটা ঢেউ বয়ে গেল তার সারা শরীরে। একেই বলে গায়ের জোর !

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ঠোঁটে নিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো ডালচিমস্কি। নিঃশব্দ পায়ে মেঝেতে নামলো সে। টেবিল থেকে তুলে নিলো টেবিল-ল্যাম্পটা। স্নাইচবোর্ডের সামনে থেমে প্লাগটা খুললো। বাথরুমের দরজার সামনে এসে দেখলো, ব্যস্তভাবে টাকা গুণছে মেয়েটা।

চার হাজার দুশো বাষট্টি ডলার। মেলা টাকা! আপনমনে হাসতে লাগলো মেয়েটা। ঘাড় ফেরাতে শুরু করলো সে। টেবিল-ল্যাম্পের গোড়াটা সর্বশক্তি দিয়ে তার মুখের ওপর নামিয়ে আনলো ডালচিমস্কি, মধুর হাসিটুকু খঁাতালানো মুখের ভেতর সঁধিয়ে দিলো। টলমল করতে লাগলো অসহায় নারী, তার গলায় কর্ডটা পেঁচালো ডালচিমস্কি। নব্বই সেকেণ্ড পর মারা গেল বিশাল বক্ষ মেয়েটা। মেঝে থেকে মানিব্যাগ আর টাকা তুলে দ্রুত কাপড় পরলো ডালচিমস্কি। মেয়েটার নীল আঙুরপ্যান্ট দিয়ে ল্যাম্পের গোড়াটা মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে। হোটেল থেকে বেরুবার সময় ভাবলো, তেমন কিছু এসে যায় না। শ্রেফ বেশ্যা ছিলো ওরা। কেউ ওদের অভাব বোধ করবে না। পচে দুর্গন্ধ না ছোটা পর্যন্ত কেউ হয়তো জানতেও পারবে না কিছু।

ততোক্শণে অনেক দূরে চলে যাবে ডালচিমস্কি। অন্তত এক হাজার মাইল দূরে। তার পকেটে থাকবে খাতাটা আর তিন ডলার খুচরো পয়সা। ছনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ ডালচিমস্কি কোথায় আছে কেউ তা জানবে না।

# পাঁচ

মানুষ বোধহয় বেশিরভাগই কিছুটা সৎ কিছুটা অসৎ। অন্তত সার্জেন্ট টেনডেল সেরকম একজন মানুষ। অবৈধ পয়সা খায় সে, তবে বিনিময়ে নির্ভার সাথে দ্রুত কাজও করে দেয়। পুরোপুরি অসৎ হলে নিখোজ ব্যক্তিদের তালিকায় নিক ডালোর নামটা তুলতো না বা টেলি-প্রিন্টারের সাহায্যে তার চেহারার বর্ণনা সারা দেশে প্রচারের ব্যবস্থাও করতো না। শুধু যে চেহারার বর্ণনা আর নামটা প্রচার পেলো তাই নয়, এফ. বি. আই. আর পুলিশ বিভাগের টেলি-ফটো সাভিসের কল্যাণে দেশের সবগুলো রাজ্যের সবগুলো পুলিশ স্টেশন আর এফ. বি. আই. শাখা অফিসে নিক ডালোর অর্থাৎ নিকোলাই ডালচিমস্কির ফটোও পৌঁছে গেল। কে. জি. বি. চীফ লুদভিক কায়কোভস্কি যদি জানতে পারতেন ডকুমেন্টস এক্সপার্টের ফটো মার্কিন পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে মাসুদ রানা নির্ধাৎ মুছাঁ যেতেন তিনি।

পঞ্চাশটা রাজ্যের স্টেট, সিটি, এবং ফেডারেল পুলিশ সেদিন বিকেল থেকেই নিক ডালোকে খুঁজতে শুরু করলো। কাজটা রুটিন,



কাঙ্গেই কেউই কোনোও টেনশনে ভুগলো না। শুধু এই একজন লোককে খুঁজছে না তারা—চুরি যাওয়া গাড়ি, পলাতক কিশোর-কিশোরী, ড্রাগস বিক্রেতা, অদৃশ্য আসামী, লুঠ হওয়া স্বর্ণালংকার, এবং আরো হাজার হাজার লোক আর মালামাল খুঁজে বের করতে হবে তাদের।

পরদিন জর্জিয়াতে ডালো নামে এক লোক গ্রেফতার হলো। কিন্তু তার বয়স মাত্র চব্বিশ, নতুন চাকরিতে ঢুকে তহবিল মেয়ে দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল।

ডেট্রয়টের একজন মটরসাইকেল পেট্রলম্যান একটা ইমপেরিয়াল গাড়ির পিছু নিলো। তার সন্দেহ হলো, ডাইভার লোকটার চেহারা নিক ডালোর মতো। খানিক পর জানা গেল, ভদ্রলোক ফোর্ড মটর করপোরেশনের একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সান ফ্রান্সিসকো-য় গ্রেফতার করা হলো এক লোককে। থানায় নিয়ে এসে জেরা করার সময় জানা গেল—বয়স চেহারা ইত্যাদি অনেকটা মিললেও লোকটা আসলে লোক নয়, মেয়েলোক—পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি লম্বা লেসবিয়ান। থানা থেকে বেরবার সময় সে বলে গেল, পুলিশের বিরুদ্ধে মানহানির কেস করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

ওহায়ো থেকে খবর এলো, সেখানকার পুলিশ নাক্সোস ডালো-পোলিস নামে এক প্রোটকে গ্রেফতার করেছে, লোকটা অশ্লীল ছবির ব্যবসা করে।

ওদিকে রানা ওর শূটিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে। রোজ রাতে এক ঘণ্টা করে রেঞ্জ থেকে ও, হাতের টিপ ঝালিয়ে নেয়। তারপর সঙ্গিনীকে নিয়ে বের হয় শহর দেখতে, নামকরা রেস্টোরাঁয় ডিনার খায়, ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে, আর নাইটক্লাবে নাচানাচি করে

হোটেল ফিরে আসে। পরদিন দুপুর বারোটার আগে ওদের ঘুম ভাঙে না।

এক রাতে লিটল স্টার ক্যাসিনোয় রুলেং খেলে দুশো ডলার জিতলো রানা। একটা টেবিলে বসে বিয়ার খাচ্ছে, ওয়েটার-এসে চিরকুট দিয়ে গেল একটা। রানা সেটা পড়ছে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লিলি বললো, ‘দেখবো না।’

‘এক্সকিউজ মি,’ বলে চেয়ার ছাড়লো রানা। সোজা টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো ও। চওড়া এনভেলাপে মোড়া একটা প্যাকেট রিসিভ করে বেরিয়ে এলো। লিলির কাছে যখন ফিরে এলো, হাতে কিছুই নেই।

‘কে ডেকেছিল, কি কথা হলো, কিছুই আমি জানতে চাইবো না,’ বললো লিলি।

‘এই না হলে আদর্শ স্ত্রী!’

ক্যাসিনোর চারদিকে চোখ বুলালো লিলি। ‘ডাকাতি করে এখান থেকে কেউ পালাতে পারবে বলে মনে হয় না, তুমি কি বলো? সিকিউরিটি সিস্টেমে কোনো খুঁত না থাকারই কথা।’

সিগারেট ধরালো রানা। ‘কোনো কাজই অসম্ভব নয়। যোগ্য লোক, উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট, নিখুঁত প্ল্যান দাও, ফোর্ট নক্স লুঠ করে আনতে পারি। সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে কোনো জায়গা নেই। হয়তো ভেতরের এক লোকের সাহায্য দরকার হবে। ওরলি এয়ারপোর্ট, কুরিয়ার সেন্টারে কি ঘটেছিল, মনে আছে তোমার?’

মাথা ঝাঁকালো লিলি।

‘কি যেন নাম লোকটার? শিকাগো ট্রিবিউনে পুরো ঘটনাটা ছাপা হয়েছিল। জনসন। পঁচিশ বছর জেল হয় তার। সার্জেন্ট জনসন।’

মার্কিন আমির একজন সার্জেন্ট ছিলো লোকটা, মনে পড়লো লিলির। আর্মড ফোর্সের কুরিয়ার সেটারে অসংখ্য টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট ছিলো, প্রায় সবগুলোর ফটো তুলে পাচার করতে যাচ্ছিলো লোকটা। মনে করা হতো, ভন্টটার ধারেকাছেও কেউ পৌঁছুতে পারবে না। বারোজন সশস্ত্র গার্ড পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিতো। খরচ বহুল ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি সিস্টেমকে ফাঁকি দিয়ে ভন্টে হাত দেয়া সত্যি অসম্ভব বলে মনে হতো। কিন্তু এই অসম্ভব কেই সম্ভব করে দেখায় জনসন। সেই থেকে অনেক এসপিওনাজ অর্গানাইজেশনের ট্রেনিং প্রোগ্রামে জনসনের ক্লাসিক অপারেশন ঠাই করে নিয়েছে। ‘তুমি পারবে—এখানে?’ অনেকটা বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

‘আন্দাজ করি পারবো, কিন্তু কার দায় পড়েছে? কিছুক্ষণ পরপর সরিয়ে ফেলা হচ্ছে টাকা—হানা দিলে বেশি হলে আশি হাজার থেকে এক লাখ ডলার পাবে তুমি। যদি ডাকাতি করতে চাই, বড় একটা ব্যাংক বেছে নেবো। আমরা যাকে খুঁজছি, ওই ব্যাটাও তাই বেছে নিয়েছিল, তুমি জানো? তার মতো আমি অবশ্য কাউকে খুন করবো না।’

‘বলতে চাইছো ব্যাংক ডাকাত হিসেবে তারচেয়ে যোগ্য তুমি?’

‘দশ গুণ।’

‘কিন্তু অস্বীকার করতে পারবে কোনো কোনো কাজে তোমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য সে?’

এক সেকেণ্ড চিন্তা করলো রানা। তারপর মাথা নাড়লো। ‘কেন অস্বীকার করবো। অনেক কিছুতেই আমার চেয়ে ভালো সে। একটা সার্টিফিকেট এখুনি তাকে দেয়া যায়—চ্যাম্পিয়ান টেলিফোনার।

এই, আরেক দফা বিয়ার চলবে নাকি ?’

‘কফি ?’ সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার, করিডরে চ্যারিটি উডস্টকের সাথে দেখা হয়ে গেল কর্নেল জিল ক্যাসেলের ।

মাথা ঝাঁকালো উডস্টক । ক্যাফেটেরিয়ার দিকে এগোলো ওরা । আড়চোখে তাকিয়ে জিল ক্যাসেল নিশ্চিত হলো, হ্যাঁ, আজও চ্যারিটি ব্রেসিয়ার পরেনি । অর্থাৎ পরপর ছ’দিন ! চ্যারিটির এ এক ধরনের উদ্ভট জেদই বলতে হবে, ভাবলো সে । নাহয় তার নতুন, হালকা গোলাপি ব্রেসিয়ারটার দিকে বারবার তাকতো সে, তাই বলে রেগেমেগে সেটা চিরকালের জন্যে খুলে ফেলতে হবে ? এখন যে তাকাচ্ছি, এখন কি করবে ? ‘গলব্রেথের সাথে কথা বলছিলাম,’ নরম সুরে বললো সে ।

হেনরি গলব্রেথ কর্নেল নয়, এজেন্সির সিনিয়র কর্মকর্তাদের একজন । চোদ্দ বছর ধরে গাধার খাটনি খেটে জিল ক্যাসেলের সম-মর্যাদায় উঠে এসেছে লোকটা । ওয়াকিং গ্রুপ ফাইভে সি. আই. এ.-র প্রতিনিধিত্ব করে সে । সেজন্যে বছরে আট হাজার ডলারের বেশি বেতন পায় । টলস্টয়, চেকভ, ফিদেল কাস্ট্রোর যৌন-জীবন সম্পর্কে যা কিছু জানার সব জানে । খুব ভালো দাবা খেলে ।

‘তারমানে বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছিলেন আপনি,’ বললো চ্যারিটি উডস্টক ।

‘ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার ঘটনা আর কলোরাডোর ঘটনা, দুটোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিল,’ বললো কর্নেল । ‘বললো, এফ. বি. আই. নাকি লিভেনওয়ার্থ আমি হসপিটালের ঘটনাটা নিয়ে খুব চেতে আছে ।’

কাঁধ ঝাঁকালো চ্যারিটি । একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কর্নেল ভাবলো, ওর নগ্ন কাঁধে হাত রাখার জন্যে আরো সাধনা করতে হবে আমাকে । ‘এ-সব ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না, জানলেও এই মুহূর্তে মুখ খুলতে রাজি নই ।’

‘ঠিক তাই তাকে বলেছি, চ্যারিটি । বলেছি, আমাদের ধারণা সবগুলোই সম্ভবত পাগল-ছাগলদের কাণ্ড ।’

আবার কাঁধ ঝাঁকালো চ্যারিটি, রীতিমতো শব্দ করে ঢোক গিললো জিল ক্যাসেল ।

‘বেন সুইটল্যান্ডও আমার অফিসে এসেছিল,’ বললো সে ।

‘তিনি আবার কি চান ?’

‘বিগরড সম্পর্কে জানতে চাইছিল,’ বললো ক্যাসেল । ‘কন্ট্রোল রুম থেকে হয়ে আমার কাছে আসে ।’

‘তারমানে তিনি জানেন, দ্বিতীয় পাখিটাও গাইছে না !’ গভীর হলো চ্যারিটি । ‘আপনার কাজিন সম্পর্কে নিশ্চয়ই খুব উদ্বেগ প্রকাশ করলো ?’

‘মাত্রা ছাড়িয়ে । কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ওর ব্যাপারে তাকে মাথা ঘামাতে হবে না ।’

‘আপনার কাজিনকে জানিয়েছেন, ছারপোকাটা ধরা পড়েছে ?’ জিজ্ঞেস করলো চ্যারিটি, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই লক্ষ্য করলো, তার বুকের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জিল ক্যাসেল ।

‘আমরা তাকে চিনতে পেরেছি,’ তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো জিল ক্যাসেল । ‘কিন্তু ধরিনি । দ্বিতীয় পাখিটাও গাইছে না, তারমানে প্রমাণ সহ এখন তাকে ধরা বেশ কঠিনই হবে বলে মনে হচ্ছে ।’

‘আপনার জায়গায় আমি হলে চ্যাপেলকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতাম,’ বললো চ্যারিটি। ‘সুযোগ না পেলে একজন লোক কিভাবে বেঈমানী করবে?’

‘এই জন্যেই তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে... শুরু করলো ক্যাসেল।

তাকে থামিয়ে দিয়ে চ্যারিটি বললো, ‘ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কিছু বলার থাকলে আগে একটা নোটিস দেবেন, মিঃ ক্যাসেল। কেননা আর্মারও তো শোনার জন্যে একটা প্রস্তুতি থাকা দরকার।’

মাথা নিচু করে নিয়ে ক্যাসেল বললো, ‘তোমার তো এতোদিনে বোঝার কথা যে আমি খুব লাজুক প্রকৃতির মানুষ...।’

আবার তাকে বাধা দিলো চ্যারিটি, ‘নোটিস!’

ক্যাফেটেরিয়ায় বসলো ওরা। ক্যাসেল বললো, ‘ঠিক আছে, আজ তোমাকে নোটিস দিলাম...।’

‘আবার যেদিন কফি খেতে আসবো এখানে সেদিন আপনার কথা শোনা যাবে,’ বললো চ্যারিটি। ‘এখন কাজের কথা হোক, কেমন?’

‘কাজের কথা?’

‘বেন সুইটল্যান্ড বা হেনরি গলব্রেথ, এদেরকে সন্তুষ্ট করা দরকার,’ বললো চ্যারিটি। ‘তা না হলে ডিরেক্টরের কাছে অভিযোগ করে বলবে, আমরা সহযোগিতা করছি না।’

ওয়েটার ওদেরকে কফি দিয়ে গেল।

‘কিভাবে সন্তুষ্ট করতে চাও?’ আগ্রহী হয়ে উঠলো কর্নেল।

‘অ্যানালিস্ট হিসেবে আমার ওপর খুব আস্থা ওদের। ভার্জিনিয়া, কলোরাডো, এবং লিভেনওয়ার্থে যা যা ঘটেছে সব লিখে ফেলবো

আমি, তারপর গবেষণা করবো...।’

‘গবেষণার ফলাফল কি হবে আমি আন্দাজ করতে পারছি,’ হাসতে লাগলো কর্নেল।

‘পাগলদের কাণ্ড,’ বললো চ্যারিটি। ‘দিন কয়েক অন্তত বোকা বানিয়ে রাখা যাবে ওদের।’

‘গুড আইডিয়া, চ্যারিটি,’ খুশি হয়ে উঠলো কর্নেল। ‘তাড়াতাড়ি শেষ করো তোমার গবেষণা। কাল বাদে পরশু এখানে বসে ফলাফলটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি আমরা, কি বলো?’

‘আপনি কিন্তু মোটেও লাজুক নন, মিঃ জিল ক্যাসেল,’ বললো চ্যারিটি, ‘স্যার। ওদিকে কেন, আমার চোখের দিকে তাকাতে পারেন না?’

জিল ক্যাসেলের হাতের কাপ থেকে লাফ দিয়ে টেবিলে পড়লো খানিকটা কফি। চ্যারিটি উডস্টকের বুকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তার চোখের দিকে তাকালো সে। মেয়েটা হাসছে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো তার।

‘তোমার ইয়ে করি, ইয়ংল্যাড!’

রোজ সকালে মনে মনে গালটা দিয়ে তারপর কাজে হাত দেয় জর্জ স্যাক্সটন। ডিটেকটিভ পুলিশ অফিসার হিসেবে যোগ্য এবং সৎ সে, কিন্তু তার দাদার বাবা সিসিলীয় মافیয়া পরিবারের একজন প্রতাপশালী সদস্য ছিলো এ-কথা তো আর মিথ্যে নয়। কাজেই কেউ তাকে অপমান করলে বা অসুবিধে ফেললে ঐতিহ্যবাহী রক্তে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগে। আইনের লোক, ছুরিতে শান না দিয়ে শান দেয় মুখে। বেলুন আকৃতির পেট বিশিষ্ট লেফটেন্যান্ট

ইয়ংরাড প্রায় এক বছর হলো হোমিসাইড ডিভিশনে বদলি করে পাঠিয়েছে স্যাক্সটনকে । বোস্টন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কেউই বাধা না হলে হোমিসাইডে আসতে চায় না । কারণ হোমিসাইডে ডিউটি দিতে হয় বিরতিহীন চক্ৰিশ ঘণ্টা, অথচ বেতন সবাই যা পায় তাই । খুন-খারাবি কোথাও না কোথাও ঘটছেই, আর রিপোর্টাররা চিনে-জোঁকের মতো সব সময় লেগে থাকছে গায়ে । গরম গরম এমন সব খবর আর চোখা চোখা এমন সব অভিযোগ ছাপা হয় কাগজগুলোয়, প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক থাকে এই বুঝি চাকরিটা গেল । রিপোর্টারদের ধারণা, দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি হত্যা রহস্যের কিনারা হয়ে যাওয়া উচিত । এদের জানা নেই, পুলিশ স্ট্যাটিস্টিক্স বলে, পারিবারিক কলহের জের হিসেবে যে-সব খুন-খারাবি ঘটে সেগুলো বাদে বাকি খুনগুলোর রহস্য বেশিরভাগই অনুদঘাটিত থেকে যায় ।

ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে ফটো দুটো আবার দেখলো স্যাক্সটন । এক জোড়া নিহত বেশ্যা । একেবারেই সাধারণ, কোনো বৈশিষ্ট্য নেই । দু'জনেরই কালো চুল, তবে একজনের সোনালি রঙ করা । যার পেটে অপারেশনের দাগ রয়েছে গত বছর দু'বার তাকে গ্রেফতার করা হয় । এবছর শীতে তিন মাসের জেল খেটে বেরোয় দ্বিতীয় মেয়েটা--মহিলা-জেলখানায় থাকার সময় সিফিলিসের চিকিৎসা করায় সে । সস্তাদরের মেয়ে ছিলো ওরা, খুনও হয়েছে সস্তাদরের এক হোটেলে । অথচ কাগজগুলো এমন চাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে যেন দু'জন বিশ্ব সুন্দরীকে হারিয়েছে তারা ।

মায়ের ওপর ঘৃণা আছে এমন কোনো লোক খুন দুটো করে থাকতে পারে, ভাবলো স্যাক্সটন । মেয়েদের যারা খুন করে তাদের মধ্যে এই অদ্ভুত একটা মিল দেখা যায়, বেশিরভাগই তারা মাকে ঘৃণা



করে । কিংবা এমন কোনো লোকের কাণ্ড, স্কুল জীবনে যৌন কলেং-কারীতে জড়িয়ে পড়েছিল, অপমানটুকু আজও ভুলতে পারেনি ।

মেয়ে ছোটো সাধারণ, কিন্তু খুনী লোকটাকে সাধারণ ভাবা যাচ্ছে না ।

মলি কাউন্টারের বয়স পঁচিশ, কানাডা থেকে আমদানী । রিটা টেমপল স্থানীয়, পনেরো বছর বয়সে স্কুল থেকে পালায় । ল্যাব কর্মীরা খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করেছে কামরাটা । অ্যাশট্রে থেকে শুকনো ঘাসের ভাঙা অংশ, কার্পেটের এক ধার থেকে কুকুরের পশম, বিছানা থেকে শক্ত একটা পাকা চুল পেয়েছে তারা । চুলটা সম্ভবত কারো গোঁফ থেকে খসে পড়া । নগদ টাকা পাওয়া গেছে আটানব্বই ডলার । বেশ অনেকগুলো হাতের ছাপও পাওয়া গেছে ।

ওগুলোর মধ্যে ডালচিমস্কির ডান হাতের ছাপও রয়েছে, কিন্তু জর্জ স্যাক্সটন তা জানবে কিভাবে ? সে একজন ডিটেকটিভ, জাহুকর নয় । কাজেই রাজ্যের রাজধানী স্প্রিঙফিল্ডে ওগুলো পাঠিয়ে দেয় সে, ছ'দিন পর সেখান থেকে রিপোর্ট এলো—শুধু নিহত মেয়ে ছোটোকে আইডেনটিফাই করা গেছে । এরপর স্যাক্সটন অপর নমুনাটা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছে, এফ. বি. আই.-এর মাস্টার ন্যাশনাল প্রিন্ট ফাইলে রাখা নমুনাগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখার জন্যে ।

চুইংগাম চিবাতে চিবাতে স্যাক্সটন ভাবলো, কুকুরের পশমটাও কি পাঠানো উচিত ছিলো ? মাথানাড়লো সে, খুন তো আর কুকুর-টা করেনি ! করেছে একটা দানব । লোকটা যে অস্বাভাবিক শক্তিশালী তাতে কোনো সন্দেহ নেই । লম্বা মেয়েটাকে, যার চুল সোনালি রঙ করা, ঘাড় মটকে মারা হয়েছে । দ্বিতীয় মেয়েটাকে খুন

করা হয়েছে টেবিল-ল্যাম্পের গোড়া দিয়ে বাড়ি মেরে । চওড়া মুখ ছিলো মেয়েটার, প্রায় সবটাই ভেতর দিকে ডেবে গেছে—প্রচণ্ড গায়ের জোর দরকার হয়েছে । লোকটা মেয়ের দালাল হতে পারে ? মাথা নাড়লো ডিটেকটিভ স্যাক্সটন । দালাল হলে কামরায় আটানব্বই ডলার পাওয়া যেতো না ।

ফোন বেজে উঠলো ।

রিসিভার তুললো স্যাক্সটন । ফেডারেল হেডকোয়ার্টার থেকে টেলি-প্রিন্টারে রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে । ‘আসছি,’ বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে ।

চার মিনিট পর প্রিন্ট-আউট নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এলো ।

নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । এই হাতের ছাপ মাস্টার ফাইলে নেই । যারই হাতের ছাপ হোক ওটা, কখনো মার্কিন সেনাবাহিনীতে ছিলো না সে, বা পঞ্চাশটা রাজ্যের কোথাও কখনো গ্রেফতার হয়নি ।

তবে ভবিষ্যতে লোকটা আবার কোনো অপরাধ করতে পারে । চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করবে স্যাক্সটন । ফোনের রিসিভার তুলে সংশ্লিষ্ট মহলকে নির্দেশ দিলো সে, ‘ফাইলে লিখে রাখো খুন্সী সন্দেহে খোঁজা হচ্ছে তাকে । সম্ভবত সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক । পরিচিত দু’জন বেশ্যাকে খুন করেছে, এই অভিযোগে গ্রেফতার করতে হবে ।’

নগদ তিন লাখের বেশি ডলার ও আমেরিকান এক্সপ্রেস চেক নিয়ে ব্রডওয়ে আর কলম্বাসের কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকোলাই ডালচিমস্কি । নিউ ইয়র্কে নয়, সান ফ্রান্সিসকোয় । নামকরা এক রেস্টোরাঁয়

সী-ফুড ডিনার খেয়েছে সে। একটা বারে বসে তিন আউন্স হুইস্কি গিলেছে। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভোগার পর হাতানা চুরুট কিনেছে এক প্যাকেট। কিনে ভালোই করেছে, এখন আর হাত দুটোকে নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না। ধূমপানে সে তেমন অভ্যস্ত নয়, তবে চুরুট টানতে কোনো অসুবিধেও হচ্ছে না। স্বস্তিবোধটা ফিরে এসেছে মনে। আঙুলের ফাঁকে চুরুট থাকায় হাত দুটো আগের মতো আর নিশপিশ করছে না।

ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় সিটে একটা ম্যাগাজিন পেয়েছিল, তাতেই মেয়েটার নাম আর ফটো দেখে সে। বার-বারা র‍্যাফোর্ড, সাধারণ একটা নাম। কিন্তু ম্যাগাজিনে লেখা হয়েছে, ড্যান্সার হিসেবে মেয়েটা নাকি অসাধারণ। তার নাচ দেখে আশি বছরের বুড়োও নাকি যৌবন ফিরে পায়। চার ভঙ্গিতে চারটে ছবি ছাপা হয়েছে তার, দেখে হাঁ হয়ে গেছে ডালচিমস্কি। একটা শরীরে এতো যৌবন ধরে কি করে!

বারবারা টপলেস ড্যান্সার, রীদম নাইট ক্লাবে রোজ রাতে তার প্রোগ্রাম থাকে।

রীদমের সামনে পৌঁছে সত্যি সত্যি দম আটকে এলো ডালচিমস্কির। দোতলা সমান বিকিনি পরা রঙিন পোস্টারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো সে। চড়া দাম দিয়ে টিকেট কিনে লাইনে দাঁড়ালো সে।

গভীর রাতে নাইট ক্লাব থেকে ঘামে গোসল হয়ে বেরিয়ে এলো ডালচিমস্কি। মাথাটা বেঁ। বেঁ। করে ঘুরছে। ভেতরের কলকজা সব যেন সচল হয়ে উঠেছে। কয়েকটা ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে।

এরপর যে ডীপ-কাভার এজেন্টের ঘুম ভাঙবে তার নাম স্যালি ডানকান। নিউ ইয়র্ক, ইথাকা-য় একটা বোর্ডিং হাউস চালায় সে। প্রায় বারো বছর ধরে। তারপর দু'দিন করে বিরতি নিয়ে আরো চারটে টেলি-বম ফাটাতে ডালচিমস্কি। এই চারটের পর বাকিগুলোর ঘুম ভাঙবে সে প্রতি ঘণ্টায় বিশজনের। ধ্বংসের বিরতিহীন ঢেউ আতঙ্কিত করবে মানুষকে, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্থির উত্তেজনায় ছটফট করবে। পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হবে পেট্যাগন। ইউ.এস. মিসাইল আর বম্বারগুলো লক্ষ্যস্থলের দিকে একবার রওনা হয়ে গেলে ক্রেমলিনের ভিলেনরা প্রাণভয়ে ভীত ইঁদুরের মতো ছুটোছুটি করবে, কিন্তু তখন আর কারুরই কিছু করার থাকবে না।

তবে এ-সব দেখার জন্যে উপস্থিত থাকবে না ডালচিমস্কি, কারণ শেষ টেলিফোনগুলো মায়ামির একটা বৃদ্ধ থেকে করবে সে। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই প্লেনে করে রিও রওনা হয়ে যাবে। ফোন করতে মোট কতো পয়সা লাগবে হিসেব করে রেখেছে, অতিরিক্ত দশ ডলার খুচরো পয়সা সহ পকেটেই আছে সব। হ্যাঁ, গোটা পরিস্থিতি এখনো তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ওরা হয়তো তাকে খুঁজছে, কিন্তু তার হৃদিশ বের করা অতো সহজ নয়, কাজেই আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাতঘড়ি দেখলো ডালচিমস্কি। দুটো দশ। বারবারা তার খুব উপকার করেছে, এখন একটা মেয়ে দরকার। আশপাশের রাস্তায় দু'একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপনমনে হাসতে লাগলো ডালচিমস্কি। আবার যদি কোনো মেয়ে তার মানি-ব্যাগ হাতড়ায়, একশো ত্রিশ ডলারের বেশি পাবে না। এতো অল্প টাকার জন্যে কাউকে খুন করার দরকার কি! প্রথমবার ভুলই হয়ে

গেছে, মেয়ে ছটোকে খুন না করলেও পারতো সে। একই ভুল করে নান ফ্রান্সিসকো পুলিশকে খোঁচানো বোকামি হয়ে যাবে। বোস্টনের মেয়ে ছটোর ভাগ্য খারাপ, তিক্ত হেসে ভাবলো সে।

ভাগ্য তার বদলেছে। নিগ্রো এক মেয়ের সাথে দেখা হলো তার, মেয়েটার মায়াভরা চোখ। আধ ঘণ্টার জন্যে মাত্র ত্রিশ ডলার নিলো। বেশি কথা হলো না, পেশাদারী দক্ষতার সাথে মেয়েটা তার ভূমিকা পালন করলো। তাকে খুন করতে হলো না বলে বিরাট স্বস্তি বোধ করলো ডালচিমস্কি। ভাবলো, কাল রাতেও হয়তো ভাগ্য সহায়তা করতে পারে, তাকেও হয়তো খুন না করে পারবে সে।

## ছয়

---

ইথাকা কলেজের চেয়ে চার গুণ বড় করনেল ইউনিভার্সিটি, তবে ছটোরই আলাদা ঐতিহ্য, গুরুত্ব, এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শহরটা গড়ে উঠেছে আপনার নিউ ইয়র্ক স্টেটের আকর্ষণীয় একটা এলাকা জুড়ে। ইথাকা ছাত্র-ছাত্রীদের শহর হিসেবেই পরিচিত। ট্যুরিস্টরা বড় একটা এদিকে আসে না, তবে অভিভাবকদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। বেশিরভাগ তারা হলিডে ইন বা শেরাটন মটর ইনেই

গুঠে, ট্যাক্স বাদেই প্রতিদিনের জন্যে ভাড়া গুণতে হয় পনেরো থেকে বিশ ডলার। ছাত্ররা অতো পয়সা পাবে কোথায়, কাজেই তারা দলবঁধে কোনো অ্যাপার্টমেন্ট বা সস্তাদরের কোনো বোর্ডিং হাউসে ঠাই করে নেয়। এ-ধরনের একটা বোর্ডিং হাউসের মালিক স্যালি ডানকান। তার বোর্ডিং হাউসটা তিনতলা, মোট নয়টা কামরা আছে, করনেল ক্যাম্পাস থেকে গাড়িতে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। দালানের সামনে ছোটো লন আর চওড়া পোর্চ আছে, লনের কিনারা ঘেঁষে সার সার ঝাঁকড়া-মাথা গাছ, রোদ উঠলে প্রচুর ছায়া পাওয়া যায়।

বারো-তেরো বছর আগে মিঃ ডানকান নামে এক লোক ছিলো বটে। লোকটার দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ফুড পয়জনিঙে অকস্মাৎ মারা যেতে হয় বেচারাকে। ফুড পয়জনিঙের কারণটা অবশ্য জানা যায়নি, তবে সে যে বাসি সসেজ খেয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিসেস ডানকান হাসিখুশি, মোটাসোটা মহিলা। মাতৃস্বলভ নানা গুণের অধিকারিণী। অচেনা অতিথিকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিতে পারে। কারো বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। কিছুটা আপনভোলা, এমন একটা পোশাক নেই যেটা তার গায়ে সুন্দর-ভাবে ফিট করে। অতিথিদের জন্যে নিজেই রান্না করে সে। ব্যক্তি-গতভাবে কামরায় কামরায় গিয়ে অতিথিদের খোঁজ-খবর নেয়। তার একটা শখ হলো মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পেয়ালা-বাসন তৈরি করা। সবই যে বিক্রি করে তা নয়, কিছু কিছু দানও করে সে। নতুন অতিথিরা তার হাতে কাদা-মাটি দেখে বিস্মিত হলেও পুরনো অতিথি বা ইথাকার লোকজন দৃশ্যটার সাথে পরিচিত। রান্নাবান্না ভালোই করে সে, দামও তেমন বেশি নয়।

স্যালি ডানকান ঘরকুনো মানুষ, বোডিং হাউস ছেড়ে কোথাও বড় একটা যায় না। পড়শিদের সবার সাথে তার সম্পর্ক ভালো। তারা জানে, স্বামী মারা যাওয়ার পর গাড়িতে চড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে মিসেস ডানকান। ইথাকার লোকজন পরস্পরকে সাহায্য করতে ভালোবাসে, কাজেই স্যালি ডানকানের অনেক সমস্যার সমাধান আপনাআপনি হয়ে যায়। তার বাজার করার কাজটা পড়শি-রাই খুশি মনে করে দেয়।

ইথাকার দুটো সংগঠনের সাথে জড়িত স্যালি ডানকান। নেচার ক্লাব আর বার্ড ওয়াচারস লীগ। উনিশশো ত্রিয়ার সাল থেকে লীগের ট্রেজারার সে, প্রতি বসন্তে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আসছে। বছরে এক কি দু'বার মিটিঙে উপস্থিত থাকতে হয় তাকে, তখনই শুধু বোডিংহাউস থেকে বেরোনো হয় তার। আর বাইরে বেরুনোর সময় অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে সে। অতিথিদের সাথে গালোচনা করে একজনকে নির্বাচিত করা হয়, তার অনু-পস্থিতির সময়টুকু সেই লোক বোডিংহাউস ছেড়ে মুহূর্তের জন্যেও কোথাও যাবে না, এবং যে কোনো টেলিফোন মেসেজ আসা মাত্র খাতায় লিখে রাখবে। বোডিংহাউস ছাড়ার আগে ফোনের সামনে নিজের হাতে খাতা আর পেন্সিল রেখে যায় স্যালি ডানকান। বলে যায়, অতিথিরা নির্দিষ্ট দশ মিনিট সময়-সীমার মধ্যে বাইরে কোথাও ফোন করতে পারবে, বাকি সময় মুক্ত রাখতে হবে লাইন। নিয়মটা হাউস রুল হিসেবে মেনে চলতে হবে সবাইকে।

কারণটার সরল একটা ব্যাখ্যাও আছে। স্যালি ডানকানের অসুস্থ এক বোন আছে ওহায়োতে। হঠাৎ করে তার অসুস্থতা বেড়ে যেতে পারে, বা যে-কোনো দিন মারা যেতে পারে সে। কাজেই

সময় মতো খবর পাবার জন্যে ফোনের লাইন মুক্ত রাখা দরকার। সত্যি তার কোন বোন ওহায়াতে আছে কিনা সেটা অবশ্য আলাদা প্রশ্ন, কেউ এ ব্যাপারে কখনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। স্যালি ডানকানের এ-ধরনের ব্যক্তিগত গোপন ব্যাপার আরো ছ'চারটে আছে বৈকি, কিন্তু সে-সব সম্পর্কে তার নিজেরও ভালো ধারণা নেই। ওডেসায় তার দুই ভাই আছে। এক বোন আছে মারমানস্ক-এ, ইনস্টিটিউট অভ আর্কটিক মেডিসিন-এর ডেপুটি ডিরেক্টর।

মিঃ ডানকান ভিয়েৎনাম যুদ্ধের সময় ইউ. এস. আর্মিতে এঞ্জিনিয়ার ছিলো। হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করে সে। স্ত্রী মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করে, কিন্তু তার কাদা মাটিতে সি-থ্রু প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের গন্ধ কেন? স্বামীর কৌতূহল দমন করতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা তাকে বিদায় করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হলো স্যালি ডানকানকে। মনের ভেতর থেকে বলিষ্ঠ নির্দেশ পেয়ে কাজটা সারলো সে, এবং তারপর বেমালুম ভুলে গেল। সম্মোহনের এমনই জাদুকরী গুণ।

হপ্তা ঘুরে আজ আবার বৃহস্পতিবার রাত এসেছে। অতিথিরা বৃহস্পতিবার রাতের জন্যে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে। কারণ আজকের রাতেই স্পেশাল পার্ক চপ পরিবেশন করে স্যালি ডানকান, সাথে ওয়াটারমেলনের খোসা দিয়ে তৈরি আচার থাকে। করনেল ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর একবার বলেছিলেন, স্যালি ডানকানের পার্ক চপ ইথাকার একটা গর্ব।

সাড়ে ছ'টা বাজে। বড় একটা ডিশে করে পার্ক চপ নিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকছে স্যালি ডানকান, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো ফোনটা। স্কুল অভ এগ্রিকালচারের ইনস্ট্রাক্টর ভদ্রলোক দেখলেন



স্যালি ডানকানের হাত জোড়া, কাজেই তিনিই রিসিভারটা তুললেন।

কয়েক সেকেন্ড পর বললেন তিনি, ‘নিউ ইয়র্ক থেকে কার্টল্যাও নামে এক ভদ্রলোক। একটা কামরা চান—ডাবল রুম—আঠারো তারিখ থেকে তিন রাতের জন্যে।’

ডিশটা টেবিলে রাখলো স্যালি ডানকান। ‘কার্টল্যাও? পুরো নাম?’

‘আলফ্রেড...না, আলবার্ট। কি বলবো ভদ্রলোককে?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কথা বলবেন না, মিসেস ডানকান?’

‘দরকার নেই।’ অতিথিদের বিস্মিত করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল স্যালি ডানকান। টেবিলে বসে ক্ষুধার্ত অতিথিরা ভাবলো এখুনি ফিরে আসবে সে, হয়তো ওয়াটারমেলনের আচার আনতে গেছে। কিন্তু সেই যে গেল, আর ফিরলো না স্যালি ডানকান। স্টোররুমে ঢুকে দুই বাক্স ‘কাদা’ নিলো সে, তারপর গ্যারেজ খুলে গাড়িতে চড়লো—অনেক বছর পর এই প্রথম। জানালা দিয়ে সবাই তাকে চলে যেতে দেখলো। পরস্পরের দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকালো অতিথিরা।

এগারো মাইল গাড়ি চালিয়ে এলো স্যালি ডানকান, রাস্তার পাশে থেমে নেমে পড়লো। পিছনের বনেট খুলে ভেতর থেকে একটা স্যুটকেস বের করলো সে, মাটির বাক্স দুটো সহ তিনশো গজ ভেতরে ঢুকলো জঙ্গলের। ঘাসে খানিকটা ঢাকা পড়ে থাকলেও ম্যানহোলটা দেখতে পেলো সে। স্যুটকেস থেকে একটা যন্ত্র বের করে ম্যানহোলের ঢাকনি তুলে ভেতরে তাকালো। নিচে, কংক্রিটের

সাথে আরো একটা স্টীল প্লেট রয়েছে । দমলো না স্যালি ডানকান । ছোটো একটা সি-থ্রু প্লাস্টিক টুকরোর সাথে নো-নাইন ডিটোনেটর জোড়া লাগলো, ফিউজটা সেট করলো এক মিনিটে । হন হন করে হেঁটে ষাট কি সত্তর গজ দূরে সরে এলো সে, বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো ।

বিস্ফোরণের আওয়াজ রাস্তা থেকে শুনতে পাবার কথা, কিন্তু রাস্তায় এই মুহূর্তে কোনো পথিক বা যানবাহন নেই । ম্যানহোলের কাছে ফিরে এসে উঁকি দিয়ে নিচে তাকালো স্যালি ডানকান । স্টীল প্লেটটা খুলে গেছে । আরো নিচে দেখা যাচ্ছে সরু 'শ্যাফট', শেষ মাথায় কেবল । রাবার গ্লাভস পরলো স্যালি ডানকান, দু'ফলা কাটিং টুল-টা হাতে নিয়ে লোহার মই বেয়ে শ্যাফটের নিচে নামলো ।

ধারালো প্লায়ার্স দিয়ে আধ ঘণ্টা চেপ্টা করার পরও কেবল কাটা গেল না । কেবলের গায়ে ইম্পাতের আবরণ রয়েছে, ভারি শক্ত সেটা । লোহার মই বেয়ে আবার ম্যানহোল থেকে জঙ্গলে বেরিয়ে এলো স্যালি ডানকান । স্যুটকেস থেকে ভারি একটা কাঁচের বোতল বের করলো । আবার নিচে নামলো সে । বোতলের রঙহীন তরল পদার্থ ইম্পাতের আবরণে অল্প অল্প করে সাবধানে ঢাললো । এবার কাজ হলো, শক্ত ইম্পাত গলে গেল অ্যাসিডে । কাটার দিয়ে তার কাটতে আর কোনো অসুবিধে হলো না ।

সাথে সাথে বহু দূর দু'জায়গায় জ্বলে উঠলো অ্যালার্ম লাইট । একটা জ্বললো কলোরাডো স্প্রিংসে, পাহাড়ের নিচে গভীর এক পাতালপুরীতে ! আরেকটা জ্বললো গ্রীনল্যান্ডের থিউলে, ইলেকট্রনিক গিয়ারে ঠাসা অদ্ভুতদর্শন এক ভবনে । টেকনিশিয়ানরা দ্রুত

তৎপর হয়ে উঠলো ।

‘আই বাপ, রেড অ্যালার্ম সিগন্যাল !’ কলোরাডোর নর্থ আমেরিকান এয়ার ডিফেন্স কমান্ডের একজন ক্যাপটেন আতকে উঠলো ।  
‘ব্যাপারটা কি ?’

‘আরে সর্বনাশ, একি !’ আর্কটিকের ইউ. এস. এয়ার ফোর্সের ব্যালিস্টিক মিসাইল আলি ওয়ানিং সিস্টেমের একজন ডিউটিরত লেফটেন্যান্ট চমকে উঠলো । ‘কোথায় কি ঘটলো !’

ভাষা আর মুখভঙ্গি যাই হোক, দু’জনেই জানে যে লাল আলো আর বিপ বিপ বিপ অ্যালার্ম গুরুতর পরিস্থিতির ইঙ্গিতবহ না-ও হতে পারে । এন-ও-আর-এ-ডি হেডকোয়ার্টারে বসানো রাডার আউটপোস্টের সাথে মেইন ল্যাণ্ড-লাইন লিঙ্কিং বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও লাল আলো জ্বলতে পারে । অবশ্য মাত্র মাস তিনেক আগে হলে এই অ্যালার্মকে গুরুতর পরিস্থিতি বলে ধরে নিতো ওরা । তিন মাস আগে আরো কয়েক ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা হলো স্যাটেলাইট । কোথাও কোনো সিস্টেমে গোলযোগ দেখা দিলে অন্যান্য বিকল্প সার্কিটগুলো আপনা থেকেই সচল হলে উঠবে । ঘটলোও ঠিক তাই । স্যালি ডানকান তারটা ছেঁড়ার দশ সেকেন্ড পর বিকল্প সার্কিটগুলো কাজ শুরু করে দিলো । পনেরো সেকেন্ড পর কলোরাডোর ক্যাপটেন সিগারেট ফেলে দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলো । ‘মেইটেন্যান্স,’ বললো সে, ষাট ফুট লম্বা দেয়াল-মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আছে, ‘থিউল-এর দিকে যে মেইন বী-মিউজ ল্যাণ্ড লাইনটা গেছে সেটায় কোথাও গোলযোগ দেখা দিয়ে থাকতে পারে । সার্কিট চেকিঙের ব্যবস্থা করো, তারপর রিপেয়ার ক্রু পাঠাও ।’ ডিসপ্লে প্যানেলের

দিকে তাকালো সে, নর্থ আমেরিকান সিকিউরিটি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘ফ্যাক্টস’ দেখানো হয়েছে তাতে। তিনটে বিশাল রাডার স্টেশনের—থিউল, ইংল্যাণ্ড, বা আলাস্কা—কোনোটোতেই হানাদার রকেট দেখা যাচ্ছে না। ইলেকট্রনিক প্যাট্রলে রয়েছে অসংখ্য প্লেন আর জাহাজ, সেগুলোও কোনো হামলার সংকেত দিচ্ছে না। আক্রমণ নয়, যান্ত্রিক গোলযোগ।

এন ও আর এ-ডি-র মেইটেন্যান্স এক্সপার্টরা কালবিলম্ব না করে লাইন চেক করার ব্যবস্থা করলো। কলোরাডো থেকে হাডসন বে পর্যন্ত লাইনটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিয়ে সিগন্যাল পাঠানো হলো। গোলযোগের নির্দিষ্ট জায়গাটা বেছে বের করতে সময় লাগলো সাত মিনিট। জায়গাটা চালি ফরটি-ফোর নামে পরিচিত, ইথাকার কাছাকাছি। সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে রিপেয়ার ট্রাক থেকে ইকুইপমেন্ট নামাতে শুরু করলো ক্রুরা। ইতিমধ্যে কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে গেছে স্যালি ডানকান। আইন মেনে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছে সে। কানাডিয়ান বর্ডারের কাছাকাছি একটা জায়গায় পৌঁছুতে হবে তাকে।

ভোর হবার খানিক আগে লেক ওন্টারিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছুলো সে। এখান থেকেই তুলে নেয়া হবে তাকে। অন্তত সে-ধরনের একটা নির্দেশের কথাই তার মনে পড়ছে। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে সৈকতে চলে এলো সে। অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করলো, হেলিকপ্টারটা যদি দেখতে পায়।

সূর্য উঠলো।

অপেক্ষা করছে স্যালি ডানকান, জানে না তাকে উদ্ধার করার জন্মে প্লেন বা হেলিকপ্টার কিছুই আসবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে

গেল, তবু সে অপেক্ষা করে থাকলো ।

লাস ভেগাসে অনেক দেরি করে ঘুম ভাঙলো রানার । কাল গভীর রাতে স্কটল্যান্ডে টেলিফোন করেবসের সাথে কথা বলেছে ও । রাহাত খান এখন পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু হরিণ শিকারের লোভে আরো কিছুদিন ভিনসেন্ট গগলের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকতে রাজি হয়েছেন তিনি । ঘুম থেকে উঠেই সিদ্ধান্ত নিলো রানা, আজই একব র সার্জেন্ট টেনডেলের সাথে যোগাযোগ করবে । অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও । বিছানা থেকে নেমে রেডিওটা অন করলো, দেখা যাক নতুন কোনো ছঃসংবাদ আছে কিনা । খবর পড়া শেষ হতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রানা । তারপরই কে. জি. বি. থেকে পাওয়া মেসেজটার কথা মনে পড়ে গেল । মস্কো জানিয়ে দিয়েছে, ওকে আর সময় দিতে রাজি নয় তারা, যা করার ছ'একদিনের মধ্যে করতে হবে । যদি না পারে, ফিরে আসুক মস্কোয় ।

মস্কোয় ?

কোথায় ফিরবে রানা, সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার । তবে ধৈর্য হারানোর জন্যে মস্কোকে দোষ দিতে পারে না ও । যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে, ডালচিমস্কিকে খুঁজে বের করা যায়নি ।

ক্যাসিনোয় পাকা জুয়াড়ি যারা খেলতে আসে তাদের মধ্যে অনেক বুড়ো-বুড়িও থাকে । লাকি চান্স-এ ঢুকে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল রানা, অ্যালিস টেনডেল বাদে টেবিলটাকে ঘিরে আর যারা বসে আছে তাদের কারো বয়সই ষাটের নিচে নয় ।

‘পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছে আপনার,’ অভিযোগের সুরে বললো সার্জেন্ট। ‘ফলে তিন ডলার বেশি হারতে হলো আমাকে।’

দশ মিনিট আগে পৌঁচেছে রানা, কেউ ওকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখার জন্যে খরচ হয়ে গেছে পনেরো মিনিট। ‘তাহলে তো আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়,’ বলে টেনডেলের হাতে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিলো ও। একশো ডলার দিলো না, কারণ তাতে লোভী হয়ে উঠতে পারে লোকটা। ‘এবার বলুন, কোনো খবর আছে?’

মাথা নেড়ে স্নটে একটা ডলার ফেললো টেনডেল। ‘ডলার গিলে ফেললো মেশিন। ‘আরো হয়তো দিন দুয়েক সময় লাগবে, মিঃ প্লেয়ার। আমরা সবাই তাকে খুঁজছি—সারা দেশে। লোকাল ফোর্স-কেও কাজে নামিয়েছি আমি। প্রতিটি ইঁটই খুলে দেখা হবে।’

‘যথেষ্ট করছেন আপনি,’ বললো রানা। ‘তবে কি জানেন, আমার পরিবার সামান্য একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে মেশিনে আরেকটা ডলার ঢোকালো টেনডেল। ‘ধৈর্য জিনিসটা পুণ্যের মতো—মেয়েদের মধ্যে মাঝেমধ্যে দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে একেবারেই নেই।’ খুচরো পয়সায় ভরে গেল কাপটা। গুণে দেখা গেল চব্বিশ ডলার। ‘আমার ভাগ্য বদলাচ্ছে, মিঃ প্লেয়ার। হয়তো আপনারটাও বদলাবে।’

‘তাড়াতাড়ি?’

জেরা পয়সাগুলো জ্যাকেটের পকেটে ভরলো টেনডেল। ‘বলা কঠিন। আপনি হয়তো সময়টা কমিয়ে আনতে পারেন। পুরস্কার ঘোষণা করুন।’

লোভ। কিন্তু বিরক্ত হলো না রানা। লক্ষণটা শুভ, কারণ লোভী শান্তিদূত-২

লোকের চাহিদা মিটলে কাজ করে। ‘দু’হাজার?’

‘চলবে।’

অংকটা এরচেয়ে বড় হলে সন্দেহ দেখা দেবে, নিখোঁজ ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কেউ হবে। কিংবা গোটা ব্যাপারটার সাথে কারো জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। দু’হাজার ডলারে পেট ভরবে সার্জেন্টের, বদহজম হবার ভয় থাকবে না। আর কেউ হয়তো এক পয়সারও মুখ দেখবে না, সবটুকু একাই খাবে টেনডেল। সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে আরো দু’হাজার চাইবে সে। খুশি আর চুপ রাখার জন্তে দেবেও রানা।

‘টাকাটা বরং আপনাকে দিয়ে রাখি,’ বললো রানা। ‘হালকা হবো, নিরাপদও বোধ করবো। সাথে ওই পরিমাণই আছে।’

সার্জেন্ট বললো, এখনি একবার তাকে টয়লেটে যেতে হবে। তারমানে টাকাটা সবার সামনে নেবে না সে।

ক্যাসিনো থেকে একসাথে বেরুলো ওরা।

‘আজই আমি বেতারে খবরটা ছড়িয়ে দেবো,’ বললো টেনডেল। ‘কোনো খবর এলেই জানাবো আপনাকে। কোথায় যেন উঠেছেন বলেছিলেন?’

‘নিস শ্যাতো।’

‘রা-ই-ই-ট। আশা করি সুখবর খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারবো। জানি পরিবারের একজন হারিয়ে গেলে মনের অবস্থা কি হয় সবার। ভারি দুঃখজনক।’

ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে হোটেলে ফিরলো রানা, ফিরেই বিকেল পাঁচটায় রেডিওর খবরে অদ্ভুত ঘটনাটা শুনলো। লেক ওন্টারিয়োর দক্ষিণ তীরে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ এক মহিলা ঘন ঘন হাত নাড়ছিল,

অবসর উপভোগ করতে আসা একদল অ্যাংলার ফিশিং লঞ্চ থেকে তাকে দেখতে পায়। হাবভাব দেখে মনে হয় মহিলা কোনো গুরুতর বিপদে পড়েছে, কিন্তু সৈকতের কাছাকাছি পানি এতো কম আর চারদিকে এতো পাথর ছিলো যে লঞ্চ নিয়ে তারা এগোতে সাহস পায়নি। কাজেই এক ঘণ্টা পর লোকাল পুলিশকে ঘটনাটা জানায় তারা। থানা থেকে একটা রেডিও কার পাঠানো হয়।

পুলিশ কার কাছাকাছি গেলে, মধ্য বয়স্কা মহিলা পিস্তল বের করে গুলি করে বসে। রেডিও কার চালাচ্ছিল একজন অফিসার, বুকে গুলি খেয়ে সাথে সাথে মারা যায় সে, গাড়িটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নীল একটা পুরনো মরিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। পরে জানা গেছে নীল মরিসটার মালিক ইথাকার অধিবাসী স্যালি ডানকান। উল্টে যাওয়া পুলিশ কার থেকে হামাগুড়ি দিয়ে অপর অফিসার বেরিয়ে আসে, তারপর আড়াল নিয়ে পয়েন্ট থ্রু এইট ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন রিভলবার দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। বুকে গুলি খায় মহিলা, গলা থেকে তিন ইঞ্চি নিচে।

কিন্তু গুলি খেয়ে মারা যায়নি সে। মারা গেছে বিষ খেয়ে। দ্বিতীয় অফিসার নিজের চোখে তাকে একটা পিল গিলে ফেলতে দেখেছে। ইথাকার সবাই মিসেস ডানকানকে খুব ভালো করে চেনে, কিন্তু তার এই আকস্মিক মানসিক বিপর্যয় সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারেনি।

স্যালি ডানকান। টেলি-বম তালিকার একটা নাম। সাংকেতিক সিগন্যাল, ফোন নম্বর, রুশ নাম, অ্যাসাইনমেন্ট—সব মুখস্থ করা আছে রানার। এখন আর কোনো লাভ নেই। স্যালি ডানকানের বিপদ কেটে গেছে। বিহত পুলিশ অফিসারের মতোই ভাগ্যটা তার



থারাপ ।

ভাগ্য আমারও থারাপ, ভাবলো রানা । একের পর এক থারা যাচ্ছে ওরা, কাউকে বাঁচাবার কোনো ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না । ওর মন বলছে, পরিস্থিতি আরো থারাপের দিকে গড়াবে—খুব তাড়াতাড়ি ।

ঠিক করা ছিলো, দুটো টেলি-বম ফাটার মাক্থানে আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করবে ডালচিমস্কি, কিন্তু পরদিন সকালে হাডসন এয়ারপোর্টে নামার পর আরেকটা ফোন করার খোঁক সামলাতে পারলো না সে । মায়ামির দক্ষিণে হোমস্টেড এয়ার ফোর্স বেস রয়েছে, ওদের পানির ট্যাংকে জীবাণু ছেড়ে দিলে খুব মজা হয় । স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড-এর বি ফিফটি-টু বিমানের ক্রুরা পাই-কারীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে খবরটা কোনোমতে চেপে রাখা সম্ভব নয় ।

সত্যি চেপে রাখা গেল না । তবে এসোশিয়েটেড প্রেস এস. এ. সি.-র প্রেস রিলিজ অবিশ্বাস করলো না, তাতে বলা হলো, ফুড পয়জনিঙে ছয়জন নেভিগেটর মারা গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে আরো দুশো বাহান্ন জন । আগামী কয়েক দিন তারা বিমান চালাতে পারবে না । কিন্তু মাসুদ রানা বা কে. জি. বি. রেসিডেন্ট প্রেস রিলিজের বক্তব্য বিশ্বাস করলো না, বিশ্বাস করলো না ইউ. এস. এ. এফ.-এর স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন অফিস । এ-ধরনের 'ঘটনা'-র সংখ্যাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই । কারা যেন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পায়তারা কষছে, তাদের শাস্তি পেতে হবে । প্রতিটি ইউ. এস. এয়ার বেসে

‘অ্যালার্ট’ লেভেল ‘ডেঞ্জার’ পয়েন্টে তোলা হলো ~ সাবধানতা অব-  
লম্বনের জন্যে । আবার যদি আক্রমণ করা হয়, ইউ. এস. এয়ার  
ফোর্স অবশ্যই পাল্টা আঘাত হানবে ।

## সাত

---

রিঙ হতেই রিসিভার তুললো রানা ।

‘মিঃ প্লেয়ার ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘বোধহয় একটা ভালো খবর আছে আপনার জন্যে,’ বললো  
দার্জেন্ট টেনডেল ।

‘কি রকম ভালো ?’

‘হাউসটনে রয়েছে সে ।’

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রানার, কিন্তু তারপরই তীক্ষ্ণকণ্ঠে  
জিজ্ঞেস করলো, ‘ঠিক জানেন ?’

‘ঠিক । ঘণ্টাখানেক আগে এয়ারপোর্ট পুলিশ তাকে দেখতে পায় ।  
মিঃ ডালো পরচুলা পরে আছে, নতুন গোঁফও গজিয়েছে । কারণটা  
বলতে পারবো না ।’

ব্যাটা ন্যাকামি করছে, ভাবলো রানা। প্রশ্নটা আবার করলো ও, ‘কোথাও ভুল হয়নি তো?’

‘ফটোর সাথে তার চেহারার মিল রয়েছে, আর কি চান আপনি, মিঃ প্লেয়ার, স্যার? কথার সুরে বিদেশী টান। হোটেলে ডীন বার্গার নামে উঠেছে সে। হাবভাব দেখে মনে হয়, খুব অস্থির। কামরা থেকে বেরোয় না বললেই চলে।’

‘বেচারিা দিশেহারা বোধ করছে,’ বললো রানা। ‘অনুতপ্ত কিনা। আপনি তো জানেন না, একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে ওর আমরা চিকিৎসা করাচ্ছিলাম।’

আমি যেন একটা গাধা, আবোলতাবোল বোঝাচ্ছে, ভাবলো টেনডেল। মাফিয়াদের ধরন-ধারণ জানা আছে তার। নামটা ডালো হোক আর কালো হোক, ব্যাটাকে জ্যান্ত কবর নয়তো হাউরের পেটে চালান দেয়া হবে।

‘হোটেলটার নাম বলুন।’

‘এয়ারপোর্টের সাথে,’ বললো টেনডেল। ‘স্টার। তিনশো পাঁচ নম্বর কামরা। তার ওপর চোখ রাখার জন্যে হাউসটন পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি আমি। ওরা একজন লোককে পাঠিয়েছে, হোটেলের লবি পাহারা দিচ্ছে সে। আপনি শুধু ডেস্ক ক্লার্ককে গিয়ে বলবেন, সাথে সাথে হাউস ফোনের সাহায্যে মিঃ ল-কে ডেকে দেবে সে।’

রসিকতাটুকু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন একমাত্র কাজ পরবর্তী ফ্লাইট ধরে হাউসটনে পৌঁছানো। ধন্যবাদ জানিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলো রানা, ফোন করলো এক ট্র্যাভেল এজেন্টকে, জানতে পারলো টেক্সাসের দিকে আগামী ছ’ঘণ্টা কোনো প্লেন নেই। একটা ‘একজি-কিউটিভ জেট’ চাটার করলো ও।

ছয় সিনেটের লকহীড পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে টেক-অফ করলো। দু'-হাজার ছয় শো ডলার বেরিয়ে গেল নগদ, লিলির নিয়ে আসা টাকার ওজন আরো খানিকটা কমলো।

বেলা তিনটের সময় সঙ্গিনী আর রাইফেল নিয়ে হাউসটন এয়ার টার্মিনালে ঢুকলো রানা। পনেরোটা এয়ারলাইন্স কাজ করে এখানে, সুবেশী আরোহীদের ভিড়ে চ্যাপ্টা হবার যোগাড় হলো। বেয়োনেট চার্জে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একজন ইনফ্যান্ট্রি লেফটেন্যান্টের মতো ভিড় ঠেলে ভেতরে সৈঁধিয়ে গেল রানা। স্টার হোটেলের লবিতে ঢুকে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে লিলির মুখে মুখি হলো ও। 'সাথে অস্ত্র আছে ?'

চোখ পিটপিট করলো লিলি, কি ধরনের উত্তর পেলেন খুশি হবে রবিন ? 'হ্যাঁ।'

'গুড। আমি একা ওপরে উঠবো। লোকটার ছবি দেখো।' ডালচিমস্কির ফটো দেখালো রানা।

ছবিটা ভালো করে দেখে- নিয়ে মাথা ঝাঁকালো লিলি। ওর ধারণা হয়েছিল পয়েন্ট থারটি-টু অটোমেটিকটা দেখে রবিন হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে, যদিও কোন্টটা মার্কিন অস্ত্র, এবং প্রায় নিখুঁত একটা জাল লাইসেন্সও রয়েছে তার সাথে। রবিন খুশি হওয়ায় স্বস্তি বোধ করলো সে। কতৃপক্ষ তাকে বলে দিয়েছে, রবিনকে যেকোনো মূল্যে হাসিখুশি রাখতে হবে।

ডেস্ক ক্লার্ককে বলতেই লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে উঠলো। পরপর দশবার ডাকা হলো মিঃ ল-কে। কিন্তু জনাব আইনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। রানা অনুরোধ করলো, তবু ভদ্র-লোককে বারবার ডাকা হোক। আরো প্রায় দু'মিনিট পর তীক্ষ্ণ

চেহারার এক যুবককে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হালকা ব্লেজার, স্পোর্টস্ শার্ট, চেক প্যান্ট পরে রয়েছে। দশ ফিট দূরে থাকতেই নিজের পরিচয় দিলো সে, ‘ল।’

ডিটেকটিভের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলো রানা। ‘আমি জন প্লেয়ার। আপনি ছিলেন কোন্ চুলোয়?’

‘টয়লেটে যেতে হয়েছিল,’ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো সাদা পোশাক ডিটেকটিভ। ‘আপনিই ভেগাসের সেই ভদ্রলোক?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার চাচা ওপর তলায়। স্মৃতিভ্রংশ, তাই না?’

‘মনে হচ্ছে। এক মিলিয়ন ধন্যবাদ, অফিসার। বিধবাদের ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডে কিছু টাঁদা দিতে পারি?’

চোখ পিট পিট করে অফিসার দেখলো, জন প্লেয়ার পকেটে হাত ভরছে। ‘না-না, প্লিজ। টাঁদা নেয়ার অনুমতি নেই। একান্তই যদি দিতে চান, হেডকোয়ার্টারে চেক পাঠিয়ে দেবেন, স্যার।’

সমস্ত কথার মধ্যে ‘স্যার’-টা হলো সেরা, এমন আন্তরিকতার সাথে উচ্চারণ করলো, জন ওয়েনের অভিনয়ও মার খেয়ে যাবে। ‘আপনার নামটা?’ এলিভেটরের দিকে একটা চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলো রানা।

মিঃ ল বললো, ‘স্যাম মিয়ামি।’

‘হাউস্টন পুলিশ বিভাগে আপনি একটা রত্ন, অফিসার মিয়ামি। ধন্যবাদ। এখন থেকে সব দায়িত্ব আমার।’

বাইগ ডলার দিয়ে কেনা প্যান্টটা টেনে কোমরের আরো একটু ওপরে তুললো স্যাম মিয়ামি। ‘সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, স্যার। এ-ধরনের লোক মাঝে মধ্যে ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে।’

‘আরে না, আমাকে দেখে নরম কাদা হয়ে যাবে চাচাজান ।  
ধন্যবাদ ।’

বিদায় নিয়ে চলে গেল ডিটেকটিভ । সঙ্গিনী ঠিক জায়গায়  
আছে কিনা একবার দেখে নিলো রানা । লবির ভেতরই, দরজার  
কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে লিলি, চেয়ারের পাশে কেসের  
ভেতর রাইফেলটা । এলিভেটরে চড়ে চারতলায় উঠে এলো রানা,  
তিনশো পাঁচ লেখা কামরাটা দেখতে পেলো । দ্রুত চোখ বুলিয়ে  
নিলো করিডরের দু’দিকে, নেই কেউ । পয়েন্ট টু-টু বের করে চ্যাপ্টা  
দিকটা উরুর সাথে ঠেকিয়ে রাখলো । স্টারে সাইলেন্সারের কোনো  
দরকার নেই, লবিতে গোটা গোটা স্থূল অক্ষরে লেখা আছে, প্রতিটি  
কামরা সাউণ্ড প্রুফ ।

দরজায় নক করলো রানা ।

ঘরে ঢুকেই ডালচিমস্কিকে গুলি করবে ও । শুরু করবে পেটে  
একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে, তারপর খাতা প্রসঙ্গে কথা বলবে ।  
ডালচিমস্কির মতো একটা পশুর সাথে কমিউনিকেট করার একমাত্র  
উপায় পেটে একটা ফুটো তৈরি করা ।

আবার নক করলো রানা, ‘রুম সাভিস’ বলার জন্তে তৈরি হয়ে  
আছে । শয়তানটা যদি গা-ঢাকা দিয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত কামরা-  
তেই খাওয়া-দাওয়া সারছে, ইতিমধ্যে রুম সাভিসের আসা-  
যাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ।

কামরা থেকে কোনো সাড়াশব্দ আসছে না । ভালো ঠেকলো না  
রানার ।

‘উনি তো চলে গেছেন ।’

ঘাড় ফিরিয়ে ইউনিফর্ম পরা মহিলার দিকে তাকালো রানা ।

নিগ্রো মেইড ।

‘পাঁচ কি দশমিনিট আগে,’ আবার বললো মহিলা । ‘কেন তাকে খুঁজছেন, অফিসার ?’ রানার হাতের অস্ত্রটা দেখে ফেললো সে । ‘তারমানে ভালো লোক নয় ?’

‘খুনী ।’

‘বলেন কি ?’ আঁতকে উঠলো মেইড । ‘জানলে তো...’

জ্যাকেটে পিস্তলটা ভরে এলিভেটরের দিকে ছুটলো রানা । ডেস্ক ক্লার্ক জানালো, এই তো খানিক আগে চলে গেছেন ডীন বার্গার । না, কোনো ফরওয়াডিং অ্যাড্রেস দিয়ে যাননি ।

‘দুর্বল কিডনি নিয়ে পুলিশে চাকরি করতে এসেছে দশ সেকেন্ড পর লিলির সামনে মনের ঝাল মেটালো রানা । মিঃ ল-কে পেলো তাকে হয়তো কষে একটা চড়ই মেরে বসতো । ‘তাড়াহাড়ি এসো, এখনো হয়তো নাগালের বাইরে যেতে পারেনি !’

ছুটতে ছুটতে এয়ারপোর্টে চলে এলো ওরা । টার্মিনাল ভবনের সবখানে তন্নতন্ন করে খুঁজলো, প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে ছ’জনেই ঘেমে গেছে আর হাঁপাচ্ছে । একটা ব্যাপার পরিস্কার, শয়তানটা এই এয়ারপোর্টে নেই ।

ঠিকই আন্দাজ করছে রানা । খানিক আগে হাউসটনের দু’নম্বর এয়ারপোর্টে পৌঁচেছে ডালচিমস্কি । এই মুহূর্তে একটা ডিসি-এইটে চড়ছে সে । ক্লিভল্যান্ডে যাচ্ছে প্লেনটা । এখনো ডালচিমা নিশ্চিতভাবে জানে না লবিতে যে লোকটা তার ওপর নজর রাখছিল সে শত্রুদের একজন কিনা । শত্রু হোক বা না হোক, ঠিকানা বদলের সময় হয়ে গেছে তার । সব যখন ঠিকঠাক মতো ঘটছে, তখন ঝুঁকি নেয়ার কোনো মানে হয় না । আর দিন কয়েকের মধ্যে তার কাজ

শেষ হয়ে যাবে, আফ্লাদে আটখানা হয়ে ভাবলো সে । ওরা সবাই খতম হয়ে যাবে, সবাই । শুধু এই চিন্তাটাই তার শরীরে শক্তি আর পুলকের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে ।

রানা অনুভব করলো কেউ যেন তার সমস্ত শক্তি নিংড়ে বের করে নিয়েছে । লিলি ভাবলো, রবিনকে এই প্রথম এতোটা ভেঙে পড়তে দেখছি । টার্মিনালের একধারে, প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে ওরা, সামনে দিয়ে মিহিলের মতো ছুটে চলেছে জনশ্রোত । সাস্তুনা দেয়ার জন্যে রবিনকে কি বলা যায় ভাবছে লিলি । রবিনের পরাজিত চেহারা দেখে বুকটা তার টনটন করছে । তার একটা হাতে হাত রাখলো সে, মৃদু চাপ দিলো । ‘কফি খাবে নাকি, রবিন ?’ মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে ।

‘আরেকটু হলে ওকে আমরা ধরতে পারতাম,’ বললো রানা ।  
‘লোকটা যে সে-ই, আমি জানি ।’

‘আবার তাকে পাবে তুমি, রবিন ।’

চোখ বন্ধ করে জোরে শ্বাস টানলো রানা । ভীষণ, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে । ‘একবার পেয়েছি সেটাই তো মিরাকল ! আবার পাবো সে আশা না করাই ভালো । আর পেলেই বা কি, পাবার আগে সর্বনাশ ঘটতে বাকি থাকবে কিছু ?’

‘চলো কফি খাই,’ রানার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো লিলি । ‘মাথা গরম করে কোনো লাভ নেই ।’

কমপিউটার রুম থেকে বেরিয়ে সোজা বস কর্নেল জিল ক্যাসেলের কামরায় চলে এলো চ্যারিটি উডস্টক । ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করছে, মুখ তুলে তাকালো কর্নেল । অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল



তার মাথায়। প্রিয় নারীকে নিয়ে মানুষ যখন হাঁটে বা কোথাও বসে, তার সামনেটাই শুধু দেখার সুযোগ মেলে। অন্তত হাঁটার সময় নিয়মটা যদি এমন হতো যে পুরুষ পিছনে থাকবে, তাহলে বোধহয় ভালোই হতো। কিন্তু না, তখন আবার সামনেটা দেখার জন্যে হাহাকার করতো মন...। চ্যারিটি এগিয়ে আসছে দেখে নড়েচড়ে বসলো সে, সংযত করলো বেয়াদপ দৃষ্টি।

চ্যারিটি উডস্টকের হাতে ছোটো কমপিউটার প্রিন্ট-আউট রয়েছে, চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপর রাখলো সেগুলো। জিল ক্যাসেল লক্ষ্য করলো, আজও চ্যারিটি ব্রেসিয়ার পরেনি। মেয়েটা কি তার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে? প্রতিশোধের ধরনটা অবশ্য খারাপ নয়। এরপর হয়তো দেখা যাবে, ব্লাউজ বা ফ্রকও পরছে না। আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলো কর্নেল, ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলে কতো কিছুই তো ঘটতে পারে। হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়, দেখবো প্রিয়দর্শিনী চ্যারিটি নিরাবরণ হয়ে আমার কণ্ঠে ঝুলে আছে।

‘আপনার মুখের ভেতর মাছি ঢুকতে পারে।’

এতো দ্রুত মুখ বন্ধ করলো ক্যাসেল, কপ্ করে একটা আওয়াজ হলো। ‘কাজের কথা বলো,’ কর্কশ শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

ডেস্ক থেকে একটা প্রিন্ট-আউট তুলে ঠেলে দিলো উডস্টক। ‘সি. আই. এ. ডিরেক্টর থেকে শুরু করে বেন সুইটল্যান্ড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যে এটাই যথেষ্ট। বারো লাখ ডলারের কমপিউটার মিথো কথা বলে না।’

‘কি বলেছে শোনাও।’

‘ধ্বংসাত্মক যে ক’টা ঘটনা ঘটেছে সেগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে,’ বললো উডস্টক। ‘তবে তার সম্ভাবনা

ছাপান্ন হাজার চারশো ভাগের এক ভাগ। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এই ফলাফল জানিয়ে দিতে পারেন আপনি।’

‘গবেষণাটা তুমি করেছে। এ-কথা বললে ওরা বিশ্বাস করবে। তোমার ওপর ওদের ভারি আস্থা।’ দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটের দিকে তাকালো জিল ক্যাসেল। ‘ওটা?’

‘বিগ রড সম্পর্কে নতুন কিছু ডাটা পাবার পর ব্যক্তিগতভাবে আরেকটা প্রোগ্রাম তৈরি করি আমি,’ বললো উডস্টক। লক্ষ্য করলো, বরাবরের মতো তার বুকের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে কর্নেল। রাগ নয়, শিরশিরে একটা শীতল অনুভূতি হলো তার। এতো যার কৌতূহল, সব যদি কোনোদিন দেখার সুযোগ পায়, কি করবে তাই ভাবি।

‘রেজাল্ট?’

‘লোকটা তার নাম সহই করছে,’ বলে দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটটাও বসের দিকে ঠেলে দিলো উডস্টক।

ভালো করে পড়লো জিল ক্যাসেল। তারপর মুখ তুলে হাসতে লাগলো। ‘দারুণ, চ্যারিটি, তুলনাহীন। তোমার প্রমোশন হওয়া উচিত।’

‘প্রমোশনের কথা বলবেন না,’ শ্লান কণ্ঠে বললো উডস্টক। ‘একটা তো দশ মাস আগেই পাওনা হয়েছে।’

কর্নেল জানে, বেন সুইটল্যান্ড ফাইলটা চেপে রেখেছে। বেন লোকটা নারী-বিদ্বেষী, অথচ হেডকোয়ার্টারের মেয়েরা তার পিছু পিছুই ঘুরঘুর করে। ‘তোমার ফাইল নিয়ে এবার সরাসরি ডিরেক্টরের কাছে যাবো আমি,’ জেদের সুরে বললো সে। ‘তোমার মতো একটা প্রতিভাকে ওরা মর্যাদা দেবে না, ইয়াকি নাকি।’

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল উডস্টক । ‘আপনার কাজিন নতুন কোনো খবর দিয়েছে ?’

মাথা নাড়লো কর্নেল । ‘শেষ খবরটা তোমাকে আমি জানিয়েছি ।’

‘উঠি তাহলে... ।’

‘এক মিনিট,’ বলে নিজের উঠে দাঁড়ালো জিল ক্যাসেল । ‘তোমাকে একটা নোটিস দিয়েছিলাম, ভুলে গেছো বুঝি ?’

মৃহ হেসে মাথা নাড়লো উডস্টক । ‘না, ভুলবো কেন । তবে আগে আপনি আমার চোখের দিকে তাকাতে শিখুন, তারপর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা হবে ।’ দাঁড়ালো সে । টান টান করলো শরীরটা । ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো সুগঠিত স্তন জোড়া ।

জানে নিজেকে সামলাতে পারবে না, তাই চোখ বন্ধ করে ফেললো জিল ক্যাসেল । খিল খিল করে হেসে উঠে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চ্যারিটি উডস্টক । দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে চোখ খুললো কর্নেল, ধপাস করে চেয়ারে বসলো সে । বিড়বিড় করে বললো, ‘কি বিচ্ছু মেয়ে রে, বাবা !’

সাথে ফ্রেঞ্চ পাসপোর্ট থাকলেও রাউল ক্ল্যারমন্ট একজন রাশিয়ান, মন্টি অলে ছোটোখাটো একটা চাকরি করে সে । চেহারায় ভোঁতা একটা ভাব আছে, বয়স বত্রিশ, দশ বছর আগে রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স তাকে ট্রেনিং দেয়ার জন্তে বাছাই করে । দু’বছর ট্রেনিং পাবার পর গত আট বছর ধরে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেছে । সেকেন্ড গ্রেডের এজেন্ট সে, তারমানে গ্রুর নির্দেশে ইতিমধ্যে কমপক্ষে বারোজন শত্রুকে খুন করেছে । ফাস্ট গ্রেড এজেন্ট হতে

হলে কমপক্ষে বিশজন মানুষের প্রাণ নিতে হয়। মাসুদ রানাকে খুন করার নির্দেশ পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো ক্ল্যারমন্ট, কারণ আর মাত্র একজনকে খুন করতে পারলেই ফাস্ট গ্রেড পেয়ে যাবে সে।

অফিসে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে হোটেল বসে থাকলো ক্ল্যারমন্ট। তিন দিন অপেক্ষা করার পর পরবর্তী নির্দেশ এলো। শিকাগো-য় যেতে হবে তাকে, উঠতে হবে শেরাটন হোটেল। স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে সেদিনই রওনা হয়ে গেল সে, শিকাগোর শেরাটনে পৌঁছুলো রাত এগারোটায়। রাত ছটোয় একটা টেলিফোন পেলো ক্ল্যারমন্ট, কাল সকালে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে তাকে।

পরদিন সকালে চিড়িয়াখানায় তার সাথে দেখা হলো বন্ট্যাঙ্ক-এর। সুন্দরী একটা মেয়ে, ফ্রেঞ্চ এয়ারলাইন্সে স্টুয়ার্ডেস। বিদায় নেয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেটটা বেঞ্চের ওপর ফেলে গেল সে, যেন ভুল করে। হোটেল রুমে ফিরে এসে প্যাকেট খুলে ভেতর থেকে একটা ফটো বের করলো ক্ল্যারমন্ট।

মাসুদ রানার ফটো। সাথে ছোট্ট একটা চিরকুট, ‘সশস্ত্র, অভিজ্ঞ, অত্যন্ত বিপজ্জনক।’ একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো রাউল ক্ল্যারমন্ট। লোকটা কে, কি তার অপরাধ, এ-সব বিষয়ে মাথা ঘামালো না। কখনোই ঘামায় না। নিয়ম নেই।

ফটোটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিয়ে স্যুটকেস খুললো ক্ল্যারমন্ট, তার আগে দরজা আর জানালা বন্ধ করে নিয়েছে। স্যুটকেস থেকে কাপড়চোপড় বের করে ফলস বটমের ঢাকনি তুললো, ভেতর থেকে বের করলো প্লাস্টিক মোড়া কয়েকটা ইম্পাতের টুকরো—কোনোটা চ্যাপ্টা, কোনোটা টিউব আকৃতির। ওগুলো জোড়া লাগাবার কাজে

ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে ।

আড়াই মিনিট পর দেখা গেল ক্ল্যারমন্টের হাতে একটা L34A1 সাবমেশিন গান রয়েছে, ব্রিটেনে হার ম্যাজেস্টি-র সশস্ত্র বাহিনী যে L2A3 ব্যবহার করে এটা তারই সাইলেন্সার লাগানো সংস্করণ । স্টক বাড়ানো অবস্থায় চৌত্রিশ ইঞ্চি লম্বা, ভয়ংকর দর্শন সাত পয়েন্ট আট ইঞ্চি ব্যারেল সহ । মোটা সাইলেন্সার কেসিং ব্যারেল জ্যাকেট ঢেকে রেখেছে, ফলে ব্যারেলের যেখান থেকে গ্যাস বেরোয় সেটাও চোখের আড়ালে থাকলো । তিন সেট ফ্যারিং মেকানিজম । এস.—সেফটি পজিশন । আর.—সম্মি-অটোমেটিক ফায়ার । এ.—ফুল অটোমেটিক ।

এস. সুইচ টিপে সাবমেশিন গানটাকে সেফটি পজিশনে সেট করলো ক্ল্যারমন্ট, তারপর ম্যাগাজিন ভরলো । ফুল অটোমেটিক দিয়ে ট্রিগার টানলে গানটা থেকে প্রতি মিনিটে পাঁচশো পঞ্চাশটা নাইন-মিলিমিটার প্যারাবেলাম বুলেট বেরবে । এটা দিয়ে চারজন লোককে খুন করেছে ক্ল্যারমন্ট, একটা লাশও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ।

স্লিং-টা কাঁধে গলিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালো ক্ল্যারমন্ট, এক ঝাঁকিতে ফ্যারিং পজিশনে নিয়ে এলো গানটাকে । আপনমনে হাসতে লাগলো সে । ‘কোথায় ভাই তুমি, মাসুদ রানা ? না-না, তোমাকে আসতে হবে না, আমিই তোমার কাছে যাবো !’

ক্ল্যারমন্ট জানে, এখানেও তাকে অপেক্ষা করতে হবে । মাসুদ রানা কোথায় আছে সময় মতো জানানো হবে তাকে । তার ডান পায়ের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো আছে পয়েন্ট থ্রু এইট ওয়ালথার পি-পি-কে পিস্তল, কিন্তু সেটা চেক না করলেও চলে ।

শিকার যদি সশস্ত্র আর অভিজ্ঞ হয়, তার কাছাকাছি পৌঁছুবার সুযোগই সে পাবে না, কাজেই স্মল আর্মস ব্যবহারেরও প্রশ্ন উঠবে না।

টেলিভিশন অন করে চেয়ারে বসলো ক্ল্যারমন্ট। হোটেল ছেড়ে কোথাও বেরুনো চলবে না তার। কেউ বলতে পারে না কোন্ দিক থেকে কখন নির্দেশ আসবে।

## আট

---

সান ডিয়াগো-র কাছে মার্কিনীদের বড়সড় একটা ন্যাভাল এয়ার স্টেশন রয়েছে, সেটার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল টাওয়ার আর মেইন জেনারেটরে আগুন লাগলো। সরকারী প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করা হলো, ছাব্বিশ কোটি ডলার। কেউ নিহত হয়নি, তবে চৌত্রিশ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ছ'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি, পুরোদমে তদন্ত চলছে।

মেইন জেনারেটর অকেজো হয়ে গেলেও, এয়ার স্টেশন তাতে অচল হয়ে পড়েনি। গত বছর নতুন ইমার্জেন্সী জেনারেটর যেটা

বসানো হয়েছিল, আপনাআপনি সেটা চালু হয়ে যায়। লাস ভেগাস সান পত্রিকায় খবরটা পড়ার সময় রানার চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, শুধু চোখ জোড়ায় নগ্ন ঘৃণা আর ক্রোধ ফুটে উঠলো।

দেখে ফেললো লিলি। রবিনকে চিনে ফেলতে শুরু করেছে মেয়েটা। এখন সে রবিনের অনেক দুর্বোধ্য আচরণের তাৎপর্য ধরে ফেলতে পারে। ছ'জন প্রফেশনাল একটু বেশি সময় কাছাকাছি থাকলে যা ঘটান তাই ঘটছে। লিলি বোঝে, এতোটা ঘনিষ্ঠতার পরিণতি ভালো হতে পারে না। আজ বাদে কালই হয়তো মস্কোয় ফিরে যেতে হবে রবিনকে। আর তাকে হয়তো হপ্তা শেষ হবার আগেই চলে যেতে হবে টোকিও বা মিউনিকে। এক মিনিট বা এক মাস পর মারা যেতে পারে ছ'জনেই। এ-সব ব্যাপারে সচেতন না থেকে পারা যায় না, কাজেই প্রশ্ন না করে স্বস্তি কোথায়! 'কি ব্যাপার, রবিন?'

‘আমাদের সেই লোক।’ কাগজে টোকা দিলো রানা।

খবরটা পড়লো লিলি। ‘এবার খুব একটা সুবিধে করতে পারে-নি,’ অনেকটা যেন সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বললো সে।

‘পরের বার কি হবে? জানো কি আছে তার হাতে? কল্পনা করতে পারো কতো কি ধ্বংস করতে পারে সে? শুধু একবার ডায়াল করে?’

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো লিলি। ‘জানি না, রবিন—এবং সম্ভবত আমার জানা উচিতও নয়।’

‘ভাবতে পারো কাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে সে? এমন একজন ভালোমানুষকে দিয়ে, যে তেরো-চোদ্দ বছর ভুলে আছে

নিজের আসল পরিচয়, জানে না। আসলে সে কে. জি. বি.-র এক-জন ডীপ-কাভার এজেন্ট। তেরো-চোদ্দ বছর আগে তাকে বলা হয়েছিল, শুধু যুদ্ধ লাগলে তোমাকে ব্যবহার করা হবে। কাজটা করার পর হুঁশ ফিরবে তার, ধরে নেবে রাশিয়ার সাথে আমেরিকার পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে গেছে।’

মন দিয়ে শুনছে লিলি, চেহারায় সহানুভূতি।

‘টাওয়ার আর জেনারেটর ধ্বংস করে দিয়েই বেচারা হয়তো মেক্সিকো সীমান্তের দিকে ছুটেছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ যাতে তার নাগাল না পায়। জানি, কিছুই বুঝছি না তুমি। প্রশ্ন করতে চাইছি। কিসের পারমাণবিক বিস্ফোরণ? তাহলে শোনো,’ রানা যেন জনান্তিকে কথা বলছে। ‘মিসাইল ও অরহেড, বুঝলে। আর কি জানতে চাও, বলো।’ কার ওপর লিলি জানে না, কিন্তু বুঝতে পারছে ভয়ানক রেগে গেছে রানা। ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে।

লিলি জানতে চায়। ‘মিসাইল ও অরহেড?’

‘অথচ,’ হোটেল কামরায় পায়চারি শুরু করলো রানা, ‘কৌতুক-টা কি জানো? একটা রকেট বা মিসাইলও ছোঁড়া হয়নি। ভ্লাডিভোস্টকের পাঁচশো মাইল পশ্চিমের সাইলো-গুলোয় সব নিরাপদে আছে। হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, লিলি?’

‘করছো বলেই মনে হচ্ছে,’ শান্ত সুরে বললো লিলি। ‘আমার কথা হলো, এতোটা অস্থির না হলেও চলে। তুমি দেখো পুলিশ আবার লোকটাকে খুঁজে পাবে।’

‘প্রায় অসম্ভব। একবার পেয়েছিল সেটাই তো আশ্চর্য।’

‘পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দিলে হয় না?’

‘তা-ও ভেবেছি। দশ বা বিশ হাজার ডলার দেয়া যায় কিনা।’



কিন্তু অংক যতো বড়ো হবে, ততোই কৌতূহল বাড়বে মানুষের। টেনডেল নিজেও দিশেহারা বোধ করতে পারে। তার ধারণা হবে, ডালচিমস্কি সাধারণ কেউ নয়, ব্যাপারটার সাথে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। হয়তো ভয় পেয়ে এফ. বি. আই.-কে সব জানিয়ে দেবে সে।’

‘তা যদি জানিয়ে দেয়ও,’ বললো লিলি, ‘এখনকার চেয়ে বেশি বিপদে পড়বে না তুমি। আরেকটু সাবধানে থাকলেই কেউ তোমার নাগাল পাবে না। আর লাভের দিকটা ভেবে দেখো—বেশি টাকার লোভে টেনডেল হয়তো আরো ভালোভাবে খুঁজবে লোকটাকে।’

‘ওটা আমার সাত নম্বর প্ল্যান।’

‘এক থেকে ছয়গুলো কি, রবিন?’

‘জানলে তো কথাই ছিলো না।’ সিগারেট ধরালো রানা।

‘বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছে।’

‘এবং উপভোগ করছি না। মেজাজ খারাপের আরো কারণ ঘটেছে, লিলি। দেশের ওরা আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছে। কেন আমি কোনো জাছু দেখতে পারছি না সরাসরি আমার মুখ থেকে শুনতে চায় ওরা।’

‘তোমাকে ওরা ডেকে পাঠিয়েছে, রবিন?’ লিলির চোখে পলক নেই।

‘তারচেয়েও খারাপ,’ বললো রানা। ‘ওদের উদ্দেশ্য আমি টের পেয়ে গেছি। প্ল্যান বদলাচ্ছে ওরা।’

‘কি রকম?’ ভুরু কুঁচকে উঠলো লিলির।

‘ওরা চাইছে এখন থেকে কে. জি. বি. রেসিডেন্ট আমার কাজ তদারক করবে। নির্দেশ দিয়েছে, আমি যেন তাকে ফোন করি।’

‘নির্দেশ যদি দিয়ে থাকে...।’

‘হ্যাঁ, আমাকে সেটা মানতেই হবে। কিন্তু আমি যদি কোনো নির্দেশ না পাই?’

‘মানে?’

‘কাল আবহাওয়া ভালো ছিলো না, ভালো করে শুনতেই পাইনি খবর,’ বললো রানা। ‘রিসিভারটাকে হয়তো মেরামত করতে পাঠাতে হবে।’

বিছানার ওপর উঠে বসলো লিলি। রানার একটা হাত ধরে টানলো। ‘কিন্তু রবিন, মেসেজটা বারবার রিপিট করবে ওরা!’

‘কাল হয়তো আমার রিসিভার ভালো থাকবে। আজ আমি ব্যস্ত। ম্যানিয়াকটা এরপর কি করবে আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। প্যাটার্ন একটা না থেকেই পারে না।’

‘যা যা জানো সব লিখে ফেলছো না কেন?’ রানাকে টেনে বিছানার ওপর নিজের পাশে বসালো লিলি। ‘গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য একটা কাগজে সাজাও তো দেখি। বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন কলামে সাজিয়ে দেখো কোথাও কোনো মিল পাওয়া যায় কিনা।’

লিলির ওপর ঝুঁকে তাকে চুমো খেলো রানা। ‘নয়বার চেষ্টা করেছি, লিলি।’

‘তবু এসো না, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি,’ অনুরোধ করলো লিলি। ‘চেষ্টা করার দায়ে কেউ আমাদের ফাঁসিতে লটকাবে না।’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো রানা। ওর নাকে নাক ঘষে আদর করলো লিলি, বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দেরাজ থেকে বের করে আনলো কাগজ আর কলম।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুলো ওরা, পাশাপাশি। প্রথমে রানা ডীপ-

কাভার এজেন্টদের আমেরিকান নামগুলো লিখলো কাগজে । এই টেলি-বোমাগুলোকে ইতিমধ্যে ফাটিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি ।

কোনো প্যাটার্ন চোখে পড়লো না ।

আরেকটা তালিকা তৈরি করলো রানা, শুধু নামের শেষ অংশ দিয়ে । তিন নম্বর তালিকায় থাকলো নামগুলোর শুধু প্রথম অংশ । চার নম্বর তালিকায় নামের দুই অংশই থাকলো, কিন্তু শেষ অংশ প্রথমে আর প্রথম অংশ শেষে । ত্রিশ মিনিট ধরে তালিকাগুলো নাড়াচাড়া করে ফাঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লো একটা । ‘এবার ওদের আসল নামগুলো সাজানো যাক ।’

নতুন আরেকটা তালিকা তৈরি হলো । এক, দুই করে আটটা নাম লিখলো রানা । একটার নিচে আরেকটা । পাঁচ মিনিট পর বললো, ‘চার বার চেক করলাম, কোনো অর্থ বেরুচ্ছে না ।’

‘কিন্তু তুমি বলছো প্যাটার্ন একটা না থেকেই পারে না । তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি ।’ রানাকে উৎসাহ দিতে চাইছে লিলি । ‘আরো চেষ্টা করো ।’

‘তুমি কিন্তু সত্যি আমার লক্ষ্মী বউ ! বেশ, এবার তাহলে রাজ্য-গুলোর নাম লিখি ।’

কলোরোডা ।

মেইন

উইসকনসিন্

ক্যানসাস

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া

নিউ ইয়র্ক

ফ্লোরিডা

ক্যালিফোর্নিয়া

‘কিছু দেখতে পাচ্ছে? জিজ্ঞেস করলো রানা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ তালিকাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর মাথা নাড়লো লিলি। ‘না। আর কি বাকি থাকলো?’

‘তুমিই বলো।’

‘প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম?’

‘আগে চেষ্টা করেছি...।’

‘আগের কথা বাদ দাও,’ বাধা দিলো লিলি। ‘সব নতুন করে পরীক্ষা করবো আমরা।’

‘বেশ।’

আরেকটা তালিকা তৈরি হলো। এতে সময় অনেক বেশি লাগলো। লিখতে লিখতে দু’বার থামলো রানা, সামরিক স্থাপনার নামগুলো মনে করতে সময় নিলো। শেষ পর্যন্ত তৈরি হলো তালিকাটা। ‘কই, কিছুই তো হচ্ছে না!’ গভীর হয়ে উঠলো ও। সবগুলো কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে অ্যাশট্রেতে ফেলে আগুন ধরালো। ‘টয়লেটে যাচ্ছি।’

‘রবিন...।’

‘ওখানে আমার বুদ্ধি খোলে।’

‘সত্যি?’

মৃদু হেসে টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো রানা।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুলো লিলি, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। টয়লেট থেকে পানির আওয়াজ আসছে। একটু পর কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এলো রানা, ক’দিন আগে লিলিই ওকে কিনে দিয়েছে ওটা।

আবার উপুড় হলো লিলি, বিছানা থেকে প্যাড আর কলম তুলে নিলো ।

‘কি করছো ?’

‘পরের তালিকাটা আমি লিখবো,’ বললো লিলি । ‘আর কি বাকি আছে বলো ।’

‘তুমি যেন একটু রহস্যময় আচরণ করছো,’ বললো রানা । ‘আসলে কি চাও বলো তো ?’

হেসে ফেললো লিলি । ‘কি আবার চাইবো ! বন্ধ একটা ঘরে দু’জন মানুষ কি চাইতে পারে ?’

‘ঢং ঢং ঢং ঢং !’

‘তারমানে ?’

বিছানায় বসলো রানা । ‘তারমানে, এক ঘণ্টা ছুটি । এই এক ঘণ্টা কোনো কাজ নয় । শুধুই অকাজে ব্যস্ত থাকবো আমরা ।’ বিছানার আরেক কিনারার দিকে লিলি সরে যাচ্ছে দেখে থপ্প করে তাকে ধরে ফেললো রানা । গুরু হলো ধস্তাধস্তি, টানা-হ্যাঁচড়া ।

ঠিক এক ঘণ্টা পর আবার কাজে হাত দিলো ওরা ।

‘আসল নাম আর ছদ্মনাম লেখা হয়ে গেছে । বাকি থাকলো কি ?’

‘ফোন নম্বর ?’ ভিজ্জেস করলো রানা ।

‘বলে যাও ।’

ফোন নম্বরগুলো লেখা হলো । লাভ হলো না কোনো । এমনকি প্রতি সেট নম্বর এদিক ওদিক করে সাজিয়েও কোনো ফায়দা হলো না ।

‘আর কি, রবিন ?’

‘তুমি দেখছি একটা ফ্যানাটিক । এক সময় স্কুল মাস্টারনী ছিলে নাকি ?’

‘ব্যক্তিগত ব্যাপার । তোমার কাজ আরেকটা তালিকা তৈরি করা । এরপর কি বলো ।’

‘মুখরা রমণী, দজ্জাল স্ত্রী... ।’

‘টয়লেটে তাহলে শুধু শুধু গিয়েছিলে ? আমাকে বলা হয়েছে তুমি নাকি সেরাদের অন্যতম । মাথায় শুধুই বুদ্ধি আর আইডিয়া গিজ গিজ করছে । কিছু বের করো, তা না হলে যে মান-সম্মান কিছু থাকে না !’

‘খোঁচা দিচ্ছে । নাম, রাজ্য, স্থাপনা, ফোন নম্বর...এবার তা-হলে শহরগুলোর নাম লেখো । যে শহরে স্থাপনাগুলো আছে ।’

‘বলে যাও ।’ রানা বলতে শুরু করলো, লিলি লিখে নিচ্ছে ।

ডেনভার

আগাস্টা

লাক হু ক্যামবিউ

চ্যানিউট

হাষ্টিংটন

ইথাকা

মিয়ামি

সান ডিয়াগো

‘তুমি একবার পড়ো তো,’ নির্দেশ দিলো রানা । হঠাৎ নিঃশব্দে হাসতে শুরু করলো ও ।

নির্দেশ পালন করলো লিলি ।

মাথা ঝাঁকালো রানা। ‘আমি একটা গাধা,’ প্রায় চিৎকার করে ঘোষণা করলো ও। ‘বেগম সা’ব, ব্যাটাকে বোধহয় পেয়েছি! মানে, পাটার্নটা পাওয়া গেছে, বুঝলে!’

তালিকার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললো লিলি, ‘কি বলছো!’

‘মস্কো থেকে বলা হয়েছিল, ওরা তার নাম ছনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা ঘটছে! মাই গড! ও মাই গড!’

‘রবিন!’

‘দেখতে পাচ্ছে না? ম্যানিয়াকটা নিজের নাম লিখছে! ইউ-নাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার ওপর নিজের নাম সহী করছে ডালচিমস্কি!’

‘রবিন!’ চোখ বিস্ফারিত করে একবার তালিকা, একবার রানার দিকে তাকালো লিলি।

‘ডেনভার—ডি। অগাস্টা—এ। লাক ছ ফ্র্যামবিউ—এল। চ্যানিউট—সি। বারে শালা, বাহু! কমরেড ডালচিমস্কি, তুমি ফাঁস হয়ে গেছো!’

আবার তালিকার দিকে তাকালো লিলি। ‘কিন্তু আটটা শব্দে শুধু ডালচিমস পড়া যাচ্ছে, রবিন। ডি, এ, এল, সি, এইচ, আই, এম, এবং এস।’

‘বাকি থাকলো কে এবং আই,’ ব্যাখ্যা করলো রানা। ‘খাতায় একটাই মাত্র কে আছে, সেখানেই এরপর আঘাত হানবে ডালচিমস্কি। সে ধরা পড়ে গেছে। চলো যাই চলো।’

# নয়

---

বিকেল সাড়ে চারটেয় ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে নামলো ওরা, টার্মিনাল ভবনে এসে ফোন করলো রানা, তারপর আবার পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে একটা কনভেয়ার প্লেনে চড়লো—কালামাজু, মিশিগানে পৌঁছে দেবে ওদের।

ছিয়াশি হাজার লোকের বাস কালামাজু-তে। চারটে ব্যাংক আছে।

ছিয়াশি হাজারের একজন হলো জন ফিদারহফ, একটা কেমিক্যাল সাপ্লাই ফার্মের মালিক। এলাকার কোড নম্বর ছয়শো ষোলো, কোম্পানীর ফোন নম্বর ৩২৫-৯৯৮৯। এসব তথ্য জানা আছে রানার, ডীপ-কাভার এজেন্টের মিশনটা কি তাও অজানা নয়। কিন্তু জানে না লোকটার সাথে কিভাবে আলাপ করবে ও। নামকরা এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে যদি বলা হয়, আপনি একটা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের স্পাই, একজন অন্তর্ঘাতক, ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবেন তিনি? বলার পর কিভাবে প্রমাণ করবে রানা যে সে উন্মাদ নয়? জন ফিদার তার কথা বিশ্বাস করবে না। হয়তো পুলিশ ডাকবে সে।



জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো রানা, ডেট্রয়েট এয়ারফিল্ড থেকে আকাশে উঠছে প্লেন। একটা উপায় অবশ্য আছে, কিন্তু সেটা খুব বিপজ্জনক। লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কোড মেসেজটা উচ্চারণ করতে পারে ও। সাথে সাথে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে আসল লোকটা, জন ফিদারহফ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তাতেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। লোকটা নিজেকে কে. জি. বি.-র ডীপ-এজেন্ট হিসেবে চিনতে পারার সাথে সাথে সে তার মিশন সফল করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। বহু বছর আগে বহু টাকা খরচ করে এই ব্যাকুলতার বীজ তার মনের ভেতর বপন করে দেয়া হয়েছে। কোড সংকেতটা উচ্চারণ করার পর রানা যদি তাকে বলে, আগের সেই প্ল্যান বাতিল হয়ে গেছে, আমেরিকার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধেনি, মিশনের কথা ভুলে যান—কি প্রতিক্রিয়া হবে তার? সে কি রানার কথা বিশ্বাস করবে?

তাকে সিনিয়র কে. জি. বি. কর্মকর্তাদের দোহাই দেবে রানা, যারা টেলি-বম প্রজেক্ট চালু করেছিলেন। রুশ ভাষায় কথা বলবে রানা। তাতেও যদি কাজ না হয়, জোর খাটাবে ও। অচল, অকেজো করে দেবে তাকে। দরকার হলে—হ্যাঁ, এমনকি লোকটাকে মেরে ফেলবে রানা।

তিক্ত মেজাজ নিয়ে এসব কথা ভাবছে ও, লাউডস্পীকারে পাইলটের গলা শোনা গেল। ছ'টা দশ বাজে। কালামাজু-তে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে প্লেন।

‘ঠিক জানো তো লোকটাকে পাওয়া যাবে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করলো

লিলি ।

‘জানি,’ বললো রানা । রেন্ট-এ-কার কোম্পানীর অফিসে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, একটা মেয়ে কাগজ-পত্র ঠিকঠাক করছে ।

হাতঘড়ি দেখলো লিলি । ‘শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছো কেন, তোমার দেরি হয়ে যাবে না ?’

‘দেরি হতে পারে বুঝেই তো ডেট্রয়েট থেকে ফোন করলাম তাকে,’ বললো রানা । ‘এক লাখ সত্তর হাজার ডলারের অর্ডার দেবো বলেছি, সব কাজ ফেলে অপেক্ষা করবে । দেখা করার কথা পৌনে সাতটায় ।’

‘ছ’টা বিশ বাজে, রবিন ।’

লিলি ঠিকই বলছে, রানার আর দেরি করা উচিত নয় । বরং সময়ের আগে পৌঁছুতে পারলে ভালো হয় । ‘ঠিক আছে, গাড়ি যখন ছুটো, আমি আগে রওনা হয়ে যাই ।’ লিলিকে ঠিকানাটা জানিয়ে দিলো রানা, বলে দিলো কোথায় দেখা হবে ছ’জনের । বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাতে চড়ে বসলো ও ।

দক্ষ ড্রাইভার, চেহারায় চালাক-চতুর ভাব । এলাকার সমস্ত রাস্তা খুব ভালো করে চেনে । একটু বেশি কথা বলে, কিন্তু রানার কাছ থেকে তেমন উৎসাহ না পেয়ে বেশি কথা বললো না । সাদা চুনকাম করা অফিস আর ওয়্যারহাউস এলাকা পেরিয়ে এলো ট্যাক্সি, ড্রাইভারকে থামতে বললো রানা । ভাড়া নিয়ে, ‘হ্যাভ এ গুড ডে,’ বলে চলে গেল লোকটা ।

রাস্তার ধারেই গেট, গাড়ি-বারান্দায় গ্রে রঙের একটা পিণ্টো কার দাঁড়িয়ে রয়েছে । কে জানে জন ফিদরহফ লোকটা কেমন ।

বিখ্যাত একটা ফার্মের মালিক, আরো দামী গাড়ি ব্যবহার করা উচিত। মিসেস ফিদারহফ হয়তো মাসিডিজ ব্যবহার করে। কিংবা পিন্টোটা হয়তো চাকর-বাকররা বাজার-সওদা করার জন্যে ব্যবহার করে।

লোকটা বিবাহিত কিনা জানা নেই রানার। বিবাহিত হলে বোধহয় ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু বেচারী জানে না, সবই তাসের ঘর !

ঠেলা দিতেই খুলে গেল গেট। গেটের পাশেই আউটার অফিস। ভেতরে ঢুকে এক মহিলার সামনে দাঁড়ালো ও। সামনে ডেস্ক নিয়ে বসে আছে, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ, হাতের তালুতে ছোটো একটা আয়না নিয়ে ঠোঁটে আরেকবার লিপস্টিকের প্রলেপ লাগাচ্ছে। মোটা আকৃতির চুলের স্টাইল আজকাল অচল হয়ে গেছে, তবে বয়স লুকাতে কোণলটার জুড়ি নেই। চোখ তুলে রানাকে দেখলো সে। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সাথে সাথে। ‘মিঃ বিউমন্ট ?’ এই নামেই ডেট্রয়ট থেকে ফোন করেছিল রানা।

‘হ্যাঁ। মিঃ ফিদারহফ আছেন ?’

‘অত্যন্ত দুঃখিত। জরুরী একটা কাজে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছে।’

বিপদ সংকেত বেজে উঠলো রানার মনে। ‘অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও চলে গেলেন ? এখুনি ফিরবেন তিনি ?’

অশ্বাস দিয়ে হাসতে চেষ্টা করলো মহিলা, কিন্তু পারলো না। ‘জানি—জানি, মিঃ বিউমন্ট। কিন্তু জরুরী একটা ব্যাপারে...।’

রানার মনে সাইরেন বাজতে শুরু করলো। ‘কোথায় গেছেন তিনি ? আপনাকে বলে গেছেন ? কেউ ফোন করেছিল ?’

ফার্ম এবং মালিকের সুনাম রক্ষার চেষ্টা করছে পার্সোনাল সেক্রেটারী। ‘আপনি অস্থির হবেন না, প্লিজ ! দাঁড়িয়ে কেন, বসুন না...।’

রানার ইচ্ছে হলো কষে একটা চড় লাগায়। সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেয় না কেন। ‘আমার কথার জবাব দিন। কেউ ফোন করেছিল ? আপনার বসের আমি একটা বিপদ আশঙ্কা করছি। তাড়াতাড়ি বলুন। ফোন এসেছিল ?’

‘জী...জী, হ্যাঁ। ফোন পেয়েই...।’

‘কখন ? কতক্ষণ আগে ?’ রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো রানা।

‘দশ...পনেরো মিনিট আগে। আপনি এতো উত্তেজিত কেন বলুন তো ? কিসের বিপদ ?’

‘কে ফোন ধরেছিল ? লোকটার কথায় কি বিদেশী টান ছিলো ?’

‘জী, ছিলো !’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মহিলা। ‘কি ব্যাপার বলুন তো ?’

‘ফোন পেয়েই মিঃ ফিদারহফ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন, তাই না ? যেন ভয়ানক জরুরী কিছু একটা ঘটে গেছে ?’

মাথা ঝাঁকালো মহিলা। ‘কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলবেন না আমাকে ?’

‘প্র্যাকটিক্যাল জোক, এ ব্যাড প্র্যাকটিক্যাল জোক—আই হোপ,’ মিথ্যে কথা বললো রানা। ‘যে লোকটা ফোন করেছিল সে একটু পাগলাটে। তাড়াতাড়ি তার ওখানে গিয়ে তাকে সামলাই, তা না হলে কি করে বসে কে জানে। ওটা তো আপনাদের গাড়ি, তাই না, পিন্টোটা ?’

‘হ্যাঁ। মিঃ ফিদারহফ সবুজ পন্টিয়াক চালান। বলেন তো আপ-  
শান্তিদূত-২

নাকে আমি লিফট দিতে পারি। তিন মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যাবো আমিও।’

‘আমি বরং ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডাকি।’

ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকলো পার্সোনাল সেক্রেটারী। সরাসরি অপারেটরকে ডায়াল করলো রানা, পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ দেয়ার অনুরোধ করলো।

‘পুলিশ হেডকোয়ার্টার।’

‘ভাববেন না কৌতুক করছি। এটা একটা ইমার্জেন্সী কল। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। পনেরো মিনিট হলো একজন ম্যানিয়াক ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাব-এর দিকে রওনা হয়েছে। সবুজ একটা পন্টিয়াক চালাচ্ছে সে। তার সাথে বিস্ফোরক আছে। সে সশস্ত্র। আমি আবার বলছি—ভাববেন না কৌতুক করছি...।’

‘আপনি কে?’

‘ক্যাপটেন রুথম্যান, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স। লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। দেখা পেল সাবধানে এগোতে হবে। হোমিসাইডাল টাইপ, সামনে যাকে পাবে তাকেই খুন করতে চাইবে। ওয়াটসন ইলেকট্রনিক ল্যাবে যাচ্ছে স্যাবোটাজ করার জন্তে।’

‘ঈশ্বর-পুত্র যীশু, এসব কি।’

‘আমিও ওদিকে রওনা হচ্ছি,’ বললো রানা। ‘আপনারা আপনাদের রেডিও কারণ্ডুলোকে সতর্ক করে দিন। ল্যাবের সিকিউরিটি অফিসারদের জানান। আমার পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগবে।’ রানা দেখলো টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছে মহিলা।

‘লোকটা কমিউনিস্ট নাকি?’

‘হ্যাঁ,’ বলেই যোগাযোগ কেটে দিলো রানা। মহিলাকে বললো,

‘ট্যাক্সি আসছে, আমি বরং বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।’ ছ’জনে ওরা এক সাথেই অফিস থেকে বেরুলো। পিক্টো নিয়ে চলে গেল মহিলা।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলো রানা। ইংরেজী, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ, এবং এমনকি কিছু কিছু আরবীতেও গাল পড়তে লাগলো—ভাগ্যকে। লাভের মধ্যে সময়টা কাটলো। ছ’মিনিটের মাথায় ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে পৌঁছুলো লিলি।

‘সব ঠিক আছে?’ জানতে চাইলো সে।

‘কিছুই ঠিক নেই! আমি পৌঁছুবার পনের মিনিট আগে ফোন করেছিল ডালচিমস্কি। ফিদারহফের পিছনে আমি পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছি।’

পাশের সিটে সরে গেল লিলি, হুইলের পিছনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিলো রানা।

‘পুলিশ? পুলিশ কি করবে, রবিন?’

‘আটকাবে। আহত করবে। গুলি করে মারবে। বলেছি, লোকটা হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক। সাথে অস্ত্র আর বিস্ফোরক আছে। কে জানে বিশ্বাস করেছে কিনা।’

কালামাজু পুলিশ হেডকোয়ার্টারও ব্যতিক্রম নয়, এখানেও মাঝে মধ্যে ভূয়া ফোন কল আসে। কিন্তু রানার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিলো, ডেস্ক ক্লার্ক ব্যাপারটাকে গুরুত্বের সাথে না নিয়ে পারেনি। সবুজ পন্টিয়াকে এক উন্মাদ আছে, এই জরুরী খবর সব ক’টা রেডিও কারকে জানিয়ে দেয়া হলো। চারটে কার নির্দেশ পেলো,

পলিয়ারাকে ওভারটেক করতে হবে। সম্ভবত হাইওয়ে ধরে ওয়াট-সন ইলেকট্রনিক ল্যাবের দিকে দিচ্ছে সে। সরাসরি ল্যাবের দিকে যেতে হলে ওটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। ল্যাবের সিকিউরিটি অফিসারকেও বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হলো।

ডেঞ্জার অ্যালার্ম সিস্টেমের বোতামে চাপ দিয়ে স্পীকার তুলে নিলো। সিকিউরিটি অফিসার, অনুপ্রবেশ ঠেকাবার জন্তে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলো আর্টটা গার্ড পোস্টকে।

মেইন গেটের সামনে ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহার করা হলো দশ টনী এক ট্রাক, আড়াআড়িভাবে পথ আগলে রাখলো সেটা। গার্ডরা তৈরি হয়ে পজিশন নিয়েছে, পাঁচ-ছয়টা অটোমেটিক রাইফেলের ম্যাগাজিন ক্লিক ক্লিক শব্দ করলো। দূরে শোনা গেল সাই-রেনের আওয়াজ। সশস্ত্র প্রহরীরা আড়াল থেকে দেখলো, সবুজ একটা বিন্দুকে ছুটো নীল বিন্দু ধাওয়া করে আসছে।

প্রতিরক্ষা স্থাপনার দিকে তীর বেগে ছুটে আসছে পলিয়ার! পিছু পিছু আশি মাইল বেগে আসছে এক জোড়া পুলিশ কার।

‘ওপেন ফায়ার!’ আধমিনিট পর বজ্রকণ্ঠের নির্দেশ বেরিয়ে এলো স্পীকার থেকে।

লাল আগুনে রেখা তৈরি করে ছুটে গেল তপ্ত সীসাগুলো, পাঁচটা এম-ফোরটিন একসাথে গর্জে উঠেছে। চোখের পলকে অদৃশ্য হলো উইণ্ডশীল্ড। ক্ষতবিক্ষত হলো এঞ্জিন। অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করে চলে যাওয়া মিঃ ফিদারহফের গায়ে বত্রিশটা বুলেট বিদ্ধ হলো। তারপর প্রতি মুহূর্তে ঘটতে শুরু করলো রোম-হর্ষক ঘটনা। গ্যাসোলিন আর তেল বেরিয়ে এলো ফিনকি দিয়ে, চোখ ধাঁধানো গোলাপি আগুন আলিঙ্গন করলো গাড়টাকে।

মৃত ড্রাইভারকে নিয়ে তারপরও এগিয়ে আসতে লাগলো পন্টিয়াক । ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের বাধা পেয়ে তুমুল গতি মন্দ্র হয়েছে মাত্র, সামনে এগোবার ঝোঁকটা রয়ে গেছে । আড়াআড়িভাবে রাখা দশ টনী ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেলো সেটা ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরো চারবার উথলে উঠলো আগুন । ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরণের পরপরই আরেকটা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল, এক নিমেষে ছ'ভাগে ভাগ হয়ে গেল পন্টিয়াক । খানিক আগে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলো যে লোকটা, পোড়া কয়লার টুকরো হয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মতো রাস্তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো তার ধ্বংসাবশেষ । দেহটা সনাক্ত করার আর কোনো উপায়ই থাকলো না, দাঁত পরীক্ষা করে যদি বা চেনা যায় অন্তত তিন দিন সময় লাগবে । ছ'টুকরো গাড়ি আরো ছ'বার বিস্ফোরিত হলো । আওয়াজ শুনেই বলে দেয়া যায়, ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ।

আয়োজনটা ডালচিমস্কির । কাছেপিঠে উপস্থিত থাকলে দৃশ্যটা উপভোগ করতো সে, রোমাঞ্চিত হতো । কিন্তু এই মুহূর্তে চারশো মাইল দূরে রয়েছে সে । রানা রয়েছে এগারো মাইল দূরে, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে পশ্চিমে, শিকাগোর দিকে যাচ্ছে ও । জানে, আগন্তুকদের থামানো হবে, জেরা করা হবে, সন্দেহ হলে আটকও করা হবে । কাজেই কালামাজু থেকে আশি মাইল না এগিয়ে কোথাও থামলো না ও । ধারণা করলো, সবগুলো রোডব্লকই ওর পিছনে ।

রাস্তার ধারের একটা কফি হাউস থেকে কফি খেয়ে আবার গাড়ি ছাড়লো রানা । ফাঁকা হাইওয়েতে উঠে এসে ব্যাটারি চালিত শর্ট-রেঞ্জ রিসিভারটা অন করলো ।



সেই একই মেসেজ । ভাষাটা শুধু আগের চেয়ে কঠোর ।  
ছ'ঘণ্টার মধ্যে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করতে  
হবে ওকে ।

## দশ

---

পাকিং লটে গাড়ি, গাড়িতে লিলিকে রেখে একা একটা বারে  
টুকলো রানা । বুধবার রাত আটটা আটত্রিশ মিনিটে ফোন করতে  
হবে কে. জি. বি. রেসিডেন্টকে । আর ছ'মিনিট পর ।

বারে লোকজন প্রচুর, তবে ভাগ্য ভালো যে ফোন বুদে কেউ  
নেই । কারো দিকে সরাসরি না তাকিয়ে বুদে টুকলো রানা, দরজা-  
টা বন্ধ করলো । আটটা সাঁইত্রিশে ডায়াল করতে শুরু করলো,  
ধীরে ধীরে, সাবধানে । শেষ নম্বরটা ঘোরাবার সাথে সাথে ক্লিক  
করে একটা আওয়াজ হলো, হাত ঘড়িতে বাজলো কাঁটায় কাঁটায়  
আটটা আটত্রিশ । 'রুম নম্বর পাঁচশো উনিশ,' রানা যেন কোনো  
হোটেল অপারেটরের সাথে কথা বলছে ।

'তারমানে মিঃ লিপটনকে চাইছেন আপনি,' কর্কশ একটা কণ্ঠ-  
স্বর, ক্ষীণ বিদেশী সুর চাপা থাকলো না ।

‘মিঃ লিপটন ?’

‘লাইন এনগেজড ।’

তারমানে লাইন নিরাপদ, সাংকেতিক ভাষার সাহায্যে পর-  
স্পরকে চিনতে পেরেছে ওরা ।

‘এদিকের সব খবর ভালো,’ বললো রানা ।

‘বেচাকেনায় মন্দা যাচ্ছে, খবর ভালো হয় কি করে ?’

রানা বললো, ‘দু’দিন আগে হাউসটনে বড় একটা কনসাইনমেন্ট  
বিক্রি হতে যাচ্ছিলো । দশ মিনিট দেরি হওয়াতে ব্যাপারটা ভণ্ডুল  
হয়ে যায় । তবে হতাশ হবার কিছু নেই, এখনো প্রচুর সম্ভাবনা  
আছে সব মাল বিক্রি করা যাবে ।’

‘কমপিটিটরের খবর কি ?’

‘সাংঘাতিক ব্যস্ত । আমার ধারণা ঘণ্টা দুই আগে কালামাজু-তে  
কি ঘটেছে আপনি জানেন ।’

‘এখনো জানি না ।’

‘জানবেন । বোকার মতো যেখানে সেখানে ফোন করছে নিক,  
তার সাথে দেখা করে কারণ জিজ্ঞেস করবো আমি ।’

‘কোথায় ?’

‘কাল বাদে পরশু যেখানে যাচ্ছে সে । ওখানে তার সাথে আমার  
দেখা হবে,’ বললো রানা ।

‘তা কি সম্ভব ? কিভাবে তা সম্ভব ? জেনারেল ম্যানেজার কিন্তু  
পরিস্থিতি নিয়ে ভারি উদ্বেগের মধ্যে আছেন ।’

‘জেনারেল ম্যানেজারকে বলুন, নিক তার নাম সই করছে ।  
ইসেব করে বের করেছি, এরপর সে ইণ্ডিয়ান গর্জে যাবে ।’

‘অসম্ভব । ইতিমধ্যে ওখানে চেষ্টা করা হয়ে গেছে তার । বর্ত-

মানে ওখানে কেউ নেই, গিয়ে লাভ কি ? তাছাড়া, তাকে যেতে হবে কেন, যে-কোনো জায়গা থেকে ফোন করলেই তো পারে সে ।’

‘এক্ষেত্রে কোনো কাজ হবে না ফোন করে,’ বললো রানা ।  
‘অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে লোকটার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কথা বলতে হবে তাকে । এ-কথা কেন বলছি পরে আপনাকে ব্যাখ্যা করবো ।’ কে. জি. বি. রেসিডেন্টের ব্রেন যে বিদ্যুৎবেগে কাজ করছে, আন্দাজ করতে পারলো রানা ।

‘তাহলে তো ভালোই । আপনার সাহায্যের জন্যে এদিক থেকে আমরা কিছু করতে পারি ?’

‘আপনি শুধু অন্যান্য গেলসমেনদের মার্কেট থেকে ডেকে নিন ।  
আমি চাই না ওদের ভয়ে কমপিটিটর পালিয়ে যাক ।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে । আপনি এখন কোথায় ?’

যোগাযোগ কেটে দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে এলো রানা, গাড়িতে উঠে লিলিকে বললো, ‘হারামজাদা জানতে চাইলো আমরা কোথায় ।’ এঞ্জিন স্টার্ট দিলো ও ।

‘কার কথা বলছো ।’

‘তোমার বস ।’

‘ও । তা কি বললে তুমি ?’

স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে পর পর দুটো গাড়িকে ওভারটেক করলো রানা, জবাব দিলো না ।

আবার প্রশ্ন করলো লিলি, ‘আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন ?’

‘না ।’

‘কি কি কথা হলো ?’

কাঁধ ঝাঁকালো রানা । ‘ভয় হচ্ছে, হয়তো বেশি কথা বলে

ফেলেছি, লিলি। আমি যা বুঝেছি, ওরাও তা বুঝে নেবে। তালিকায় আর একটা মাত্র ‘আই’ আছে, সইটা সম্পূর্ণ করার জন্যে ডালচিমস্কির দরকার ওটা। আয়রন রিভার না হয়ে যায় না।’

‘বসকে নিশ্চয়ই তথ্যটা দাওনি তুমি?’

‘না, এবং সে আমাকে জিজ্ঞেসও করেনি। সেজন্যেই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। অবশ্য, জিজ্ঞেস করার আগেই যোগাযোগ কেটে দেই আমি...উঁহু’, ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না।’

‘মন খারাপ করো না তো। ফোন না করেও তো উপায় ছিলো না।’

হেডলাইটটা বারবার জ্বাললো আর নেভালো রানা, উন্টোদিক থেকে ছুটে আসা একটা গাড়ির ড্রাইভারকে সংকেত দিচ্ছে ও—হেডলাইট ডিম করতে বলছে।

‘ওরা আমাকে নিয়ে খেলছে, লিলি,’ বললো রানা। ‘তা না হলে রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে বলবে কেন? রেসিডেন্টই বা জানতে চাইবে কেন আমরা কোথায়?’

‘রবিন—।’

‘ওরা যদি নাক গলায়, তার পরিণতি ভালো হবে না,’ গম্ভীর সুরে বললো রানা। ‘ডালচিমস্কিকে ধরার এটাই আমার শেষ সুযোগ। এবার যদি ব্যর্থ হই, ভাবতে পারো কি অবস্থায় পড়বো? এরপর সে কোথায় আঘাত করবে আমরা জানি না। পেটাগনে হতে পারে, হোয়াইট হাউসে হতে পারে, হতে পারে এস. এ. সি. হেডকোয়ার্টারে, কিংবা নরফোকের আটলান্টিক ফ্লীট কমান্ড পোস্টে হতে পারে—যুক্তরাষ্ট্রের নয় ডজন নার্স পয়েন্টের যে-কোনো একটায় হতে পারে। আমরা জানি কি ভাবছে সে? যদি ভেবে

থাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ জায়গায় ফোন করবে ? কি মনে  
করো, আমেরিকানরা হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে ?

‘এ-সব কথা ওরাও বুঝবে, রবিন। চিন্তা করো না। আমি  
বলছি, ওরা নাক গলাবে না, তুমি দেখো।’

সেই রাতেই দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে রাউল  
ক্ল্যারমন্ট আয়রন রিভার, ওয়াইওমিঙ-এ পৌঁছুবার নির্দেশ পেলো।

গোটা ওয়াইওমিঙ স্টেটে মাত্র সাড়ে তিন লাখ লোকের বাস।  
দেখার মতো অনেক জিনিসই রয়েছে এখানে, তার মধ্যে একটা  
হলো রকি মাউন্টেন। রাজ্যের পশ্চিম অংশের অর্ধেক পুরোপুরি  
পার্বত্য এলাকা বলা চলে। টেটন্স আর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল  
পার্কও ট্যুরিস্টদের জন্যে বিরাট ছটো আকর্ষণ। তিনটে বড় নদীর  
উৎসও রয়েছে এখানে।

চার নম্বর এবং অপেক্ষাকৃত ছোটো নদীটার নাম আয়রন  
রিভার। ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ পানিবাহী নদীটার দুই তীরে প্রচুর খনিজ  
সম্পদ রয়েছে, তাই এই নামকরণ। শুধু মাছ ধরার জন্তে নয়, স্কি  
আর শিকারের জন্তেও প্রচুর লোক আসে এখানে। পর্যটকদের  
জন্তে সরকারী বেসরকারী অনেক লজ তৈরি করা হয়েছে, সারা  
বছরই লোকজন গিজগিজ করে এলাকাটায়। মাঝখানে কয়েক  
মাইলের ব্যবধানে অনেক র‍্যাকও আছে। আর আছে আয়রন  
রিভার শহর থেকে বিশ কি পঁচিশ মাইল দূরে অমূল্য কিছু গর্ত।  
এ-সব গর্ত কয়লা, তেল, লোহা বা জিপসামের উৎস নয়। ওগুলো  
আসলে সাইলো, ইউ. এস. এয়ারফোর্সের ইন্টারকন্টিনেন্টাল রকেট  
রাখার জন্তে আণ্ডারগ্রাউণ্ড মিসাইল ইন্সটলেশন। ওয়াইওমিঙে

আরো রয়েছে আই. সি. বি. এম. কমপ্লেক্স, অনেকেই সেগুলোর কথা জানে। কিন্তু একশো দুই নম্বর স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল উইং-এর আশিটা মিনিটমেন মারণাস্ত্রের কথা কারো জানার কথা নয়, ও-গুলোর মাথায় পারমাণবিক বোমা ফিট করা আছে।

জানার কথা নয়, কিন্তু রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর সিনিয়র কমান্ডাররা ঠিকই জানেন। আর সেজন্যই আয়রন রিভার সহ আশপাশের রকেট কমপ্লেক্স টেলি-বম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে রকেট বা আনবিক বোমাবাহী মিসাইলগুলোকে অকেজো করে দেয়ার দায়িত্ব কাকে দেয়া হবে সে সিদ্ধান্ত তাঁরা নননি, নিয়েছিলেন কে. জি. বি. কর্মকর্তারা। লেফটেন্যান্ট ইগর পদোভিচকে অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়া হয়, ট্রেনিং দিয়ে তাকেও একটা টেলি-বম বানানো হয়েছে।

ইগর পদোভিচ এঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নে ছিলো। ভালো আমেরিকান ইংরেজী শেখানো হয় তাকে। তবে স্কীয়ার হিসেবে আগে থেকেই খ্যাতি ছিলো তার। আয়রন রিভার এলাকায় নিজেকে সে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নেয়। উপত্যকার ছ'হাজার একশো আটজন লোকের সাথে ভারি সম্ভাব তার। আমেরিকান নাম আলবার্ট লুবার্ট, এক ডাকে চেনে সবাই। মাঝারি আকারের একটা হোটেলের মালিক সে, হোটেলটার নাম রেড ড্রাগন। একসাথে বসে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন লোক খেতে পারে, সাথেই একটা বার রয়েছে। শহরের এক ধারে সুন্দর একটা পরিবেশ, ট্যুরিস্টরা এখানে থাকার সুযোগ পেলে স্বস্তি বোধ করে। কুক লোকটা খুব রসিক, নাম অস্কার অটারম্যান, এক কালে এলাকার নামকরা বক্সার ছিলো। রেস্টোরায় কাজ করে ছ'জন ওয়েট্রেস - এলা আর লিল। এলার

বয়স হবে ছত্রিশ, আঠারো বছর বয়েসের এক ছোকরার সাথে খুব মাখামাখি তার, তবে সবাই জানে ওরা বিয়ে করবে না। লিল মেক্সিকান মেয়েদের মতো দেখতে, বয়স ওই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশই হবে। তার প্রেমিকের বয়স ষাট, বউ মারা গেলে লোকটা তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

রেড ড্রাগনের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে রয়েছে পুলিশ অফিসার, খনি শ্রমিক, র‍্যাঞ্চার, দোকান কর্মচারী আর সরকারী অফিসার। একশো দুই নম্বর উইং-এর কমিশনড বা নন কমিশনড অফিসাররাও আসে, তবে নিয়মিত নয়। অনেক বছর আগে অবশ্য এক মহিলা ক্যাপটেন নিয়মিত কিছুদিন আসা-যাওয়া করেছিল। এয়ার ফোর্স কমপ্লেক্সে ডেপুটি কমিউনিকেশন অফিসার ছিলো সে। আলবার্ট ছবার্টের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়, মেয়েটার দাঁতের পিছন দিক ছাড়া বাক সবই দেখা হয়ে গিয়েছিল ছবার্টের। কিন্তু সম্পর্কটা থেকে শুভ কোনো ফলাফল বেরিয়ে আসেনি। প্রণয় পরিণয় পর্যন্ত গড়াবে না বুঝতে পেরে নিজের চেষ্টায় ক্যালিফোর্নিয়ায় বদলি হয়ে যায় মেয়েটা। কেউ পরিষ্কারভাবে জানে না কেন তাকে বিয়ে করেনি ছবার্ট। মেয়েটা নিজেও বুঝতে পারেনি। ছবার্ট জানতো না, তার অবচেতন মনে একটা বাধা-নিষেধ রয়ে গেছে, কোনোভাবেই এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাবে না যার ফলে সিকিউরিটি চেকিঙের সাবজেক্ট হতে হয় তাকে। এয়ার ফোর্সের একজন অফিসারকে বিয়ে করতে চাইলেই তার অতীত ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হবে, তাই তার অবচেতন মন নাক গলিয়ে বসে।

এরপর আলবার্ট ছবার্টের জীবনে দ্বিতীয় আরেকটা মেয়ে আসে। বোস্টন থেকে স্থানীয় স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে মেয়েটা, নাম এপ্রিল

ওয়েনেসডে। উনিশ শো পাঁচাত্তর সালে বিয়ে হয় ওদের। স্বামীর মতোই দক্ষ স্বীয়ার সে, আউটডোর লাইফ পছন্দ করে, এবং পুরনো দিনের গানের ভক্ত। শুক্র আর শনিবার রাতে রেড ড্রাগনে গিটার বাজায় সে।

কিন্তু স্বামীর থাকলেও, এপ্রিল ছব্যাটের কোনো ট্রাইপড নেই।

বিয়ে বাধিকীতে স্বামীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া সাদা ঘোড়া নিয়ে প্রায় সারাটা দিন বাইরে বাইরে কাটায় এপ্রিল ছব্যাট, হোটেল ব্যবসা নিয়ে তার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। হোটেল-টার ওপর, দোতলায় সুসজ্জিত আপার্টমেন্টে থাকে তারা। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই।

গ্যাস স্টেশনটাকে আয়রন রিভার শহরের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়, সেখান থেকে রেড ড্রাগন মাত্র এক মাইলের পথ। রকি পর্বতমালার কয়েকটা নয়নভোলানো চূড়ার দিকে মুখ করে আছে হোটেলটা। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয় দেখার জন্যে পাহাড়ে টড়ে মিসেস ছব্যাট। নিরীহ দর্শন, শান্ত স্বভাবের স্বামীকে নিয়ে খুব সুখী জীবন তার। সচ্ছল আলবার্ট ছব্যাটও এপ্রিলের মতো হাসিখুশি বউ পেয়ে ভারি সন্তুষ্ট।

বিকেল পাঁচটা, আয়রন রিভারের পথে রয়েছে ওরা।

সব রকম বিপদ আর বিপত্তির জন্যে তৈরি হয়ে আছে রানা। ওর গম্ভীর চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব লিলির দৃষ্টি এড়ায়নি। এই মুহূর্তে লিলি অবশ্য তিন শো গজ পিছনে রয়েছে, আরেকটা গাড়িতে। সাবধানের মার নেই, তাই দুটো গাড়ি ভাড়া করেছে রানা। একটা অচল হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি আরেকটা যাতে নাগা-



লের মধ্যে থাকে। রানা জানে, ডালচিমস্কিকে ধরার এটাই ওর শেষ সুযোগ। আটচল্লিশ ঘণ্টায় একটা করে ফোন কল, উন্মাদটা যদি এখনো এই নিয়মে টেলি-বম ফাটায়, তাহলে পরবর্তী হিউম্যান বোমা ফাটার আগেই আয়রন রিভারে পৌঁছে যাবে ওরা। ডীপ-কাভার এজেন্ট আলবার্ট হুবার্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জানা আছে রানার।

রানার একটা প্ল্যান আছে, তীর বেগে গাড়ি ছুটিয়ে সেটার কথাই বারবার ভাবছে ও। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারী এলাকার ওপর দিয়ে সরু ফিতের মতো চলে গেছে রাস্তা দূর পাহাড়ের দিকে। উপত্যকায় এসে চূড়াগুলোকে আরো অনেক বড় দেখলো ওরা, রাস্তার পাশে এই প্রথম মাইলস্টোন দেখা গেল—আয়রন রিভার আর মাত্র এগারো মাইল সামনে। রাস্তার পাশে গাড়ি থামালো রানা, ওর পিছনে থামলো লিলি। গাড়ি থেকে নেমে রানাকে হেঁটে আসতে দেখে জানালার কাঁচ নামালো সে।

‘সব মনে আছে তোমার?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘আগে আমি পৌঁছুবো,’ বললো লিলি। ‘মোট্টেলে ঘর ভাড়া করবো। মনে থাকবে না কেন?’

‘ব্লু স্টার মোটেল,’ নামটা বললো রানা। ‘রেড ড্রাগন থেকে তিন শো গজ দূরে।’

‘জানি,’ বিরক্তি চেপে বললে লিলি। ‘তুমি ওদের ফোন করেছিলে, ওরা বলেছে মোট্টেলে খাবার পরিবেশন করা হয় না, তবে অতিথিরা রেড ড্রাগনে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। এই নিয়ে সাত বার আলোচনা হয়েছে।’

‘আট বার হলেও ক্ষতি নেই। ঘর ভাড়া করে ওদের বলবে,

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছুবো আমি ।’

‘তাও জানি । এক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখবে তুমি । পরে হয়তো কাজে লাগবে—ডিনারের পর রাতে, তাই না, মিঃ গর্ডন ? আর কিছু ?’

‘চোখ-কান খোলা রাখবে । অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখলে ওয়াকি-টকি অন করে আমার সাথে যোগাযোগ করবে । ওটার রেঞ্জ দুই থেকে তিন মাইল ।’

‘জানি, মিঃ গর্ডন ।’

মিসেস গর্ডনকে অবাক করে দিয়ে বুকলো রানা, জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে গাড়ির ভেতর চুমো খেলো লিলিকে । তারপর সিধে হয়ে ফিরে এলো নিজের ফোর্ডের কাছে, স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিলো গাড়ি ।

বিশ মিনিট পর ব্লু ঈগল মোটেলের ঢুকলো লিলি । একতলা একটা বাড়ি, অফিস সহ পনেরোটা কামরা । অফিসে একটা কাউন্টার আর খানকয়েক আর্মচেয়ার রয়েছে, ভেঙে মেশিন থেকে পাঁচ রকমের ঠাণ্ডা সোডা ওয়াটার পাওয়া যেতে পারে । কামরাগুলোর প্রতিটির আলাদা এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট আছে । ভাড়া নেয়ার পর নিজেদের কামরাটা দেখলো লিলি । জোড়া বিছানা, চেয়ার-টেবিল, ওয়ার্ডরোব, শাওয়ারসহ সংলগ্ন বাথরুম । আটটা বাজতে বিশ মিনিট বাকি থাকতে পৌঁছলো রানা ।

‘কোথায় ছিলে তুমি, রবিন ?’ রানার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো লিলি । ‘আমার হুশিচুতা হচ্ছিলো । ওয়াকি-টকিতে তোমার সাথে আমি পাঁচবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম... ।’

‘শহরটা এক চক্কর ঘুরে উপত্যকায় গিয়েছিলাম, ড্যাম দেখতে,’  
শান্তিদূত-২

বললো রানা । ‘রেঞ্জের বাইরে ছিলাম ।’ শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলো ও ।

‘ড্যাম ?’

‘ডানবার ড্যাম । ওটাই ডালচিমস্কির টার্গেট ।’

‘ও মাই গড !’

‘ড্যামটা যদি ভাঙা যায় গোটা উপত্যকা ডুবে যাবে ।’

‘রবিন !’

‘রকেট সাইলো, কয়েক শো ক্রু, কমাণ্ড পোস্ট, দু’হাজার সিভিলিয়ান—আমরাও বাদ পড়বো না । উনিশ মিনিটের ব্যাপার, লিলি । ড্যাম বিস্ফোরিত হবার উনিশ মিনিটের মধ্যে গোটা উপত্যকা দশ ফিট পানির তলায় তলিয়ে যাবে । চমৎকার একটা আইডিয়া, তাই না ?’

লিলির চোখে পলক নেই । অবিশ্বাসে মাথা নাড়লো সে ।

সিস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুলো রানা । লিলির হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে ঘষলো মুখে । ‘চলো খেতে যাই ।’

‘জায়গাটা খুঁজে পেয়েছো ?’

‘সম্ভবত । চলো যাই ।’

‘স্টেকটা খেয়ে দেখুন,’ পরামর্শ দিলো ওয়েট্রেস লিল ।

‘স্টেকটা বোধহয় তোমাদের স্পেশাল, মিস ?’ জিজ্ঞেস করলো রানা ।

‘সবাই আমাকে লিল বলে ।’

‘স্টেকটা বুঝি খুব ভালো, লিল ?’ সহাস্যে আবার জিজ্ঞেস করলো রানা ।

‘খেলে ভুলতে পারবেন না। এই রাজ্যের সবচেয়ে ভালো রিব-ও পরিবেশন করি আমরা। এই ছোটো জিনিস রান্না করার সময় মিঃ হুবার্ট নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন কিচেনে।’

‘মিঃ হুবার্ট?’

‘আমাদের মালিক,’ সমীহের সাথে বললো লিল। ‘সাংঘাতিক নিষ্ঠা ভদ্রলোকের। বুঝতে পারছেন না, তা না হলে একার চেষ্ঠায় এলাকার সেরা হোটেলের মালিক হলেন কিভাবে!’

ডিনারের আগে ছোটো ড্রিন্ক নিল ওরা। রান্নাটা সত্যি ভালো। আশপাশে যারা বসে আছে তারা সবাই শান্তশিষ্ট, ভদ্র, এবং ভোজনরসিক। সবাই সুবেশী, খাওয়ার ফাঁকে নিচু গলায় আলাপ করছে। এয়ারফোর্সের ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজন লোককে দেখলো রানা। লিলির সাথে আয়রন রিভার, উপত্যকা, মোটেল বা হোটেল, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পরিবেশ, আবহাওয়া, ইত্যাদি কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ করলো না ও। তবে অনেকেই লক্ষ্য করলো নিচু গলায় রানা যা বলছে, ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে লিলি। রানার আলাপের বিষয় হলো পোশাক। ওর ধারণা, ছ’-ধরনের পোশাক পরা উচিত মেয়েদের। যখন বাইরে বেরুবে তখন আপাদমস্তক ঢাকা থাকবে। আর যখন চার দেয়ালের ভেতর থাকবে তখন কিছুই ঢাকা থাকবে না।

এক সময় সুদর্শন, স্মার্ট এক লোককে লক্ষ্য করলো রানা। চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স, যে-বয়সে অনেক পুরুষই কিশোরী বা কম বয়েসী যুবতীদের প্রেমে পড়ার ঝোঁক সামলাতে পারে না। দ্বিতীয় ওয়েস্ট্রেসকে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে লোকটা।

‘মালিক,’ বিড়বিড় করে বললো রানা।

‘ওই তাহলে ছবার্ট ?’

‘হতেই হবে। আরেকটা ডিস্ক নেবে ?’

লিলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে রানা, ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো ছবার্ট। অর্ডার নেয়ার জন্যে নিজেই এগিয়ে এলো সে।  
‘বলুন কি দরকার ?’

‘আপনিই বুঝি মিঃ আলবার্ট ছবার্ট ?’

হাসতে লাগলো লোকটা। ‘সবাই আমাকে ড্রাগন বলে। আয়-রন রিভারে আমরা কেউ ফরমালিটির ধার ধারি না। বলুন কি দরকার আপনাদের।’

লোকটাকে আশ্চর্য সপ্রতিভ এবং নিরীহ বলে মনে হলো লিলির। এরকম শান্ত, সুদর্শন একজন মানুষ দু’হাজার লোককে ডুবিয়ে মারতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল ছবার্ট, মার্টিনির অর্ডারটা ওয়েট্রেসকে জানিয়ে দিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। বারম্যানের হাত থেকে ছই-স্কির গ্লাস নিলো সে।

কামরাটা ভালো করে আরেকবার দেখে নিলো রানা। কামরা থেকে বেরুবার আর ঢোকান পথগুলো মনে গেঁথে রাখলো। ‘জানা-লার বাইরে অন্ধকার,’ ফিসফিস করে বললো লিলিকে। ‘ভয় পাওয়াতে চাইছি না, তবে ওদিক থেকে বিপদ আসা অসম্ভব নয়। যতোটা সম্ভব সাবধানে থাকা দরকার।’

‘তুমি কোনো বিপদের আশঙ্কা করছো ?’

‘সব সময়, লিলি, সব সময়।’ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো রানা। ‘এক মিনিটের জন্যে মাফ করবে ?’ উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে হাঁটা ধরলো ও।

পুরুষদের টয়লেটে ঢুকলো রানা, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে জানালার সামনে চলে এলো। ফ্রেমে আটকানো কাঁচের কবার্ট খুলে বাইরে ঝুঁকি দিলো ও। কাউকে দেখলো না।

কোমরে হাত দিয়ে পিস্তলের অস্তিত্ব অনুভব করলো রানা। তারপর জানালার কাগিজে উঠে বসলো, ছোট লাফ দিয়ে টয়লেটের বাইরে ঘাসের ওপর নামলো প্রায় নিঃশব্দে।

ঘাড় আর মাথা নিচু করে শিকারী বিভালের মতো এগোলো রানা। মাথার ওপর টেলিফোনের তার, সেটাকে অনুসরণ করেছে ও। এই তারই রাস্তার ধারের পোলের সাথে রেড ড্রাগনকে সংযুক্ত করেছে। পকেট থেকে ছোটো একটা মেটাল টুল বের করে কি যেন করলো রানা, তারপর সেই জানালা পথেই ফিরে এলো নিজেদের টেবিলে। দেখলো ওদের টেবিলে কফি পরিবেশন করছে লিল। হাতঘড়ি দেখলো রানা। ন'টা চল্লিশ।

রাত দশটা বিশ। ফিনিক্স, আরিজোনা।

একটা থিয়েটারের লবি থেকে ডায়াল করতে শুরু করলো নিকোলাই ডালচিমস্কি। পাঁচ মিনিটে তিন বার ডায়াল করলো সে। কোনো উত্তর নেই। নর্থ সেন্টাল এভিনিউয়ে, তার হোটেল ফিরে এলো সে। একটা পাঁচে ডায়াল করলো আবার। খুঁত খুঁত করতে লাগলো মনটা। রুম সার্ভিসকে বললো সকাল সাতটায় তার ঘুম ভাঙতে হবে। শুয়ে পড়লো সে, কিন্তু ঘুম এলো আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর। একটুতেই অবৈধ হয়ে পড়া স্বভাব, ঘুমের মধ্যেও উদ্বেগে ভুগলো ডালচিমস্কি। কি কি সব দুঃস্বপ্ন দেখলো, সকালে ঘুম ভাঙার পর কিছুই মনে করতে পারলো না। ঘুমের মধ্যে অস্থির

একটা সময় কেটেছে, শরীরটা বিশ্রাম পায়নি, সারা গায়ে ব্যথা।  
ব্যাপারটা হয়তো অস্বস্তিকর, দাড়ি কামাবার সময় নিজেকে বললো  
সে, কিন্তু ঘাবড়াবার মতো কিছু নয়। নিজেকে অভয় দেয়ার চেষ্টা  
করলেও, দু'জায়গায় গাল কেটে ফেললো। ক্ষতের জ্বালা নিয়ে  
বাস্ত হাতে কাপড় পরলো, তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে সরাসরি  
নিচের বুদে এসে ঢুকলো। ঘড়িতে তখন সাতটা পঁচিশ।

কোনো সাড়া নেই।

ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলো, কিন্তু মুখে রুচলো না। আঙুরের  
জুস গেলার সময় মনে হলো তেতো কোনো ওষুধ খাচ্ছে। প্রতি  
মুহূর্তে আয়রন রিভারের টেলিফোনটার কথা ভাবছে সে। নম্বরে  
কোনো ভুল নেই। জানে সে, তবু একজন লং ডিসট্যান্স অপারে-  
টরকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেবে। কফি শেষ করে অপারে-  
টরকে ফোন করলো। তার জানা নম্বরটাই আউড়ে গেল মেয়েটা।  
আবার ডায়াল করলো ডালচিমস্কি।

রিসিভার তুলছে না কেউ।

খারাপ কি যেন একটা ঘটতে শুরু করেছে।

চুরুট ধরালো ডালচিমস্কি। হাত কাঁপছে দেখে গালিগালাজ  
করলো নিজেকে—মর শালা।

# এগার

---

এঞ্জিনের কাঁপা কাঁপা শব্দে চট করে ঘুম ভেঙে গেল রানার। বিপদের মধ্যে থাকার সময় ঘুম ওর কখনোই গভীর হয় না। কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং ট্রেনিং, দুটো এক হয়ে ঘুমের মধ্যেও সচেতন রাখে ওকে। আয়রন রিভারের পরিস্থিতি এমনিতেই সংকটময়, মাথার ওপর আওয়াজটা আরো বেশি উত্তেজনাকর।

সব হেলিকপ্টারকেই বাঁকা, সন্দেহের চোখে দেখে রানা। ওগুলোর সাথে পুলিশ বা এফ. বি. আই.-এর সম্পর্ক আছে।

বিছানার ওপর শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে থাকলো রানা। দশ সেকেন্ড পর মেঝেতে নেমে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। নিউ ইয়র্কে কেনা রেডিওটা অন করলো, কিনেই ছিলো এফ. বি. আই. ফ্রিকোয়েন্সি ধরার জন্তে। সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে কাঁটা ঘোরালো, হেলিকপ্টার থেকে কোথাও কোনো মেসেজ পাঠানো হলে জানতে পারবে।

কিছুই শোনা গেল না।



জানালা দিয়ে রাইরে ভোরের আবছা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকলো রানা। ক্লান্ত চোখে সহজে ধরা পড়লো না যান্ত্রিক ফড়িংটা। যখন ধরা পড়লো, অনেকটা দূরে সরে গেছে। অলস ভঙ্গিতে উত্তর অর্থাৎ শহরের দিকে যাচ্ছে ওটা। এতোটা দূর থেকে 'কণ্টারের' গায়ে কোনো চিহ্ন থাকলেও দেখতে পাবার কথা নয়। হতে পারে এয়ারফোর্সের 'কণ্টার', একটা এস. এ. সি. পাখি, মিসাইল ক্রু বা মেইটেন্যান্স টিমকে সাইলোতে পৌঁছে দিচ্ছে। কিংবা এক শো ছুই নম্বর কমান্ড পোস্টে ফিরে যাচ্ছে। অথবা ধনী, সৌখিন কোনো শিকারী এলো আয়রন রিভারে। এরিয়াল সার্ভের জন্যে জিওলজিস্টরাও মাঝে মধ্যে আসে এদিকে।

কিন্তু কোনোভাবেই মনটাকে শান্ত করা গেল না। কেন যেন মনে হতে লাগলো, হেলিকপ্টারটায় ওর শত্রু আছে, ওটা তার জন্যে একটা হুমকি। সুন্দরী মেয়েটা ঘুম ঘুম চোখে বিছানা থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তাকে কিছু বললো না রানা। লিলি হয়তো শুধু তাকিয়েই আছে, কিছুই বোঝেনি। তাছাড়া, ব্যাখ্যা করার মন নেই তার।

ধীরে ধীরে দূর আকাশে হারিয়ে গেল হেলিকপ্টারটা। তারপরও জানালার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো রানা।

‘রবিন !’

‘বলো !’

‘এখানে আসবে, আমার কাছে ?’

জানালার দিকে পিছন ফিরে সিগারেট ধরালো রানা। ক্লান্তিতে ঝুলে আছে ওর কঁধ দুটো। সব চুল এলোমেলো হয়ে আছে মাথায়। ব্যর্থতা এবং বিরতিহীন উত্তেজনা কাহিল করে ফেলেছে

ওকে । প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার চাপ, কতো আর সহ্য হয় । লিলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো ও । এখনো মেয়েটা পুরোপুরি প্রফেশনাল হয়ে উঠতে পারেনি । ওর সাথে কারচুপি করছে মেয়েটা, নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রে এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত । রবিনের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, চেষ্টা করেও ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারেনি । প্রফেশনাল হয়ে উঠতে আরো দেরি আছে তার ।

‘কি দেখছো রবিন ?’ কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলো লিলি ।

‘তোমাকে ।’

‘আমি কি নতুন ?’

কাঁধ ঝাঁকালো রানা । ‘পুরনো হবার আগেই যে চলে যাবে বলে জানি তাকে কি বলা যায় ?’ পান্টা প্রশ্ন করলো রানা ।

সাথে সাথে কিছু বলার মতো খুঁজে পেলো না লিলি । সে-ও একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো । ‘সত্যিই তো, কি বলা যায় । তারপর চলে যাবার পর যখন জানবে মেয়েটা সুবিধের ছিলো না তখনই বা কি বলবে ?’

‘এ-কথা বলছেন কেন ?’ এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসলো রানা । ‘মেয়েটা তুমি সুবিধের নও—মানে ?’ হাসিটুকু লুকিয়ে রাখলো ও ।

‘তোমার প্রতি আমি দুর্বল এটা তোমাকে বুঝতে দিয়েছি, কিন্তু চলে যাবার পর তোমার কথা বেমানম ভুলে যাবো—সুবিধের হলাম কি করে ?’

‘ভুলে যাবে ?’

‘যেতে হবে ।’

‘কেন ?’

‘এখন জানতে চেয়ো না,’ জোর করে হাসলো লিলি। ‘বিদ্যায়ের আগে আমি নিজেই তোমাকে উত্তরটা দিয়ে যাবো। এখন কাজের কথা হোক। তার আগে বলো, তুমি ঘুমাতে পারোনি কেন ?’

‘কি করে বুঝলে... ?’

‘রাত চারটের সময় বাইরে গিয়েছিলে—কোথায় ?’ জিজ্ঞেস করলো লিলি। ‘আধ ঘণ্টা পর আবার ফিরে আসো।’

‘গিয়েছিলাম—ছোট্ট একটা বীমা করে রাখলাম। ম্যানিয়াক-টাকে এখানে অর্নিতে হলে আটচল্লিশ ঘণ্টা ফোন সাভিস অচল করে রাখা দরকার। লাইনের ছোট্ট ইন্সুলেটরে একটু কারিগরি বিদ্যা ফলিয়েছি। তাতে একটা দিন অতিরিক্ত সময় পাবো হাতে। এই সময়ের মধ্যে যদি ও না আসে, ফোন লাইন আরো একদিন অচল রাখার জন্যে আবার আমাকে বিদ্যা ফলাতে হবে। দরকার হলে মেইন কেবল-ই উড়িয়ে দেবো আমি।’

‘তুমি সিরিয়াস ?’

‘সিরিয়াস নই মানে ! দরকার হলে ছোট্টকে আমি খুন করতে পারি তা জানো ! একের পর এক খুনগুলো ঘটতে দেখে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার, লিলি ! কোনো বুদ্ধিই খেলছে না মাথায়, ভেঁতা হয়ে গেছি ! বোকা আর অসহায় লোকের শেষ অবলম্বন ভায়োলেন্স—পরিস্থিতি আমাকেও ভায়োলেন্ট হয়ে যাবার দিকে নিয়ে যাচ্ছে !’

‘তুমি বোকা নও, হানি। নামকরা স্পাইদের জীবনী পড়োনি ? একটানা দশ বছর কঠোর পরিশ্রম করার পর এক আধটা অ্যাসাইন-মেন্টে সফল হয় তারা। স্পাইরা জাত দেখায় শুধু খিলারে, সব

গাঁজা । বোকা নও, তবে তুমি ক্লান্ত ।’

হেসে উঠলো রানা । ‘লোকটাকে আমার ঈর্ষা হচ্ছে ।’

‘কার কথা বলছো ?’ সুরেলা কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করলো লিলি ।

‘যার সাথে তোমার বিয়ে হবে,’ বললো রানা ।

‘বিয়ে হবেই এমন কোনো কথা... ।’

‘কাউকে ভালোবাসো না ?’

‘জানি আমার জন্যে নাকি অনেকেই পাগল-ছাগল, কতোটুকু বা কেন তা জানি না । জানতে কখনো চেষ্টাও করিনি । কী লাভ শুধু শুধু কষ্ট কুড়োনোর ?’

‘তারমানে আমি পাগল হলেও আমার কোনো সুযোগ নেই ?’

‘তোমার পাগল হবার দরকার আছে কি ? দেবার মতো এমন কিছু আছে যা তোমাকে দেইনি আমি ? কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে সরে যাচ্ছি আমরা । আমরা ডালচিমস্কির কথা বলছিলাম ।’

‘চিন্তা করো না । হার তাকে মানতেই হবে । প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আমি গ্রেট ।’

‘আমি তা জানি, রবিন ।’

‘আর কেন আমি জিতবো, জানো ? কারণ আমি খুব কম ভুল করি । তার চেয়ে বেশি প্রফেশনাল আমি, বেশি সতর্ক । সব কিছু যাচাই করে দেখি, বারবার । এই কাজটায় তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার । কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও । হেলিকপ্টারটা সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে । কাজটা তোমাকে দিয়ে করাবো, আর এখান থেকে রেড ড্রাগনের ওপর নজর রাখবো আমি ।’

দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ফিরে এলো লিলি, তখনো রানা রাস্তার দিকে তাকিয়ে টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাকের জন্যে অপেক্ষা

করছে। হেলিকপ্টারটা চাটার করেছে একজন স্পোর্টসম্যান-হান্টার, ডালচিমস্কির চেয়ে কমকরেও দশ বছরের ছোটো, আর কয়েক ইঞ্চি বেশি লম্বা। রুট একশো এগারোয়, ভ্যালি লজ-এ উঠেছে লোকটা, প্রায় তিন মাইল উত্তরে। হোটেলের নাম লিখিয়েছে, টিম ম্যাকফারলন। পাহাড়ে আসা-যাওয়া করার জন্যে একটা জীপও ভাড়া করেছে সে।

‘বিশ্বাস করি না। এটা শিকারের মরশুম নয়। প্রচণ্ড গরম। সে কি একা?’

মাথা ঝাঁকালো লিলি।

‘কিছুই প্রমাণ হয় না। অন্যান্যরাও হয়তো এখানে পৌঁছে গেছে।’

‘অন্যান্যরা, রবিন?’

‘কেন, তোমাকে আমি বলিনি এফ. বি. আই. এজেন্টরা দল বেঁধে অভিযানে বেরোয়? কেউ তার সাথে দেখা করেছে?’

মাথা নেড়ে কালো কফির কাপটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলো লিলি। ‘নাও।’

ধূমায়িত কাপে চুমুক দিলো রানা। ‘দরকার বটে। ধন্যবাদ। তুমিও জানো আমার ঘুমানো চলবে না।’

‘রেজিস্টার দেখে জানলাম, টিম ম্যাকফারলন সন্ট লেক সিটি থেকে এসেছে।’

‘তুমি বললে, কিন্তু আমি শুনতে পাইনি! ফর গডস সেক, এতো পানির মতো সোজা! কেন, রেজিস্টারে আমরা কি লিখিয়েছি? নিউ ইয়র্কের মিঃ আর মিসেস গর্ডন, তাই না? সে হয়তো সত্যি সত্যি সন্ট লেক সিটির টিম ম্যাকফারলন, কিন্তু বিশ্বাস করতে আমি

বাধ্য নই—আমার পোষাবে না। আমি জানি, সে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের প্রতিনিধি নয় ?’

ফিনিজ এয়ারপোর্টের ফোন বুদে রয়েছে ডালচিমস্কি, রেড ড্রাগনের মালিক আলবার্ট ছবার্টের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে—এবার নিয়ে সাতবার। সরাসরি ডায়াল করে যখন কোনো লাভ হলো না, আয়রন রিভার অপারেটরের সাহায্য চাইলো সে।

‘হুঃখিত, স্যার,’ শব্দজটের ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় বললো মেয়েটা। ‘মনে হচ্ছে লাইনে কোনো গোলমাল আছে। আমাদের ইমার্জেন্সী সাভিসে রিপোর্ট করেছি, কাল ওরা চেক করে দেখবে বলেছে।’

‘কাল ?’ তিরস্কারের সুরে জিজ্ঞেস করলো ডালচিমস্কি।

‘হুঃখিত, স্যার। আমাদের রিপেয়ার ক্রুরা এই মুহূর্তে সাংঘাতিক ব্যস্ত। ডিউটিতে এসেছেই কম লোক, তার ওপর পুলিশ হেডকোয়ার্টারের লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় ওদিকে কাজ করতে হচ্ছে...।’

‘আচ্ছা !’

‘আপনার কলটা যদি খুব জরুরী হয়, স্যার...।’

উত্তর না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিলো ডালচিমস্কি, কারণ স্পীকারে তার ফ্লাইটের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। প্লেনে চড়ার সময় ভাবলো সে, আয়রন রিভার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফোন লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবে কেন ? তার জানার কথা নয়, দুটো অকেজো ইনস্টলারের এর জন্যে দায়ী।

রানার বীমা।

হিসেবে কোনো ভুল করেনি রানা। জানতো, পুলিশ লাইন আগে মেরামত করা হবে।

ঠাণ্ডা মাথায় অপেক্ষা করার ধৈর্য ডালচিমস্কির নেই। লোকটা এজেন্ট নয়, শ্রেফ একটা উন্মাদ। ধ্বংস করার প্রচণ্ড নেশায় অস্থির হয়ে আছে, কোথায় ভুল করে বসছে সেদিকে খেয়াল তার না থাকারই কথা। এই অস্থিরতাই তাকে ধ্বংস করবে। মোটেল কাম-রায় সার্বাটা দিন বসে থাকলো রানা, পর্দার ফাঁক দিয়ে রেস্টো-রার দিকে তাক করে রাখলো বায়নোকিউলারটা সারাক্ষণ হাঁটুর ওপর রয়েছে রাইফেল, কাজটায় এতো বেশি মনোযোগ যে রেডি-ওর মিউজিকও শুনতে পাচ্ছে না। এদিকে লোকজনের আসা-যাওয়া খুব বেশি নয়, ছোট্ট একটা স্টেশন থাকায় কাজ চলে যায়।

বেলা একটার দিকে শহরের এক হোটেল থেকে দুটো স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এলো লিলি। রবিনের ধৈর্য আর নিষ্ঠা দেখে অবাক হলে সে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। একবার একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসলো সে, 'তোমার কাজ তুমি করো, আমার কাজ আমি,' বলে রানার কাঁধে মাথা রাখলো, হাত দুটো জ্যাকেটের ভেতর ঢুকে গিয়ে নগ্ন বুকে কিলবিল করতে লাগলো। তারপর রানার কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঝুলে পড়লো, চুমো খেলো গালে।

চারটের সময় আবার কফি পেলো রানা।

বসে বসেই আড়মোড়া ভাঙলো ও। পা দুটো লম্বা করলো, মাথার ওপর ভুলে টান টান করলো হাত দুটো। 'আমার খিদে পেয়েছে।'

'তাহলে আবার আমাকে শহরে যেতে হয়।'

'সে খিদে নয়। অন্য রকম খিদে।'

‘খাবারটা তোমার খোরাক হবার জন্যে সব সময় ঘুর ঘুর করছে আশপাশে, কিন্তু তুমি কাজের সময় খেতে-টেতে চাইবে না ভেবে...।’

‘বিছানাটা জানালার ধারে টেনে আনা যায় না?’

‘খ্যেৎ!’

রাত আটটার মধ্যেও যখন টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক এলো না, রানা ধারণা করলো তাহলে কাল সকালের আগে ওদের আর আসার সম্ভাবনা নেই। হাঁটু থেকে রাইফেলটা নামালো ও। তার-মানে রাতের জন্যে অসতর্ক থাকবে তা নয়। শিকাগোর একটা স্পোর্টস স্টোর থেকে ক্লেয়ার গান আর রকেট কিনেছিল ও, পায়ের কাছ থেকে মাত্র এক গজ দূরে রয়েছে ওগুলো। না, ডালচিমস্কি রাতে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ রাতে সে আসবে না।

‘কাল রাতে,’ রেড ড্রাগন থেকে ডিনার খেয়ে বেরুবার সময় লিলিকে বললো রানা।

মুহূর্তের জন্যে হলেও রবিনের ওপর লিলির বিশ্বাসে সামান্য একটু চিড় ধরলো। ঠিক বুঝতে পারলো না ডালচিমস্কির জন্যে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে কিনা। তারপর ভাবলো, ডালচিমস্কির মতো একটা পাষাণকে একা একজন লোক সামলাতে পারবে তো এমনকি রবিনের মতো দারুণ একজন এজেন্টেরও ভুল হতে পারে, তারও দুর্বলতা আছে। শ্রেফ দুর্ভাগ্যের কারণেও ব্যর্থ হতে পারে রবিন। তার কি বাইরের সাহায্য চাওয়া উচিত? ডাকলেই চলে আসবে লোকজন। তারাও



যোগ্য প্রফেশনাল, চমৎকার সব অস্ত্র নিয়ে আসবে সাথে করে।

‘কাল রাতে আসবে স্কে,’ গাড়িতে উঠে কথাটা আবার বললো রানা।

‘কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছে?’

‘যুক্তির বিচারে।’

‘এবং তুমি ঠিক জানো, একা তুমি তাকে সামলাতে পারবে?’

‘কাজটাই একার, লিলি। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চেয়ে না।’ হঠাৎ করে কঠোর হয়ে উঠেছে রানার চেহারা।

‘আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি। যাই বলো, একা একজন মানুষ...’

‘একা নই, আমরা দু’জন,’ বললো রানা। ‘প্ল্যানটায় তোমারও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তোমার ওপর আমি নির্ভর করছি।’

‘তুমি যা বলো। তারমানে প্ল্যান একটা তৈরি করেছে তুমি?’

মোটেলের সামনে গাড়ি থামালো রানা। ‘দু’একটা বিষয় এখনো আমাকে অস্বস্তির মধ্যে রেখেছে। সন্ট লেক সিটি থেকে আসা লোকটা সম্পর্কে আরো কিছু জানতে পারলে ভালো হতো। যদি জানতে পারতাম ট্রাইপড-টা কোথায় আছে তাহলে ভালো ঘুম হতো রাতে।’

‘ট্রাইপড? কিসের ট্রাইপড? ম্যাকফারলনের কাছে কোনো ট্রাইপড আছে বলে তো শুনিনি।’

কাঁধ ঝাঁকালো রানা, বন্ধ করলো এঞ্জিন। ‘ম্যাকফারলনের কাছে নয়, হবার্টের কাছে। ওটা যদি অন্য কোনো লোক পেয়ে যায়, মহা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।’

‘কি বলছো! তোমার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না!’

‘আমাদের ট্রাইপড, বুঝতে পারছেন না ? রাশিয়ানদের, মস্কোর । এখানে যদি সেটা দেখা যায়, কি তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে কল্পনা করতে পারো ?’

‘তুমি বোধহয় রুশ ক্যামেরার কথা বলছেন, তাই না ? দুঃখিত, রবিন, ক্যামেরা সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না আমি ।’

অবাক হয়ে চোখ পিট পিট করলো রানা ।

লিলি জানে না ।

তারমানে ওর কথা কিছুই বুঝতে পারেনি লিলি । সেজন্যে অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা । জানার অবশ্য কথাও নয় । ছব্যাটের কাছে যে মডেলটা আছে সেটা অনেক দিন আগের ।

কোথায় ?

আয়রন রিভার ছেড়ে যাবার আগেই ওটা তাদেরকে পেতে হবে, কাজেই ওটার কথা লিলিকে বলতে হবে রানার । আজ নয়, কাল । কাল ডিনারের পর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে ও ।

ডালচিমস্কিও, ধারণা করা যায়, কাল ডিনারের পর আসবে এখানে । ডিনারের পর যে-কোনো সময় । দিনের বেলা আসবে না, তাতে চেহারা দেখাবার ঝুঁকি নিতে হবে । তাছাড়া, চিন্তা করলে সে বুঝবে যে মাঝরাত থেকে সকালের মধ্যে ড্যামটা উড়িয়ে দেয়া অনেক বেশি সহজ হবে ছব্যাটের জন্যে । তবে, এ-কথা জোর করে বলা যায় না যে ইতিমধ্যে উপত্যকায় পৌছায়নি ডালচিমস্কি । হয়তো কাছেপিঠে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে । টিম ম্যাকফারলন যে হোটেলের উঠেছে সেখানেই হয়তো উঠেছে সে ।

কামরায় ঢুকে রানা বললো, ‘আজ রাতে পালা করে জাগবো আমরা । চার ঘণ্টা করে, ঠিক আছে ?’

‘জাগবো ?’

‘রেড ড্রাগনের ওপর নজর রাখবো। আর একটু পরই বন্ধ করে দেবে ওরা। আজ রাতে যদি আসে ডালচিমস্কি, বেশি রাতে আসবে। প্রথমে আমার পালা।’

আজ রাতে পরস্পরকে নিয়ে সুখী হওয়ার সময় বা উৎসাহ কোনোটাই ওদের নেই। লিলি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ছে, সেটা চোখে দেখে উপভোগ করা থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করলো রানা। ওর সমস্ত মনোযোগ রেড ড্রাগন আর হাইওয়ের ওপর। মনোযোগ এক আধবার ছুটলো শুধু যখন ট্রাইপডের কথা মনে পড়ে গেল। রাত চারটের সময় লিলিকে জাগিয়ে দেয়ার সময়ও ওটার কথাই ভাবছিল ও।

তবে ওর স্বপ্নের মধ্যে ট্রাইপড থাকলো না।

দৃঃস্বপ্ন একটা দেখলো বটে রানা, টেলিফোন কোম্পানীর একটা ট্রাককে নিয়ে। উপত্যকার দূর কিনারাকে সূর্যের প্রথম আলো তখন রাঙা করে তুলছে, লিলি দেখলো বিছানার ওপর ছটফট করছে রবিন।

বেলা দশটা পর্যন্ত রবিনকে ঘুমাতে দিলো লিলি। এতোক্ষণ সে-ও একটানা হাইওয়ে আর রেড ড্রাগনের দিকে তাকিয়ে থাকলো, ভাবলো সত্যিই কি আসবে ডালচিমস্কি? নাম সহ করাটাকে সে কি অতোটাই গুরুত্ব দিচ্ছে? ফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছে না, বিরক্ত হয়ে সে যদি ভাবে, থাক, দরকার নেই, বরং অন্য যে-কোনো একটা টেলি-বম ফাটানো যাক?

কিন্তু না, ফ্যানাটিকরা এভাবে চিন্তা করে না। ডালচিমস্কি মানসিকভাবে অসুস্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা মাত্র অক্ষর

বাকি আছে, 'আই'। খাতায় এই একটাই আই আছে। সেইটা পুরো করতে হলে হিউম্যান বোমা আলবার্ট ছবার্টকে কোড মেসেজ-টা তার দিতেই হবে।

কিন্তু ফ্যানাটিক হোক বা উন্মাদ, ধরে নিতে হবে তারও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। ফাঁদটা যদি টের পেয়ে যায় ডালচিমস্কি ? তার মন যদি তাকে সতর্ক করে দেয় ? সেক্ষেত্রে ফোন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে।

কোড মেসেজটা পেলে আলবার্ট ছবার্ট আর মানুষ থাকবে না। ড্যানিবার ড্যাম উড়িয়ে দেবে সে। তা যদি দিতে পারে, কয়েক হাজার লোক ডুবে মারা যাবে।

তারাত্ত।

## বারো

---

পরদিন ছপুরেও যখন টেলিফোন কোম্পানীর ট্রাক এলো না, বিকল্প উপায়গুলো নিয়ে আরেকবার চিন্তা ভাবনা করলো রানা। খুবই সম্ভাবনা রয়েছে সূর্য ডোবার আগে কোনো এক সময় হাইওয়ে ধরে পৌঁছে যাবে রিপেয়ার ক্রুরা, আর তখন ছবার্ট যাতে ফোন

কলটা না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে রানাকে ।

শহরে গিয়ে মেইন সুইচবোর্ড বিকল করতে পারে ও । নিজে না গিয়ে কাজটা লিলিকে দিয়েও করানো যায়, ছোটো একটা বোমা ফিট করে দিয়ে আসবে সে ।

হাইওয়ে ধরে খানিকটা এগিয়ে কোনো ঝোপ বা পাথরের আড়ালে ওত পেতে থাকতে পারে রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে ফাটিয়ে দিতে পারে ট্রাকের চাকা । চাকা ফেটে গেলে ট্রাকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে ড্রাইভার, কিনারা থেকে খাদে খসে পড়বে ট্রাক । নিরীহ মানুষ মারা পড়বে ।

এতো কিছুর মধ্যে না গিয়ে আরো সহজ উপায় বেছে নিতে পারে রানা । ছবার্টকে খুন করা কোনো সমস্যা নয় । ওর জায়গায় একজন সি. আই. এ. বা কে. জি. বি. এজেন্ট হলে এই সহজ সমাধানটাই হয়তো পছন্দ করতো । আর কোনো উপায় না দেখলে, শেষ পর্যন্ত হয়তো রানাকেও তাই করতে হবে । তবে সেক্ষেত্রে খুন না করে লোকটাকে আহত করার চেষ্টা করবে রানা ।

তবে বড় কোনো ঝুঁকি নেবে না ও । নেয়া উচিত হবে না । কয়েক শো কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন এটা । এটাই শেষ সুযোগ রানার, এখান থেকে পালাতে পারলে নির্ধাৎ তৃতীর বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে ডালচিমস্কি ।

কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বললো রানা, ‘না, আমি করবো না ।’

‘কি করবে না তুমি, রবিন ?’

‘তুমি করবে । যদি কাজ হয়, কেউ আহত হবে না ।’

কাজ হলো, এবং কেউ আহত হলো না । গাড়ি চালিয়ে আয়রন

রিভারে গেল লিলি, একটা ফোন বুদে ঢুকে ডায়াল করলো ফোন কোম্পানীর রিপেয়ার সাভিস অফিসে। ওদেরকে বললো, রেড ড্রাগনে ক্রু পাঠানোর দরকার নেই, ফোন লাইন আবার চালু হয়ে গেছে। ডিউটি অফিসার লিলিকে ধন্যবাদ জানালো, কথা দিলো রিপেয়ার ট্রাককে রেডিওর মাধ্যমে এখনি সে ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছে। সাভিস ট্রাকটা ইতিমধ্যে রেড ড্রাগনের কাছাকাছি, এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে, এই সময় মেসেজটা পেলো ড্রাইভার। রানার রাইফেল রেঞ্জের মধ্যে আসতে আর বিশ সেকেন্ড বাকি ছিলো, ট্রাক ঘুরিয়ে নিলো সে। হাটিং রাইফেলের স্কোপে চোখ রেখে ট্রাকটাকে ঘুরাতে দেখে পরম স্বস্তি বোধ করলো রানা। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

একটা ঝামেলা এড়ানো গেছে, কিন্তু আসল কাজ থেকে ছুটি নেই রানার। রাস্তার প্রতিটি গাড়িকে খুঁটিয়ে দেখলো ও। বিশেষ করে একটা জীপের অপেক্ষায় আছে ও। চালিয়ে আসবে যে লোকটা নিজেকে টিম ম্যাকফারলন বলে দাবি করছে। তিনটে পঞ্চাশ মিনিটে সত্যি একটা জীপকে আসতে দেখা গেল, ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে আসছে, আগাগোড়া একই গতিতে। ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটাকে ভালো করে দেখতে পেলো না রানা, তবে বুঝতে পারলো ডালচিমস্কি নয়। রেড ড্রাগনের সামনে জীপ থামলো না, এমনকি গতি একটু কমলো না পর্যন্ত।

তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না।

পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এসে ট্রেনিং পাওয়া কোনো এজেন্ট টার্গেটের প্রতি আগ্রহ দেখাবে না। টিম ম্যাকফারলন যদি এফ. বি. আই. বা কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট হয়, নিশ্চয়ই খুব ভালো

ট্রেনিং পেয়েছে সে। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর, প্রফেশনালদের ধরন-ধারণ বা কৌশল কি রকম হয় জানা আছে। ডালচিমস্কির মতো উন্মাদ অ্যামেচারদের নিয়েই বিপদ, ওরা কখন যে কি করে বসবে আগে থেকে বলা অসম্ভব। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে রানার, সঙ্গিনী বেঈমানী না করলে প্রফেশনালদের সামলাতে পারবে ও।

আজ রাতেই অবশ্য সব জানা যাবে।

ডালচিমস্কি তো আসবেই, এবং টিম ম্যাকফারলনের সাথে অন্যান্যরাও সম্ভবত আসবে। ম্যাকফারলন যদি নাক গলায়, তাকেও ডালচিমস্কির ভাগ্য বরণ করতে হবে। দু'জনকে একই দাওয়াই দেবে রানা। এই একঘেয়ে, ক্লাস্তিকর মিশনের সমাপ্তি টানতে চায় ও। কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার প্রতি কোনো দয়া নয়। আরেকটা সমস্যা হবার্ট। তার ব্যাপারটা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। বেচারী একটা ভিকটিম, ঘটনাচক্রে অসহায় শিকার, তাকে বাঁচানোর জন্যে সাধ্যের অতীত চেষ্টা করছে রানা। তারপর লিলির কথা ভাবলো ও। এতো দেরি করছে কেন সে? কারো সাথে যোগাযোগ করছে নাকি? কাউকে ডাকছে?

লিলি ফিরে আসায় রানার চিন্তায় বাধা পড়লো। তাকে ট্রাক আর জীপের কথা শোনালো রানা, সময় মতো টেলিফোন কোম্পানীকে খবর দেয়ায় প্রশংসা করলো। রাতের প্ল্যান নিয়ে দু'বার আলোচনা করলো ওরা, তারপর অস্ত্র আর অগ্ন্যাগ্নি ইকুইপমেন্ট সতর্কতার সাথে আবার একবার পরীক্ষা করলো রানা। সম্পূর্ণ তৈরি থাকতে চাইছে ও। সামান্য, ছোট্ট একটা ভুল করলেও প্রাণের

বিনিময়ে তার খেসারত দিতে হতে পারে। আজ রাতে সফল হওয়ার ওপর নির্ভর করছে আরো অনেক মানুষের জীবন-মৃত্যু।

তৈরি হচ্ছে রানা, একটা চোখ রেড ড্রাগনের দিকে। চারটে পনেরো মিনিটে ছব্বাটকে যেতে দেখলো ও। সবুজ একটা মরিস চালাচ্ছে, নতুন না হলেও তাগড়া ঘোড়ার মতো তেজী বলে মনে হলো। পাঁচটা দশ মিনিটে আবার ফিরে এলো সে, গাড়ি থেকে নামলো দু'হাত ভরা প্যাকেট আর ব্যাগ নিয়ে। কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল।

সাতটা চল্লিশ মিনিটে লিলিকে তার গাড়িতে করে শহরটা একবার চকর দিয়ে আসতে পাঠালো রানা। অন্য গাড়িটা নিয়ে রেস্টোরায় চলে এলো নিজেকে।

‘আজ রাতে একা বুঝি?’ কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞেস করলো লিল, টেবিলে ছইস্কির গ্লাস রাখলো সে।

‘একটু পর আসবে ও।’

চারদিকে চোখ বুলিয়ে তিন চারটে দম্পতি, এয়ার ফোর্স অফিসারদের ছোটো দল, আর তিনজন নিঃসঙ্গ পুরুষকে দেখলো রানা। পাশের জানালা দিয়ে মাঝে মধ্যে বাইরে তাকালো ও। কিছু লোক বেরিয়ে গেল, নতুন কেউ কেউ ঢুকলো। হঠাৎ করেই জীপটা দেখতে পেলো রানা। একটা গাছের আড়ালে, গাঢ় ছায়ার মধ্যে রয়েছে বলে এতোকণ দেখতে পায়নি। সেই আগের জীপ-টাই। রেস্টোরার চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলালো রানা। এদের মধ্যে কেউ একজন টিম ম্যাকফারলন। কে হতে পারে?

টিম ম্যাকফারলন ওরফে রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট রাউল ক্ল্যারমন্ট যাকে খুন করতে চায় তার দিকে পিছন ফিরে বসে



আছে। একমনে মুরগীর রান চিবাচ্ছে সে, ভুলেও রানার দিকে তাকাচ্ছে না। চিন্তে কোনো উদ্বেগ নেই তার, সে-ও আজ রাতের প্ল্যান ঠিক করে রেখেছে। রানাকে সে দশ মিনিট আগেই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কোনো রকম অস্থিরতা বোধ করেনি। তার নার্ভ ইম্পাতের মতো শক্ত, সেজন্যেই তো তিন তিনটে কমাণ্ডো গ্রুপ ব্যর্থ হবার পর মাসুদ রানাকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব এতো থাকতে তাকেই দেয়া হয়েছে। আনন্দের সাথে ডিনার খাচ্ছে সে। জানে, তাকে চিনতে পারার কোনো উপায় নেই মাসুদ রানার।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ফিরে এলো লিলি। রানাকে হাসতে দেখে খুশি হলো সে। হাসিটুকুর মানে সব কিছু ঠিকঠাক মতো ঘটছে।

রানার মুখোমুখি বসলো লিলি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো, ‘শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। আমাদের সাথে বসে আছে সে।’

ছোট প্রশ্ন করলো লিলি, ‘কে?’

‘জীপের ড্রাইভার। বাইরে দেখোনি ওটা?’

গ্রাসে চুমুক দিলো রানা। সিগারেট ধরিয়ে বাতাসে রিঙ তৈরি করলো, যেন মোটেও উত্তজ্জিত নয়।

‘অনেক লোকই জীপ চালায়, রবিন।’

হেসে উঠলো রানা, লিলি যেন দারুণ একটা রসিকতা করেছে। খানিক পর বললো, ‘এ সে-ই। আমি তার গন্ধ পাচ্ছি। তাকিয়ে না—দেখতেও পাচ্ছি

লিলি তাকালো না। এক মুহূর্ত পর জানালার কাঁচে তার প্রতি-বিশ্ব দেখলো সে। কি করে জানছো এ সে-ই লোকই?’

‘বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করে। এতো মনোযোগ দিয়ে কেউ ডিনার খায়? নাহয় খাচ্ছে, কিন্তু তাই বলে ভুলেও একবার মুখ তুলে বা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবে না? আগে কখনো দেখেছো কিনা বলো।’

মাথা নাড়লো লিলি।

‘সম্ভবত তোমার বসের শিষ্য,’ মেনু তুলে নিয়ে বললো রানা।  
‘মনে করে দেখো, কোথাও দেখোনি আগে?’

‘দেখিনি।’

চোখের দিকে তাকিয়ে রানা ঠিক বুঝতে পারলো না লিলি মিথ্যে কথা বলছে কিনা।

‘আমরা এখন কি করবো, রবিন?’

‘আমরা’ বললেও, ডিনারের পর রানা যা করতে চায় তাতে লিলির কোনো অবদান রাখার সুযোগ বোধহয় থাকবে না। ‘রাজকীয় ডিনারের অর্ডার দেবো,’ বললো রানা। ‘হাতে সময়ের কোনো অভাব নেই আমাদের।’

খদ্দেররা আসা-যাওয়া করছে, অস্বাভাবিক কিছুই রানার চোখে পড়লো না। ওদের মেইন কোর্স শেষ হয়ে এসেছে, ইতিমধ্যে বাইরে আরো গাঢ় হয়েছে অন্ধকার। আবার চোখ তুলে তাকালো রানা, ক’মিনিট পরপরই একবার করে দেখছে—যেন ওয়েট্রেসকে খুঁজছে। লোকটা নেই।

‘পালিয়েছে,’ ফিসফিস করে বললো রানা।

‘কোথায় যেতে পারে?’

‘কিছু এসে যায় না। ফিরে আসবে।’

ঠিক দশটার পর বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্টোরান্ট থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। রাতটা বেশ গরম। একটু টলমল করছে রানা, যারা

ওকে হুইস্কি খেতে দেখেছে তারা কেউ অবাক হবে না ।

‘আজ কিন্তু তুমি গাড়ি চালাতে চেয়ো না, ডিয়ার,’ বললো লিলি ।

‘খ্যেৎ, আমার কি নেশা হয়েছে !’

‘আমি কি তাই বললাম ! তবে জানি, সব কিছু তুমি ছুটো করে দেখছো—আমাকেও !’ হাসি চাপার চেষ্টা করলো লিলি ।

‘একটাই সামলাতে পারি না...’

মিনিট দুয়েক স্বামী-স্ত্রী মূলভ টক-ঝাল মেশানো ঝগড়া করার পর হার মেনে লিলির গাড়িতে উঠে বসলো রানা । গাড়িটা ব্যাক করলো, রেস্টোরায় জানালার ধারে যারা বসে রয়েছে তাদের চোখের আড়ালে চলে এলো । তারপর নাক ঘুরিয়ে ছোট গাড়ি-পথ ধরে বেরিয়ে গেলো রাস্তায় । মোটেলের দিকে যাচ্ছে গাড়িটা ।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টা নতুন কোনো লোক রেড ড্রাগনে ঢুকলো না, এক এক করে সবাই বেরিয়ে এলো । সবশেষে বেরলো তিনজনের একটা দল, মিসাইল ক্রু । প্রত্যেকেই ওরা প্রচুর হুইস্কি খেয়েছে, হাঁটতে গিয়ে পরস্পরের গায়ে চলে পড়লো বারবার । তাদের মধ্যে একজন বারবার হাত নেড়ে বিদায় জানালো লিলিকে । দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো লিলি । মাঝরাতে সামান্য একটু পর ওয়েট্রেস আর রেস্টোরায় অন্যান্য কর্মচারীরা বিদায় নিয়ে চলে গেল । আরো কয়েক মিনিট পর অন্ধকার হয়ে গেল ডাইনিং রুম । দোতলার অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলে উঠলো ।

রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই বললেই চলে । পরবর্তী একশো মিনিট মাঝে-মধ্যে দু’একটা গাড়ি হাইওয়ে ধরে ছুটে গেল, একটাও মোটেল বা রেড ড্রাগনের সামনে থামলো না । গাড়িগুলোর স্পীড

দেখেই বোঝা যায়, হয় কোনো সতেজপ্রাণ যুবক চালাচ্ছে নয়তো ড্রাইভিংসিটে বসে আছে কোনো মাতাল। একটা পঞ্চাশ মিনিটে এ-ধরনের আরো একটা গাড়ি গেল, তবে এটার স্পীড আগের-গুলোর চেয়ে অনেক কম। এটাও থামলো না। তবে ক'মিনিট পর আবার ফিরে এলো। রানা যেখানে নিজের গাড়িটা রেখেছে সেখান থেকে দশ গজ দূরে পার্ক করলো ড্রাইভার।

ড্রাইভার একজন পুরুষ। তার পা দেখতে পেলো রানা। ঘণ্টা কয়েক আগে লিলির গাড়ি থেকে গাড়িয়ে নেমে এসেছিল ও, গড়াতে গড়াতে নিজের গাড়ির তলায় ঢুকে শুয়ে আছে। হাতে পিস্তল নিয়ে মশা আর পিঁপড়ের কামড় খাচ্ছে সেই থেকে। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে কাপড়চোপড়।

এ লোক ডালচিমস্কি না হয়ে যায় না।

দরজায় ধাক্কা মারার আওয়াজ শুনলো রানা। ভালো করে দেখতে পাবার আশায় এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোলো ও। ক্ষীণ একটু সম্ভাবনা আছে লোকটা ছব্বাটের কোনো বন্ধুও হতে পারে, কিংবা হয়তো কোনো ক্ষুধার্ত খদ্দের, অথবা তৃষ্ণার্ত মাতাল, যার কোনো সময়জ্ঞান নেই। কিন্তু দেখে মনে হলো লোকটা বেশ টান টান হয়েই দাঁড়িয়ে আছে, দরজায় ধাক্কা দেয়ার ভঙ্গির মধ্যেও কোনো রকম অস্থিরতা প্রকাশ পেলো না। মাতাল নয়, আত্ম-বিশ্বাসী একজন লোক।

দোতলার জানালা গলে চৌকো একটা আলো পড়লো নিচে। কারো ঘুম ভেঙে গেছে, সম্ভবত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সে। আগের চেয়ে দ্রুত হলো রানার নিঃশ্বাস। পিস্তলের সেফটিক্যাচ রিলিজ করলো ও। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পেশী। এখন

থেকে যে-কোনো মুহূর্তে উন্মোচিত হবে সত্য। ক্লাস্তিকর অ্যাসাইন-মেন্টটা ব্যর্থ হতে যাচ্ছিলো, এখন আবার আশার আলো জ্বলি জ্বলি করছে। ডালচিমস্কিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এক পয়সা দাম দেয় না রানা। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর যোগ্য সম্মান দিতে জানে ও, কিন্তু ডালচিমস্কি শ্রেফ হৃদয়হীন, নীচ একটা পশু। তার জন্যে রানার মনে কোনো দয়া নেই। এমনকি তাকে করুণাও করা চলে না।

পাঁচ গজ দূরে দরজা খোলার আওয়াজ হলো।

‘রাত ছপুরে কিসের এতো ঝামেলা, শুনি?’ ঝাঁক্কের সাথে জিজ্ঞেস করলো লুবার্ট। ‘মাথায় বাজ পড়েছে, নাকি সাপের পেট থেকে বেরুলেন? রেস্টোরঁ তো কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, মিঃ জ্যাক।’

‘আমার নাম জ্যাক নয়,’ নিচু গলায়, ফিসফিস করে বললো লোকটা। কথার সুরে বিদেশী টান।

‘কাল ছপুরে আসুন, স্লিভ।’

‘আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে।’

বুঝতে আর কিছু বাকি থাকলো না রানার। গড়িয়ে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো ও। হাতের পিস্তল তুলে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করলো। ‘ডালচিমস্কি!’ গর্জে উঠলো ও।

লোকটা এক কি দু’সেকেন্ডের জন্যে ইতস্তত করলো, তারপর ঘাড় ফেরাতে শুরু করে হাত বাড়ালো পকেটের দিকে। তিনবার গুলি করলো রানা, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে মুছ থক থক কাশির আওয়াজ বেরিয়ে এলো। ছোটো বুলেট ডালচিমস্কির চওড়া বুকে লাগলো। তৃতীয়টা কপালের নিচের দিকে, দুই চোখের মাঝখানটা ফুটো করলো। তৃতীয় নয়নের মতো লাগলো ওটাকে

রানার। ডালচিমস্কির সমস্ত উন্মাদনা আর উন্মত্ততা, নীচতা আর হিংস্রতা, বিকৃতি আর নির্ভুরতা গলগল করে বেরিয়ে এলো ওই ফুটো দিয়ে। দড়াম করে আছাড় খেলো সে। সঁয়াং করে সামনে বাড়লো রানা। খাতাটা পেতে হবে ওকে।

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রানা, ছব্বাটের চোখ দেখে শিউরে উঠলো। এক পলকে বুঝে নিলো ও, কোড সংকেতটা ছব্বাটকে শুনিয়ে দিয়েছে ডালচিমস্কি।

‘লেফটেন্যান্ট ইগর পদোভিচ,’ দ্রুত বললো রানা, ‘আমি মস্কো থেকে আসছি, কে. জি. বি.-র একজন এজেন্ট। কর্নেল বিকারেন আর মেজর জেনারেল কায়কোভস্কি পাঠিয়েছেন আমাকে। আপনার মিশন বাতিল করা হয়েছে।’ মাটিতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে তাকালো ও। ‘এই লোকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু ছিলো। টেলি-বম বাতিল করা হয়েছে।’

খানিক আগে যে লোকটা আলবার্ট ছব্বাট ছিলো, চোখে রাজ্যের সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকলো সে রানার দিকে। কথাগুলো আবার বললো রানা, রুশ ভাষায়। ব্যাখ্যা করলো, রেড আমির চীফ অভ স্টাফের নির্দেশে নিকোলাই ডালচিমস্কিকে ধ্বংস করতে এসেছে ও। নিকোলাই ডালচিমস্কি একজন বেস্টম্যান, পলিটব্যুরোর সদস্য থেকে শুরু করে প্রিমিয়ার, জেনারেল সেক্রেটারী, সেনাবাহিনী প্রধান, সবাইকে খুন করার ষড়যন্ত্র করেছিল সে।

‘আই সী,’ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে ইংরেজীতে বললো ছব্বাট।

‘গুড। এবার আমি খাতাটা খুঁজবো।’

লাশের কাপড়চোপড়ে হাত চাপড়ে সার্চ করলো রানা। চ্যাপ্টা, শক্ত, আর চারকোণা কি যেন একটা রয়েছে জ্যাকেটের পকেটে। হাত গলিয়ে দিয়ে জিনিসটা বের করে আনলো ও। বিজয়ীর হাসি ফুটলো মুখে। হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল, নিখুঁত একটা বারাত্রে চপ মেরে মাসুদ রানাকে অজ্ঞান করে ফেললো। লেফটেন্যান্ট পদোভিচ। যে লোকটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চেয়েছিল তার লাশের ওপর পড়লো রানা। গাড়ির এঞ্জিন গর্জে উঠলো, তখনো রানা পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়নি। তারপর যখন এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হবার চেষ্টা করছে, দেখলো সবুজ মরিসটা হাইওয়েতে উঠে গেছে, ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে উত্তর দিকে।

ড্যামটা উত্তর দিকে, ট্রাইপড নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছে হুবার্ট। খাতাটা রানার কাছে, কিন্তু ট্রাইপডটা সময় থাকতে কেড়ে নিতে না পারলে দু'হাজার লোকের সাথে লিলিকেও বাঁচানো যাবে না, নিজেও মারা পড়বে। হুবার্ট সাধারণ কোনো এজেন্ট নয়, ডীপ-প্রোগ্রামড টেলি-বম এজেন্ট। সে এখন আর হুবার্ট নয়। নামটা 'ট্রাইপড'-এর মতোই সেকলে হয়ে গেছে। আজ আর রেড আর্মির কেউ মিনিয়েচার অ্যাটমিক উইপনকে ট্রাইপড বলে না। এই মডেলের আণবিক বোমা আর তৈরিই করা হয় না, কারণ আজকাল আরো অনেক উন্নত বোমা তৈরি হচ্ছে। তবু সেকলে এই ট্রাইপডের রয়েছে পাঁচ হাজার টন হাই এক্সপ্লোসিভের সমান বিস্ফোরণ-ক্ষমতা—ড্যানবার ড্যামটাকে গুঁড়িয়ে পাউডার করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো রানা। ভয় পেয়ে গেছে ও। হুবার্টকে যেভাবে হোক থামাতে হবে। গাড়িতে বসে যখন স্টার্ট দিলো রানা, হাইওয়ের শেষ মাথাতেও সবুজ মরিসটা নেই।

# তেরো

---

কোথায় যাচ্ছে জানা আছে রানার। রেড ড্রাগন থেকে ড্যামের দিকে অনেকগুলো রাস্তা চলে গেছে, দু'দিন আগে সবগুলো পরীক্ষা করেছে ও, বেছে বের করেছে সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা। অন্তর্ঘাতকও সম্ভবত এই রাস্তাটাই ব্যবহার করবে, কারণ সম্ভাব্য অল্প সময়ের মধ্যে টার্গেট ধ্বংস করার তাগিদ থাকবে তার ভেতর। গ্যাস পেডালে আরো জোরে পা চেপে ধরে রানা ভাবলো, প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে। কি করবে লিলি ?

‘জুলিয়েট টু রোমিও। জুলিয়েট টু রোমিও,’ পাশের সিটে রাখা ওয়াকি-টকি থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো।

সেটটা এক হাতে নিয়ে ‘সেও’ সুইচটা অন করলো রানা। ‘গো অ্যাহেড। গো অ্যাহেড, জুলিয়েট।’

‘দশ সেকেন্ড আগে এদিক দিয়ে ছুটে গেল তার গাড়ি। উত্তর দিকে যাচ্ছে। উত্তর দিকে।’

লিলির ধারণা গাড়িটা ডালচিমস্কি চালাচ্ছে, ভাবলো রানা। তা ভাবুক, ক্ষতি নেই। ক্ষতি হয়ে যাবে এখন যদি ওর নির্দেশ অমান্য



করতে শুরু করে লিলি। যদি বেঁটমানী করে বসে।

‘প্রসিডিং নর্থ। প্রসিডিং নর্থ। ফলো মি ইমিডিয়েটলি।’

মোটেল, আর মোটেলের সামনে দাঁড়ানো লিলির গাড়িটাকে একটু পরেই পেরিয়ে এলো রানা। গাড়িতেই রয়েছে লিলি, ব্যাক আপ টিম হিসেবে। রানা ব্যর্থ হলে ম্যানিয়াকটাকে লিলির খুন করার কথা ছিলো। প্ল্যানটা সেভাবেই করা হয়। সমস্যা এখনো তাই আছে, শুধু ম্যানিয়াক বদল হয়েছে। লুবার্টকে এখন উন্মাদ বলে ধরে না নিয়ে উপায় নেই ওদের।

সমস্যা হবে সময় নিয়ে। চারটে সুইচ বন্ধ করতে হবে—সিকোয়েন্স যথাযথ হওয়া চাই—তবেই ট্রাইপডের টাইম মেকানিজম চালু হবে। মেয়াদী ডিটোনেটরের সাহায্যে ওঅরহেডটাকে তিন, সাত, বা এগারো মিনিট পর বিস্ফোরিত করা যেতে পারে, নির্ভর করছে এই বিশেষ ট্রাইপডটাকে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তার ওপর।

তবে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। রানার যতদূর জানা আছে, এই মডেলের ট্রাইপডগুলোর কোনো কোনোটাতে পাঁচটা করে সুইচ থাকে—পঞ্চম সুইচটা সুইসাইড মিশনের জন্যে। তা যদি হয়, শেষ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক আগে রওনা হয়ে গেছে লুবার্ট, মরিসের স্পীডও খুব বেশি।

জীপ আরোহী টিম ম্যাকফারলন আরেকটা হুমকি। এখনো তাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সময় মতো ঠিকই উদয় হবে সে, জানে রানা। তবে জীপ চালিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। তার জায়গায় রানা হলে আরো বেশি গতি পাবার জন্যে এবং পরিচয় গোপন করার জন্যে জীপের বদলে অন্য গাড়ি ব্যবহার করতো। যে-কোনো প্রফেশনালই তাই করবে।

ঘণ্টায় ষাট, পঁয়ষট্টি, সত্তর মাইল বেগে উত্তর দিকে ছুটছে রানা । ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত উপত্যকা বরাবর রাস্তাটা তীর চিহ্নের মতো সরল কংক্রিট । চোখ কুঁচকে সামনের দিকে ঝুঁকে অন্ধকারে মরিসের টেইল লাইট দেখতে চেষ্টা করলো রানা । মনে হলো অনেক দূরে লাল একটা বিন্দু যেন দেখতে পেলো একবার । এই ছিলো, এই নেই । হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে আরেক রাস্তায় চলে এলো গাড়ি, এদিকে উপত্যকার মেঝে উচু-নিচু, সারি সারি পাহাড়গুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে রাস্তাটা । রানা আন্দাজ করলো, গাড়ির আলো নিভিয়ে রেখেছে ছবার্ট । নিজেও জানেনি কেন, সে হয়তো গত এক যুগ কমকরেও পাঁচ-সাত শো বার এই রাস্তা দিয়ে ড্যাম পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছে । গোটা এলাকা তার নখদর্পণে, রানা বা ম্যাকফারলনের চেয়ে অনেক ভালো করে চেনে ।

কাছে পিঠেই কোথাও আছে ম্যাক ।

কোথায় ?

‘জুলিয়েট টু রোমিও । জুলিয়েট টু রোমিও । আমরা একা নই । রিপিট, আমরা একা নই ।’

রিয়ান-ভিউ মিররে তাকালো রানা । হেডলাইট দেখতে পেলো পিছনে । ওয়াকি-টকি তুলে নিলো ও । ‘রোমিও টু জুলিয়েট । আমার পিছনে তুমি ? নাকি আগন্তুক ?’

‘আগন্তুক । গাড়িটায় একজনই লোক । তার পিছনে রয়েছি আমি, চার কি পাঁচ শো গজ পিছনে ।’

‘তাই থাকো । প্ল্যান মতো চলবে সব । আমার কথা বুঝতে পারছো ?’

‘ঠিক আছে, রোমিও । ঠিক আছে । সাবধানে থেকো ।

উত্তর দেয়ার সুযোগ পেলো না রানা । একেবারে সামনে হঠাৎ একটা বাঁক দেখতে পেয়েছে, ওয়াকি-টকি হাত থেকে ফেলে দিয়ে ছ’হাতে হুইল ধরতে হলো । চট করে একবার ড্যাশবোর্ডে চোখ বুলিয়ে নিলো ও । আট মাইলের চেয়ে একটু বেশি পেরিয়ে এসেছে ওরা । তিন বা সাড়ে তিন মাইল বাকি আর । অথচ হবার্ট এখনো অনেক দূর এগিয়ে আছে । এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ট্রাইপডটা কি জায়গা মতো ফিট করা আছে, নাকি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে আন্তর্ঘাতক ?

গাড়িতেই থাকার কথা ।

ড্যামে ফিট করে রাখাটা বোকামি, হবার্টও তা বুঝবে । যখন তখন যে-কেউ দেখে ফেলতে পারে । তাছাড়া, বছরের পর বছর ধরে রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে জিনিসটা ফেলে রাখা চলে না । না, গাড়িতেই আছে ওটা ।

ফিট করবে কোথায় ?

গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখার জন্যে এদিক ওদিক বনবন করে হুইল ঘোরালো রানা, দাঁতে দাঁত চাপলো । এতো ঘন ঘন বাঁক পড়ছে, গাড়িটাকে রাস্তার ওপর রাখা দায় হয়ে উঠলো । বাধ্য হয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে নামিয়ে আনতে হলো গতি । রাস্তার ধারে এদিকে এখন খাদ নেই, তবে বড় বড় বোল্ডার রয়েছে । বাঁক নেয়ার সময় হিসেবে একচুল ভুল হলে বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে গাড়ি, লাশ সনাক্ত করারও কোনো উপায় থাকবে না ।

ফিট করবে কোথায় ?

ড্যামের ভিতটা বিশাল, এতো বিশাল যে হয়তো বা পাঁচ হাজার

টন শক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরণের ধাক্কাও সামলে নিতে পারবে। বুদ্ধি-মানের কাজ হবে একেবারে ওপরে উঠে যাওয়া, ওখানে ডিটোনেটর সেট করে মারণাস্ত্রটা পানিতে ফেলে দেয়া। শক-ওয়েভের মাত্রা কয়েক শো গুণ বাড়িয়ে তুলবে পানি, প্রচণ্ড তোড়ের ধাক্কায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে ড্যাম। মনটা বলছে ঠিক তাই করবে হুবার্ট, কাজেই কিভাবে তাকে বাধা দেবে সে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললো রানা।

কাজটা হবে ঝুঁকিবহুল, কিন্তু রানার সামনে আর কোনো বিকল্প নেই। আন্তর্যাতকের খোঁজে অন্ধকার হাতড়ে বেড়ানোর সময় নেই এখন। আগেই আন্দাজ করে নিতে হবে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, সরাসরি সেখানে পৌঁছতে হবে ওকে। হিসেবে যদি ভুল হয়ে থাকে, কপালের দোষ।

খানা-খন্ডে ভরা রাস্তা ধরে বাস্কেট বলের মতো ড্রপ খেতে খেতে ছুটছে গাড়ি। তারপর সামনে শুধু নুড়ি পাথর দেখা গেল, রাস্তা বলা চলে না। বার কয়েক পাথরে আটকে গেল চাকা, পিছু হটে তারপর সামনে বাড়ার পথ করে নিতে হলো। মিনিট খানেক পর ফাঁকা একটা বিস্তৃতি দেখে বাঁক নিতে গিয়ে অকস্মাৎ ব্রেক করলো রানা। আরেকটুর জন্যে মরিসটার সাথে ধাক্কা খেতো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে মরিস, কেউ নেই ভেতরে। ইতস্তত না করে এঞ্জিন বন্ধ করেই দরজা খুলে লাফ দিলো রানা। গাড়ির মেঝে থেকে রাইফেলটা হাতে তুললো, কেস থেকে বের করে হুডের ওপর লম্বা করে রাখলো। এরপর ফ্লোর গানটা বের করলো ও, লোড করলো দ্রুত হাতে। স্পেরার রকেটটা গুঁজে রাখলো বেণ্টে।

মুখ তুলে ড্যানবার ড্যামের দিকে তাকালো রানা। টাওয়ারের

শান্তিন্দত-২

মতো উঁচু হয়ে আছে দুশো গজ দূরে ।

কোথায় সে ? কোথায় ছবার্ট ?

ওই যে !

আর কে হতে পারে, নিশ্চয়ই ছবার্ট ! ছোটোখাটো একজন মানুষ, ড্যামের কিনারা ধরে ছুটছে, কি যেন ধরে আছে দু'হাতে ।

ট্রাইপড !

পিছনে গাড়ির আওয়াজ পেলো রানা । ঘাড় না ফিরিয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, লিলির ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে । সে যদি বেঈমানী করে, এখনই সময় । মুখ তুলে তাকালো রানা, ছবার্টের জন্যে দুঃখ বোধ করলো, তারপর একটা ফ্লোর ফায়ার করলো ও । মোটাসোটা পিস্তল থেকে ফ্লোরটা বেরিয়ে যেতেই আবার সেটা দ্রুত হাতে রিলোড করলো রানা ।

তারপর রাইফেল তুললো ।

ফসফরাস জ্বলে উঠলো, নিমেষে দূর হয়ে গেল অন্ধকার । উজ্জল আলোটা চোখে সয়ে আসতে এক সেকেন্ড সময় লাগলো । রঙিন ফ্লোর শূন্যে ভাসছে, ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচের দিকে । রানা দেখলো, আনবিক বোমাটা নামিয়ে রাখলো ছবার্ট, নিচের দিকে ঝুঁকে কি যেন করছে সে ।

দু'বার গুলি করলো রানা । প্রথম গুলিটা ডীপ-কাভার এজেন্টকে বোমার কাছ থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল । দ্বিতীয় গুলিটা লম্বায় ছোটো হতে বাধ্য করলো তাকে—হাঁটুর ওপর দাঁড়ালো সে ।

ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকলো ছবার্ট । হাত দুটো মাটিতে ঠেকলো, হামাগুড়ি দিয়ে ওঅরহেডের দিকে ফিরে আসছে সে । প্রচণ্ড রাগের সাথে রানা ভাবলো, যে-কোনো এসপিওনাজ

এজেন্সির গর্ব হতে পারতো লোকটা। দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ একজন নিরীহ এজেন্টকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে হচ্ছে ওকে। এই পেশার এই রেওয়াজ, কর্তব্যের মুখ চেয়ে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। বৃহত্তর স্বার্থে অমানবিক কাজও তোমাকে করতে হবে।

এরপরই রানা সরাসরি ছবোর্টের মাথায় গুলি করলো। ড্যানবার ড্যাম থেকে পড়ে গেল লেফটেন্যান্ট পদোভিচ, স্বদেশের জন্যে নিতান্তই তাৎপর্যহীন মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ছুনিয়ার বুক থেকে।

‘অভাগা!’ খেদ প্রকাশ করলো রানা।

আর ঠিক তখন চল্লিশ গজ দূরে গাড়ি থামালো টিম ম্যাকফারলন ওরফে রাউল ক্ল্যারমন্ট, জানালা দিয়ে L34A1 বের করে এক সেকেণ্ডে দেরি করলো, তারপর ফায়ার করলো রানাকে লক্ষ্য করে। টলে উঠলো রানা, হুড়ি পাথরের ওপর মুখ খুঁড়ে পড়লো শরীরটা। দেহটার দিকে তাকালো ক্ল্যারমন্ট, মনে পড়লো খাতাটা খুঁজতে হবে তাকে। গাড়ি থেকে নেমে নিহত লোকটার দিকে হেঁটে এলো। গাড়ির আওয়াজটা কাছে চলে এসেছে, হঠাৎ করে শুনতে পেলো সে। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রফেশনালদের অভ্যস্ত গুলি করার ভঙ্গিতে হাঁটুর ওপর দাঁড়ালো। লিলির গাড়ির হেডলাইট এক কি দু’সেকেণ্ডের জন্যে অন্ধ করে রাখলো তাকে। সরাসরি তার দিকেই গাড়ি ছুটিয়ে আসছে লিলি। হেডলাইটের দিকে সাব-মেশিন গান তাক করলো ক্ল্যারমন্ট।

মাত্র একটা গড়ান দিলো রানা। রাইফেলটা হাতেই ছিলো। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে প্রথমবার লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে ক্ল্যারমন্ট, কিন্তু রানা ব্যর্থ হলো না। ক্ল্যারমন্টের মাথার পিছন দিকের

খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। একটাই ভুল করেছিল ক্যারমন্ট, রানা কোনো ভুল করেনি।

ছুটে এলো মেয়েটা। ‘রবিন, রবিন তুমি...?’

‘অক্ষত নই, তবে বেঁচে আছি,’ জোর করে হেসে উঠে বললো রানা। বাঁ দিকের পাঁজর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, তবে ভাগ্য ভালো ভেতরে ঢোকেনি। তারচেয়েও বড় স্বস্তি, বেঙ্গিমানী করেনি লিলি। সব প্ল্যান মতোই ঘটেছে। ধীরেস্থে ড্যামের ওপর উঠে এলো ওরা। ট্রাইপডটা উদ্ধার করলো। নেড়েচেড়ে জিনিসটা কিছুক্ষণ দেখলো ওরা। তারপর ড্যামের কিনারা থেকে ফেলে দিলো নিচের গভীর পানিতে। কেউ আর কোনো দিন খুঁজে পাবে না ওটা।

## চোদ্দ

---

সকালের মধ্যে—লাশগুলো কেউ দেখতে পাবার অনেক আগেই—  
ছশো পনেরো মাইল দূরে চলে এলো ওরা। পথে গাড়ি বদল  
করলো কয়েকবার, তারপর প্লেনে করে সান ফ্রান্সিসকো-য় পৌঁছলো  
বেলা তিনটেয়। পাঁচটার খানিক পর দেখা গেল এয়ারপোর্টের

ষোলো নম্বর। গেটের সামনে রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলি। আবার প্লেনে চড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, লিলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে বিদায় দেবে বলে। বিজয়ী হয়ে ফিরে যাচ্ছে মাসুদ রানা।

খাতা সহ।

কে. জি. বি. হেডকোয়ার্টারে ওরা সবাই সন্তুষ্ট হবে। সোভিয়েত নাগরিক নয়, তাই হয়তো কোনো পদক বা রাষ্ট্রীয় সম্মান রানার কপালে জুটবে না, কিন্তু মৌখিক প্রশংসার কোনো অভাব হবে না। শুধু নিকোলাই ডালচিমস্কিকে খামাতে পারাটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের ব্যাপার, প্রায় অসাধ্যসাধন করেছে রানা। কিন্তু খাতা উদ্ধারের ব্যাপারটা তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলো রানা, রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সও নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। খাতা নিয়ে মস্কোয় ওকে পৌঁছাতে দেখলে অপরাধ বোধে ভুগবে তারা। রানা অবশ্য ওদের কারো সাথে কথা বলবে না। ওকে খুন করার জন্যে যারা চার চারটে কমাণ্ডো টিম পাঠায় তাদের সাথে আবার কথা কি! কথা বলতে হলে ওর কাছে আগে মার্ফ চাইতে হবে ওদের।

কিন্তু কয়েকটা বিষয় এখনো রানার কাছে পরিষ্কার নয়। খুব ভালো করেই জানে ও, মঞ্চে এখনো যবনিকাপাত হয়নি। নাটকের শেষ দৃশ্য বাকি রয়েছে।

তবে মেয়েটা সত্যি ভালো। একটু হয়তো কাঁচা, তবে বয়সও তো বেশি নয়। ওর কাজ ও ঠিকমতোই করে গেছে—সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে রানা যাতে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় না ভোগে। অনুমতি না নিয়ে বেয়াড়া কোনো প্রশ্ন করেনি। ওর কাছ থেকে পাওয়া



আদরটুকু কোনোদিন ভুলবে না রানা—সেটা অভিনয় ছিলো না, অন্তর থেকে উৎসারিত ভালোবাসার ফসল।

কিন্তু এখন ঘরে ফেরার পালা। বিদায়ের বিষণ্ণ মুহূর্ত। আর কয়েক মিনিট পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যোগাযোগ। হয়তো চিরকালের জন্যে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো রানা। পেশাগত বিড়ম্বনা থেকে নিস্তার নেই কারো। এর আগেও এ ধরনের ঘটনা রানার জীবনে ঘটেছে—অভিনয় করতে করতে সত্যি সত্যি ভালো লেগে গেছে কোনো মেয়েকে, কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে আবার ছিটকে পড়েছে দূরে। পরে আর কেউ কারো খবর নেয়ার সুযোগ পায়নি। এক মুহূর্তে অনেকগুলো মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। সবগুলো চেহারাই কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এক সময় তারা ওর খুব কাছাকাছি ছিলো, আজ কে কোথায় জানা নেই। না পাওয়ার একটা গভীর ক্ষত হঠাৎ যেন ব্যথা করতে শুরু করলো।

অভিশপ্ত জীবন। অভিশপ্ত পেশা।

‘কেমন অভ্যর্থনা দেয় তোমাকে ওরা দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে,’ বললো লিলি। ‘হিরো হয়ে ফিরে যাচ্ছো দেশে। কতো প্রশংসা হবে তোমার। কতো ভক্ত জুটবে। পদক পাবে। প্রমোশন হবে। আচ্ছা, রবিন, তখন আমার কথা মনে পড়বে তোমার? সত্যি করে বলো তো, পড়বে মনে?’

‘সত্যি কথা অপ্রিয় হয়, জানো না?’ হাসতে চেষ্টা করলো রানা। ‘আমার মনে যদি থাকতেই চাও, চলো না একসাথে দেশে ফিরি?’

‘তা কি করে হয়, রবিন!’ লিলিও জোর করে হাসলো। ‘এখানে যে আরো কাজ আছে আমার। কি একটা চাকরি, কবে ছুটি পাবো

তাও আগাম জ্ঞানার উপায় নেই। তাছাড়া, ছুটি পেলেই বা কি —মস্কোয় যাবার অনুমতি যদি না পাই?’

এমনভাবে মাথা ঝাঁকালো রানা যেন সবই বুঝতে পারছে ও।

জাপান এয়ারলাইন্সের এগারো নম্বর ফ্লাইট ছেড়ে যাবে এবার, শেষ ঘোষণাটা প্রচার করা হচ্ছে স্পীকারে। লিলির দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলো রানা। গুডবাই বলতে এতো ইতস্তত করেনি কখনো। ‘তোমার অভাব সহজে মিটবে না,’ সত্যি কথাটাই বললো ও।

‘আর আমার যে কী কষ্ট হবে, সে তুমি কোনোদিনও বুঝবে না। তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি, রবিন। এমন একটা মেয়েকে রেখে যাচ্ছে। যে আগের চেয়ে অনেক ভালো জানে সত্যিকার পুরুষ কাকে বলে।’

অন্যান্য আরোহীরা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি অনেক মানুষ চলে আসায় ওদের নিরিবিলা পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেল।

‘তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস চাইতে বাকি আছে,’ মৃদু কণ্ঠে বললো লিলি, গলায় যেন জোর পাচ্ছে না। ‘ধরো, তোমাকে একটা চিহ্ন, একটা উপহার রেখে যেতে বলছি।’

‘কি, লিলি? তোমাকে দেয়ার মতো কি আছে আমার কাছে?’ আগ্রহের সাথে লিলির দিকে ঝুঁকে পড়লো রানা। ‘আমার সাধের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই সেটা তোমাকে আমি...।’

‘খাতাটা, রবিন। খাতাটা নেবো আমি।’

লিলি কথা বলছে, পাঁজরে পয়েন্ট থি-এইট পিস্তলের খোঁচা অনুভব করলো রানা।

‘প্লিজ, রবিন, প্লিজ ! কোনো রকম বোকামি করতে যেয়ো না । এক ইঞ্চি নড়লে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে ।’ দ্রুত, চাপা স্বরে কথা বললো লিলি । শুধু কণ্ঠস্বর নয়, তার চেহারাও এখন আর কোমল নয় ।

‘কি যা তা বকছো ! ওটা আমি মস্কোয় নিয়ে যাচ্ছি !’

‘না, রবিন । ওটা ওয়াশিংটনে যাবে ।’

‘কে. জি. বি. রেসিডেন্টের কাছে ?’

মাথা নাড়লো লিলি, আর সেই সাথে খাড়ের পিছনে আরেকটা মাজলের চাপ অনুভব করলো রানা । কে পিস্তলটা ধরে আছে জানে না রানা, দেখলেও চেহারাটা চিনতে পারতো না । এই লোককে আগে কখনো দেখেনি ও, জানে না লিভেনওয়ার্থ আমি হাসপিটালে টেলিফোন কোম্পানীর সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে ছিলো লোক-টা, মিথ্যে পরিচয়ে ।

‘রবিন ডিয়ার, ছোট্ট একটা স্বীকারোক্তি করছি আমি । সৈকতে যে মেয়েটার সাথে তোমার দেখা হওয়ার কথা ছিলো, বেচারী ছোট্টো একটা অ্যান্ড্রিডেন্ট করে আহত হয় । আদর-যত্নে রাখা হয়েছে তাকে, বিশ্রাম নিচ্ছে—ল্যাংলি, ভার্জিনিয়ায় ।’

চমকে উঠলো রানা । অন্তত দেখে তাই মনে হলো ।

‘কিছু করতে চেয়ো না,’ দ্রুত সাবধান করে দিলো লিলি । ‘নয়টা পিস্তল তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে । কিছু করার আগে ওরা তোমাকে ছাতু করে ফেলবে । প্লিজ, রবিন । বাস্তবতাকে মেনে নাও । বি প্র্যাকটিক্যাল ।’

চারদিকে তাকালো রানা । কঠোর চেহারার ‘আরোহীরা’ ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ।

‘ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া ? তারমানে তুমি ওদের দলে ?’

‘রবিন, ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো । আমরাও একই জিনিসের পিছনে লেগে ছিলাম । আমরাও মানুষের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ছিলাম, চাইছিলাম যুদ্ধ যেন না বাধে । ম্যানিয়াকটাকে আমরাও খুঁজছিলাম । খুঁজছিলাম খাতাটা । এ-ধরনের একটা খাতার অস্তিত্ব যে আছে গত সাত বছর ধরে জানি আমরা । কিন্তু অনেক খুঁজেও পাচ্ছিলাম না । কারণ তোমার মতো প্রতিভাবান এজেন্ট নেই আমাদের... ।’

তিন্ত, ঝাঁঝালো কণ্ঠে রানা বললো, ‘ধন্যবাদ !’

‘তবে আমাদের রয়েছে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এক মহিলা কমপিউটার অ্যানালিস্ট, নাম চ্যারিটি উডস্টক । তার কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই আমরা, সে-ই আবিষ্কার করে ডালচিমস্কি আমেরিকায় তার নাম সহ করেছে ।’

‘সেজন্যেই বারবার তুমি আমাকে নতুন তালিকা তৈরি করার জন্যে চাপ দিচ্ছিলে ?’

‘হ্যাঁ, রবিন, তাই । তবে তোমার মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই । চ্যারিটি উডস্টক বা আমার কোনো সাহায্য ছাড়াই তালিকাটা তৈরি করেছিলে তুমি । তোমার এই কৃতিত্বে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না ।’

আবার তিন্ত কণ্ঠে বললো রানা, ‘ধন্যবাদ ।’

‘ডালচিমস্কির নামটা আমরা তোমার কাছ থেকে জানতে পারলেও, টার্গেটের তালিকা আর এজেন্টদের তালিকা আমাদের কাছে ছিলো না । সেটা ছিলো তোমার মাথায় ।’

‘ওহ্, গড ! কি ছ্যাকটাই না দিলে !’

‘ছনিয়ায় কেউ নিখুঁত নয়, হানি। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো শাস্ত হয়ে থাকো দেখি, খাতাটা আমি বের করে নিই।’ জ্বাকোটের ভেতর হাত গলিয়ে পকেট থেকে খাতাটা বের করে নিলো লিলি। কয়েক সেকেন্ডে উল্টেপাল্টে দেখলো সেটা, তারপর খুললো। একটা পাতা বাদ দিয়ে খাতার দ্বিতীয় পাতা থেকে ডীপ-কাভার টেলি-বম এজেন্টদের নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে। ধীরে ধীরে মধুর হাসি ফুটে উঠলো লিলির মুখে।

সুবেশী এক নিগ্রো লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো, হাতে একটা মেটাল অ্যাটাচি কেস। আরো চার জন লোক ঘিরে রাখলো তাকে, প্রত্যেকের রাশভারি চেহারা, চোখে পাখুরে দৃষ্টি। অ্যাটাচি কেসে ভরা হলো খাতাটা, নিগ্রো লোকটাকে ঘেরাও করে নিয়ে সরে গেল চারজন—একটা ফোন বুদের দিকে।

‘কোথায় যাচ্ছে ওরা?’ জিজ্ঞেস করলো রানা।

‘খাতাটা জেনুইন কিনা পরীক্ষা করে দেখবে,’ মুচকি হেসে বললো লিলি। ‘তুমি ওটা নিজের হাতে লিখে পকেটে রেখে দিয়েছিলে কিনা কিভাবে বুঝবো? তালিকা দেখে টেলি-বম এজেন্টদের কয়েকজনকে ফোন করবে ওরা—ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, কোড সংকেত উচ্চারণ করবে না।’

স্নান চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো রানা। অলস দৃষ্টিতে দেখলো ফোন বুদের ভেতর ঢুকে অ্যাটাচি কেস থেকে টেলি-বম বুকটা বের করছে নিগ্রো। একটু পর ডায়াল করতে শুরু করলো সে।

অপরপ্রান্তে নিশ্চয়ই কেউ ফোন ধরলো, মাত্র একটা কি দুটো কথা বলে যোগাযোগ কেটে দিলো নিগ্রো লোকটা। তারপর আবার ডায়াল করলো। এভাবে তিনবার।

একটু পর সন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে বৃদ্ধ থেকে বেরিয়ে এলো নিগ্রো, হাত তুলে ইশারা করলো লিলিকে। রানার দিকে ফিরলো লিলি, ‘অবিশ্বাস করার জন্যে ছঃখিত, রবিন,’ বললো সে। ‘কিন্তু বুঝতেই পারছে’, নিশ্চিত হবার আর কোনো উপায় ছিলো না। তুমি কোনো কারচুপি করোনি সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

‘জুতো মেরে গরুদান, আমাদের দেশের একটা প্রবাদ,’ বিষম মুখে বললো রানা। ‘এখন তাহলে কি হবে? ওয়াশিংটনের সেন্ট্রাল জেলে বিশ বছর পচবো? নাকি একেবারে ঝামেলা চুকিয়ে দেবে?’

‘এমন কথা তুমি ভাবতে পারলে? আমাকে তুমি ভুল বুঝেছো, হানি। চমৎকার একটা কৃতিত্ব দেখিয়েছো তুমি—হু’দেশের জন্যেই। তবে একটা কথা ঠিক, আমেরিকায় আর কোনো কে. জি. বি. এজেন্টকে দেখতে চাই না আমরা। তোমাকে আমরা এই প্লেনেই যেতে দিচ্ছি। তারপর একশো ছাব্বিশ না কতো যেন ডীপ-কাভার এজেন্টকে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হবে...’

‘পুওর বাস্টার্ডস!’

‘ওদের আমরা খাতির-যত্নে রাখবো, রবিন। এ তো পরিষ্কার, ওরা আমাদের সাংঘাতিক কাজে লাগবে। বন্দী বিনিময়ের সময়। আরেকটা ব্যাপার, রবিন, টাকাগুলো ফেরত দাও।’

‘টাকা!’

‘পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়েছিলাম তোমাকে,’ বললো লিলি। ‘খরচ যা হবার হয়েছে, বাকি টাকা ফেরত দাও। ওগুলো তো আর কে. জি. বি. রেসিডেন্টের টাকা ছিলো না।’

‘সব?’ মুখ ভার করে জিজ্ঞেস করলো রানা। ‘কিন্তু একেবারে

খালি হাতে বাড়ি ফিরি কিভাবে ! অন্তত ট্যাক্সি ভাড়ার জন্যে এক হাজার ডলার দাও আমাকে ।’ পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করলো রানা ।

ওয়ালেট থেকে সব টাকাই বের করে নিলো লিলি, তা থেকে এক হাজার ডলার ফেরত দিলো রানাকে । ‘তোমার নার্ভ খুব শক্ত, রবিন । নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাও, এবং আর ফিরে এসো না । স্লিঙ্গ আর কখনো ফিরে এসো না ।’

রানা উপলব্ধি করলো, মেয়েটা ওকে পছন্দ করে । অদ্ভুত এক আনন্দে ছেয়ে গেল ওর মন । ‘আচ্ছা, একটা প্রশ্ন । লিভেনওয়ার্থ হাসপাতালে লোকটাকে কে, কারা খুন করেছিল ? তোমরা, নাকি আমাদেরই লোক ?’

‘তোমাদের লোক, রবিন ।’

‘টিম ম্যাকফারলন ? এফ. বি. আই. এজেন্ট ছিলো ?’

মাথা নাড়লো লিলি । সে-ও তোমাদের লোক । আমার ধারণা, গ্রুর এজেন্ট । আমি বা আমাদের লোকেরা তোমাকে একবারও বিরক্ত করেনি । খাতাটা না পেয়ে তোমাকে আমরা বিরক্ত করতে চাইনি ।’

‘কিন্তু তোমার কাছে যে রিপার ছিলো সেগুলো সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল—নিশ্চয়ই ল্যাংলিতে, তাই না ? তাহলে আমাদের খুন করার চেষ্টা করলো কারা ?’

‘ভাবাছিলাম কখন তুমি জিজ্ঞেস করবে,’ বললো লিলি । ‘ল্যাংলিতেই যাচ্ছিলো সিগন্যাল । ওখানে তোমাদের, মানে গ্রুর একজন চর ছিলো—চ্যাপেল । একটু দেরিতে হলেও, ধরা পড়ে গেছে সে । গ্রুর আততায়ীরা চ্যাপেলের কাছ থেকেই খবর পাচ্ছিলো কোথায়

আছি আমরা ।’

আর কোনো প্রশ্ন মনে পড়লো না, কেমন উদাস চোখে লিলির দিকে তাকিয়ে থাকলো রানা । মস্কোয় ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে ওর জানা নেই । অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি সফল হলেও গ্রুর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অ্যাকশন নিতে হয়েছে ওকে । রুশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে কে জানে ।

‘যাবার সময় হলো, রবিন । মনে কোনো রাগ নেই তো ?’

মাথা নাড়লো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে চওড়া দরজার দিকে তাকালো —দূরে, রানওয়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর প্লেন । ঠোঁটে তুষ্টামির হাসি ফুটে উঠলো, বললো, ‘যার সাথেই তোমার বিয়ে হোক, জানিয়ে দियो, তাকে আমি ঈর্ষা করি ।’

‘সাহস থাকে তো তোমার বউকেও জানিয়ে দियो, লিলি নামের এক ডাইনী তোমাকে ভালোবাসে । শুড বাই, রবিন ।’

ঘুরে হাঁটা ধরলো রানা, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে পৌঁছে গেল প্লেনের কাছে । সি. আই. এ. এজেন্টরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো, রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করলো প্লেন । বিকেলের আকাশে একটু পরই অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা ।

ভিড় ঠেলে লিলির দিকে এগিয়ে এলো দু’জন মানুষ —কর্নেল জিল ক্যাসেল আর চ্যারিটি উডস্টক । কাজিন লিলিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু চ্যারিটি উডস্টকের উপস্থিতি বাদ সাধলো ইচ্ছেটায়, কর্নেল বললো, ‘এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত । অত্যন্ত টাফ একটা কেস সল্ভ্ করেছি আমরা—লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছি, এবং ইতিহাসের সেরা একদল ডীপ-কাভার এজেন্ট-কে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি । এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ঐতিহাসিক



কিছু একটা বলা দরকার...। নিজের অজান্তে, বলতে গেলে ভুল করেই আড়চোখে চ্যারিটি উডস্টকের বুকের দিকে তাকালো সে। আজও মেয়েটা ব্রেসিয়ার পরেনি।

ইতস্তত না করে চ্যারিটি উডস্টক সাড়া দিলো তার প্রস্তাবে। ‘আমার ইচ্ছে, ঐতিহাসিক কিছু বলার সুযোগটা আমাকে দেয়া হোক।’

‘আবেদন গ্রহণ করা হলো,’ ভারি গলায় ঘোষণা করলো কর্নেল

‘যারা সরাসরি মেয়েদের বুকের দিকে তাকায় তারা অভদ্র, আর যারা আড়চোখে তাকায় তারা ইতর, কিন্তু যারা বারণ করা সত্ত্বেও তাকায় তারা মানসিক প্রতিবন্ধী!’

মনে মনে নিজের গালে চড় মারলো জিল ক্যাসেল।

## পনেরো

---

‘প্রিমিয়ার কি বলেছেন শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তুমি, আনা-তোলি,’ দু’দিন পর কর্নেল বিকারেনকে বললেন জেনারেল কায়কো-ভস্কি।

‘তাই, কমরেড জেনারেল?’

‘জিজ্ঞেস করবে না কি বলেছেন ?’

‘আপনি আমাকে বলবেনই, তাই না, কমরেড জেনারেল ?’

বাক্স থেকে হাতানা চুরুট বের করে আবার সেটা বাস্ত্রে রেখে দিলেন জেনারেল কায়কোভস্কি, কি যেন তাঁর মনে পড়ে গেছে।

‘ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল,’ হাসি চেপে বললেন কর্নেল বিকারেন। ‘আজ আপনি খুবই উৎফুল্ল বোধ করছেন।’

‘করবো না-ই বা কেন ! সহকর্মীকে এ-ধরনের একটা সুখবর দেয়ার সৌভাগ্য ক’জনেরই বা হয়, বলো ?’

‘সুখবর, কমরেড জেনারেল ?’

‘দারুণ সুখবর, আনাতোলি। প্রিমিয়ার টেলি-বম অ্যাসাইন-মেন্টের পুরো রিপোর্টটা একবার নয়, দু’বার পড়েছেন। পড়ার পর প্রথমে তিনি মাসুদ রানাকে সাক্ষাৎ দান করেন। তারপর ডেকে পাঠান রেড আর্মি চীফ অভ স্টাফ মার্শাল ওনায়েভ আর মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ইগর কুদরভকে। গুজব কি জানো ? কুদরভ নাকি লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।’

‘দেখবেন, কমরেড জেনারেল, এরপরও তিনি কে. জি. বি.-কে একহাত দেখাবার সুযোগ পেলে ছাড়বেন না !’

‘সেক্ষেত্রে তোমার কাজ হবে প্রিমিয়ারকে ঘটনাটা জানানো, জেঁাকের মুখে লবণ পড়বে।’

‘আমি ? আমি কেন জানাতে যাবো, কমরেড জেনারেল ? আমি কে ?’

হাসতে লাগলেন জেনারেল কায়কোভস্কি। ‘সুখবরটা হলো, প্রিমিয়ার তোমাকে প্রমোশন দিয়েছেন। কাগজ-পত্র তৈরি হচ্ছে, একহস্তার মধ্যে জেনারেল হয়ে যাচ্ছে তুমি। শুধু তাই নয়, কে.

জি. বি. ডিরেক্টরের পদটাও অলংকৃত করতে যাচ্ছে' তুমি। আর দশদিন পর অবসর নিচ্ছি আমি ! কংগ্রাচুলেশন্স, আনাতোলি।’

‘ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল।’

‘প্রিমিয়ার সবচেয়ে খুশি হয়েছেন খাতাটা ফিরে পেয়ে,’ বললেন কায়কোভস্কি। ‘তিনি নাকি কৌতুক করে মাসুদ রানাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি খাতাটা থেকে আরেকটা খাতা তৈরি করে রাশিয়ার বাইরে কোথাও রেখে আসেননি তো?’

‘উত্তরে মাসুদ রানা কি বলেছে তাকে?’

‘উত্তরটা পারফেক্ট দিয়েছে সে। বলেছে, অবশ্যই আরেকটা খাতা আছে। ওটা নাকি তার বীমা। তাকে রাশিয়া থেকে বেরুতে না দিলে খাতাটা নাকি আমেরিকানদের হাতে চলে যাবে।’

‘যোগ্য একজন এজেন্ট, সন্দেহ নেই,’ রায় দিলেন কর্নেল বিকারেন। ‘নিজের নিরাপত্তার কথাটা সবচেয়ে আগে ভাবে।’

‘এবার, আনাতোলি, কাজের কথা বলি। নতুন একটা মিশনের কথা ভাবছি, বুঝলে। ঠিক মাসুদ রানার মতো একজন এজেন্টকে দরকার।’

‘নতুন মিশন?’

‘সাংঘাতিক কঠিন। টেলি-বমের চেয়েও রোমাঞ্চকর। শুধু বোধ-হয় মাসুদ রানার পক্ষেই...।’

‘কিন্তু সে তো টোকিয়োতে ফিরে গেছে, কমরেড জেনারেল!’

‘জানি,’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন কায়কোভস্কি। ‘যদি ওর মতো অন্তত একজন থাকতো আমাদের!’

পরদিন বিকেল বেলা সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে

ছোটোখাটো একটা আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হলো। ডিরেক্টর উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘এফ. বি. আই. এবং বিভিন্ন পেট্যাগন ইন্টেলিজেন্স শাখাগুলোকে যা বলার বলে দিয়েছি আমি। টেলি-বম ব্যাপারটা কেন শুধু আমরা একা ডিল করতে চেয়েছি, ব্যাখ্যা করার পর ওরা কেউ আর কোনো অভিযোগ তোলেনি। সবশেষে বলেছি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হোয়াইট হাউসের সমর্থন ছিলো আমাদের প্রতি। ব্যস, এতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সবাই।’

বেন সুইটল্যান্ড বললো, ‘বিগ রড ভারি চমৎকার একটা সাফল্য। ফাস্ট ক্লাস!’

জিল ক্যাসেলের ভয় হলো, বেনকে না চ্যারিটি চড় মেরে বসে। কারণ বেন তাদের কাজে শুধু বাধাই দিয়েছে, কোনো রকম সহযোগিতা করেনি। দ্রুত একবার চ্যারিটির দিকে তাকালো সে, দৃষ্টি বেয়াদপি করে বসার আগেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলো।

এরপর শুরু হলো লিলির প্রশংসা। তার অবর্তমানে।

চ্যারিটি উডস্টক লিলির অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করলো, ‘সবাই হয়তো ভাবছেন, রুশ এজেন্ট রবিন তাকে নকল টেলি-বম বুক দিয়ে গেছে, সেই ছুঁখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে লিলি। ব্যাপারটা তা নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। লিলি ছুঁখ পেয়েছে এ-কথা সত্যি, এক ধরনের রোগও তার মনে বাসা বেঁধেছে। রোগ না বলে দুর্বলতা বললে ভদ্রোচিত শোনাবে। আসল কথাটা বলেই ফেলি। লিলি আমাকে নিজে বলেছে। রুশ এজেন্ট রবিনকে সে ভুলতে পারছে না।’

‘আমাদের উচিত ব্যাপারটাকে সহানুভূতির চোখে দেখা,’ জিল ক্যাসেল মন্তব্য করলো। ‘আমার মনে হয় লিলিকে লম্বা একটা

ছুটি দিয়ে কোনো সী-বীচে পাঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না ।’

এরপর চ্যারিটি উডস্টকের প্রসঙ্গ তুললেন ডিরেক্টর । ‘প্রায় সব-টুকু কৃতিত্ব আসলে চ্যারিটির । আজ সকালে একটা কাগজে সই করেছি, তাতে বলা হয়েছে চলতি মাস থেকে তোমার বেতন দু’-হাজার ডলার করে বাড়লো । এতে কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধে দেখা দেবে, কেন না, তোমার বস জিল ক্যাসেলের বেতন আর তোমার বেতন প্রায় সমান সমান হয়ে গেল । এটা তেমন বড় কোনো সমস্যা নয়, তোমাকে একটা আলাদা বিভাগের প্রধান করে দিলে সব ঝামেলা চুকে যাবে ।’

ডিরেক্টরের তরফ থেকে একটা মেডেলও দেয়া হলো চ্যারিটি উডস্টককে । সেটা তার ব্লাউজে পরিয়ে দিলো জিল ক্যাসেল । আশ্চর্য হয়ে চ্যারিটি লক্ষ্য করলো, এতো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েও কর্নেল তার বুকের দিকে ভুলেও একবার তাকালো না । এই প্রথম লোকটার প্রতি কিছুটা দয়া এবং শ্রদ্ধা জাগলো তার মনে ।

‘কংগ্রাচুলেশন্স, চ্যারিটি,’ আন্তরিক কণ্ঠে বললো কর্নেল ক্যাসেল ।  
‘আমরা তোমাকে নিয়ে সত্যি গর্বিত !’

উৎসব শেষে নিজের অফিসে ফিরে এলো কর্নেল । একটু পর নক হলো দরজায় ।

‘কাম ইন ।’

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো চ্যারিটি । দেখলো, মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে বস ।

‘কিছু বলবে, চ্যারিটি ?’

‘মেডেলটা দেখাতে এলাম, কর্নেল,’ বললো চ্যারিটি । ‘আপনি নিজের হাতে লাগিয়েছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলাম, একবারও চোখ

তুলে জিনিসটা ভালো করে দেখেননি ।’

‘দেখিনি, দেখতে চাইও না ।’

‘কিন্তু কেন ?’

‘নিজ্জেষ্ট বুঝে দেখো,’ বললো কর্নেল । ‘এমন এক জায়গায় লটকে আছে, ওটার দিকে তাকালেই তুমি ভেবে বসবে আমি বোধহয়...’

‘কিছুই ভাববো না, কিছুই মনে করবো না,’ মিটিমিটি হেসে বললো চ্যারিটি । ‘আপনি তাকান, কর্নেল, প্লিজ ।’

কর্নেল জিন ক্যাসেল তাকালো ।

টোকিওতে ফিরে এসে লং ডিসট্যান্স লাইনে মেজর জেনারেল ( অবসরপ্রাপ্ত ) রাহাত খানের সাথে কথা বলছে রানা ।

‘কিন্তু খাতাটা ?’ জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান ।

‘ডালচিমস্কির খাতাটা মস্কোয় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি, স্যার,’ বললো রানা । ‘লিলিকে নকল একটা খাতা দিয়েছি—গগলের কাছ থেকে আগেই ওটা যোগাড় করেছিলাম । গগলের খাতায় আমিই এজেন্টদের রুশ অর আমেরিকান নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, কোড সংকেত ইত্যাদি লিখি । সব ভুয়া ।’

‘খাতাটা ওরা পরীক্ষা করেনি ?’

‘জানতাম করবে,’ বললো রানা । ‘তাই তালিকার প্রথম ও শেষ বিশটা ফোন নম্বরে গগলের লোক বসিয়ে রেখেছিলাম । টেলিফোন রিসিভ করেই কেটে পড়েছে ওরা । কারও টিকিও স্পর্শ করতে পারবে না সি. আই. এ. । তালিকার আর সব নামও ভুয়া, ওই নামে ওই ঠিকানায় কেউ থাকে না ।’

‘খুব বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছিলে,’ বললেন রাহাত খান । ‘ওরা

যদি তালিকার মাঝখানের কোনও নাম চেক করতো তাহলে তুমি ফেঁসে যেতে।’ এক সেকেণ্ড পর আবার বললেন তিনি, ‘এছাড়া অবশ্য আর কিছু করারও ছিলো না তোমার। যাক, ভালোয় ভালোয় উতরে গেছো সেটাই আসল কথা। খুশি হয়েছি আমি। এখন টেলি-বম এজেন্টদের নিয়ে কি করা হবে ভেবেছো কিছু?’

‘খাতা একটা আমাদের হাতেও থেকে গেছে, স্যার,’ বললো রানা। টেলি-বম ফাটিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে দুই সুপারপাওয়ারকেই নরম রাখতে পারি আমরা। কিন্তু সেটা ব্ল্যাকমেইলিঙের পর্যায়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আপনি, স্যার।’

‘সিদ্ধান্ত একটাই হতে পারে,’ বললেন রাহাত খান। ‘একজন ছ’জন করে আমেরিকা থেকে ওদেরকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো। তোমার এজেন্সিকে দিয়ে কাজটা করাতে পারলে ভালো হয়। তবে তোমার জড়িয়ে পড়া চলবে না। তোমাকে ওরা ডেকেছে।’

‘আমাকে ডেকেছে? কারা ডেকেছে, স্যার?’

‘সে প্রসঙ্গে পরে আসছি,’ বললেন রাহাত খান। ‘আগে এই ব্যাপারটা শেষ করে নিই। গগল যাদের আটক করে রেখেছে তাদের কথা ভেবেছো কিছু?’

‘গ্রুর লোকগুলোকে মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে—গগলকেই দিয়েছি কাজটা।’

‘গুড। ভালো কথা, মেয়েটা যে কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট নয়, তুমি টের পেলো কখন?’

‘একেবারে প্রথম দিকেই,’ বললো রানা। ‘কে. জি. বি. রেসিডেন্টের এজেন্ট হলে তার জানার কথা আমি আপনার এজেন্ট, রুশ এজেন্ট নই। কিন্তু লিলি আমাকে দেখে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে

বসে—আমি কি তাসখেন্দেব লোক ?’

‘বুঝেছি । আচ্ছা, শোনো, তোমাকে কিন্তু ছুটি দেয়া যাচ্ছে না । অ্যান্টি টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের ডঃ এডওয়ার্ড ওয়ার্নার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে । ওরা নাকি একটা ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছে, তোমাকে দরকার ।’

চুপ করে থাকলো রানা ।

‘ঠিক আছে, লগুনে যাবার আগে টোকিওতে আরো নাহয় তিন-চারদিন থাকো,’ ভারি গলায় বললেন রাহাত খান, কল্লনার চোখে রানা দেখলো তাঁর কাঁচাপাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে । ‘ভুলে গেলে চলবে কেন, ওদের সাথে আছো তুমি । ডাকলে তো যেতে হবেই ।’

‘জী, স্যার । যাবো ।’

‘এদিকে এক ঝামেলা হয়েছে, বুঝলে,’ অনেকটা অপরাধ স্বীকারের সুরে শুরু করলেন রাহাত খান । ‘বিশ্রাম-টিশ্রাম কিছু না, আমি আসলে গগলের প্রস্তাবে রাজি হই শিকারের লোভে । ভেবেছিলাম শিকারও পাবো না, বেশিদিন থাকতেও হবে না । কিন্তু কি বিচ্ছিরী কাণ্ড বলো দেখি, ছ’এক দিন পরপরই একটা করে ভালো শিকার পেয়ে যাচ্ছি ! এমন অবস্থা হয়েছে কেউ আমাকে তাড়িয়ে দিলেও এখান থেকে যেতে চাইবো কিনা সন্দেহ... ।’

কে কথা বলছেন ? রাহাত খান ? নিজের কানকেই রানা বিশ্বাস করতে চাইলো না । ‘স্যার, আপনি... ।’

‘আমি কি ?’

‘না, মানে বলছিলাম দেশে... ?’

‘কবে ফিরবো, তাই তো ? স্ট্রোকটায় যদি মারা যেতাম, তখন কি



হতো ?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন বস । 'সবারই বোঝা উচিত যে একজন মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না । অনেক তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়িয়েছো, এবার একটু একটু করে দায়িত্ব নিতেও শেখো ।'

।' লং ডিসট্যান্সে প্রচুর বিল উঠছে, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই বুড়োর, ভাবলো রানা । ঝাড়া দুই মিনিট পর থামলেন তিনি । শেষ কথাগুলো ছিলো, 'ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে সোজা দেশে ফিরবে তুমি । তোমার স্থিতি দরকার । সমস্ত ব্যাপারে আমাকে অনুকরণ করতে হবে না । তোমার বিয়ে করা দরকার । অবিবাহিত কাউকে দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেয়ার ইচ্ছে আমার নেই ।'

বোবা হয়ে গেছে রানা ।

'লাইনে আছো ?'

'হী, স্যার ।'

'সাবধানে থাকবে, শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো,' বলে লাইন কেটে দিলেন তিনি ।

ভিজ্ঞে চোখ নিয়ে ফোন বুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এলো রানা । কেন যেন বিষাদে ছেয়ে গেছে মন । বুড়ো মানুষটার অনেক কিছুই বদলায়নি, কিন্তু সব কিছুই আগের মতো আছে তা বলা চলে না । কথায় কথায় আজকাল বিদায়ের প্রসঙ্গ তোলেন । কারণে অকারণে শিশুর মতো রেগে যান, অভিমান করেন । তবে ওর প্রতি দরদ, স্নেহ, আর ভালোবাসা আগের মতোই আছে । অদ্ভুত এই মানুষটা একদিন সত্যি সত্যি থাকবেন না, কথাটা ভাবতেই কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগে । ভাবতে গেলে গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গিয়ে ভারি কষ্ট হয় । ভিজ্ঞে আসে চোখ ।

[সমাপ্ত]

# আলোচনা

মোঃ রকিবুল আলম

৪ নং এস, ও ক্র্যাট, আদমজী, নারায়ণগঞ্জ ।

আপনি এবং আপনার ছোট ভাই ( কাজি মাহবুব হোসেন )-এর লেখা কোন বই আপনার আকা ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন পড়েছেন কি ? যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে কেন পড়েন নি ?

শুনেছি, আপনার এবং আপনার ছোট ভাইয়ের বই লেখার ব্যাপারে আপনার বাবার অমত ছিল, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি ?

“স্বর্ণসংকট” বইটা ছবছ নকল করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ করা হয়েছিল । কথাটা সত্য কি ?

\* আমার লেখা অনেক বই-ই আমার আকা পড়েছেন, এবং দোষ-গুণ আলোচনা করে উৎসাহ দিয়েছেন । এমন কি একটি বইয়ের ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন তিনি ।...আমার ভাই যখন লিখতে শুরু করেন, তখন আকা প্রয়াত ।...স্বর্ণসংকট সম্পর্কে যা শুনেছেন, মিথ্যা ।

সৈয়দ ইমতিয়াজ আরেফিন

দিলালপুর, পাবনা ।

সম্প্রতি পেপারে দেখলাম একটি মুভি সংস্থা মাসুদ রানা-২ ( ভারত নাট্যম ) অনুসারে একটি ছবি তৈরী করতে যাচ্ছেন । এ-ব্যাপারে আমার প্রথম অনুরোধ ছবি তৈরীর ব্যাপারে আপনি

অনুমতি দিবেন না। দিয়ে থাকলে তাহলে দয়া করে শর্ত দিয়ে দিন  
মাসুদ রানার শারীরিক ও চারিত্রিক সকল বৈশিষ্ট্য সহ তাকে  
চিত্রায়িত করতে হবে এবং ঘটনাটি যতখানি সম্ভব বইয়ের সাথে  
মিল রেখে চিত্রায়িত করতে হবে।

\* মাসুদ রানা-২ বলতে এখানে ‘ভারত নাট্যম’ বোঝানো  
হয়নি—সিনেমার দ্বিতীয় মাসুদ রানা হিসেবেই ২ লেখা হয়েছে।  
...আমার শর্ত দেয়া আছে, সিনেমার স্ক্রিপ্ট আমাকে আগে  
দেখাতে হবে—প্রযোজক শেষ পর্যন্ত কি করেন দেখা যাক।...ছবির  
প্রয়োজনে অনেক সময় কাহিনী বেশ অনেকখানি পরিবর্তন করতে  
হয়, এটা মেনে নিতে হবে।

শামীম কবীর

গ্রাম—টাইলা, পোঃ রজনীগঞ্জ, জিঃ সুনামগঞ্জ।

আমাদের একান্ত অনুরোধ স্পর্ধা, অপহরণ, বিপর্যয়-এর মত  
দুর্বল ও অবাস্তব বই লিখে আমাদেরকে বিরক্ত ও হতাশ না করে  
ভারত নাট্যম, রক্তের রং, সংকেতের মত সুন্দর, গতিময় ও বাস্তব-  
ধর্মী বই লিখে আমাদেরকে কৃতার্থ করুন।

\* আমার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, ভাই।  
দোষ-ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন।

আবদুল মোহাইমেন পল্লব

সেবা পাঠক সমিতি, সরিষাবাড়ী টাউন, জামালপুর-২০৫০

আমরা এখানে ‘সেবা পাঠক সমিতি’ গড়ে তুলেছি। আমাদের  
সমিতির নিয়ম হলো, আমরা প্রত্যেক সদস্য মাসে ১০ টাকা করে  
টান্দা দেব। টান্দার টাকা আপনার সেবা প্রকাশনীতে পাঠানো হবে  
এবং নতুন বই বের হওয়ার সাথে সাথে আপনি তা পাঠাবেন। বই

আসার পর প্রত্যেক সদস্য সেটা ক্রমাগত পড়বে এবং পরে তা সমিতির পাঠাগারে সংগৃহীত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০। আজ মানি-অর্ডার যোগে ১০০ (একশত টাকা) পাঠালাম। ডিসেম্বর মাসে যে বইগুলো বের হয়েছে সেগুলো পাঠাবেন এবং এর পর থেকে নতুন বই বের হবার সাথে সাথে আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন (রহস্যপত্রিকা সহ)। অর্থাৎ ‘সেবা পাঠক সমিতি, সরিষাবাড়ী’ সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হলো। প্রতি বই-এ ভালো কমিশন দিলে খুশী হ’ব। কারণ আমরা সবাই ছাত্র (বয়স সীমা সর্বোচ্চ-১৮ বৎসর)। টাকা যোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হয়। তাই একটু আমাদের দিকে নজর দেবেন। টাকা শেষ হলে আমাদের জানালে আমরা ১০০ টাকা করে পাঠাব। আমাদের এই ‘সেবা পাঠক সমিতি’র ব্যাপারে আপনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

\* নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো। সেলস্ ম্যানেজার সাহেবকে সর্বোচ্চ কমিশন দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলাম।

রাজীবুস সামস্ পিঙ্গুস

চাটমহর ডিগ্রী কলেজ, পাবনা।

পিশাচ কাহিনী আমার কাছে খুব সুন্দর লাগে। এজন্য রানার পিশাচ দ্বীপ অনেক বার পড়েছি। এখনও একবার করে মাঝেমধ্যে রিভিশান দিচ্ছি।

শিক্‌দার এখনও পৃথিবীতে চলাফেরা করছে। আনুন না ওকে নামিয়ে রা-১৫৫-এ অথবা এর আগে বা পরে।

\* ভাল পিশাচ কাহিনী পেলে শিক্‌দারকে ফেরত আনার ইচ্ছে আমারও আছে।

সুলতানা, চুমকি

৯২/এন. এস. রোড, থানা পাড়া, কুষ্টিয়া।

আমি অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রী, ছোটখাট গল্প লেখি। আপনার রহস্য পত্রিকাতে স্থান পাবে কিনা জানি না। 'একটু যাচাই করে দেখবেন কি? যদি দেখতে চান তবে পাঠাব, আপনার অনুমতি পেলে।

\* নিশ্চয়ই। পাঠিয়ে দাও। তবে একটা অনুলিপি নিজের কাছে রেখে পাঠিও। পাণ্ডুলিপি ফেরত পাবে না।

লিটন

৫/জে. পলোব্রাউণ্ড কলোনি, চট্টগ্রাম।

এস. এম. শফি পরিচালিত কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা সিরিজ থেকে নেওয়া ছায়াছবি “মাসুদ রানা-২ এর বিজ্ঞাপন দেখলাম ২রা জানুয়ারীর ইত্তেফাকে। কাহিনীটি রানার কোন্ বই থেকে নেওয়া হয়েছে জানাবেন কি?

\* বিষ নিঃশ্বাস।



## বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক, বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

## আগামী বই

শার্লক হোমসের রহস্যোপন্যাস

## দ্য সাইন অভ ফোর

মূল : স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

রূপান্তর : জি. এইচ. হাবীব

বিষয় : আন্দামান থেকে ইংল্যাণ্ডে ফিরেই বেমালুম গায়েব হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান।...ক্যাপ্টেনের বন্ধু মেজর শোল্টো আতকে ওঠেন কেঠো-পা লোক দেখলে।...ওদিকে ক্যাপ্টেনের মেয়ের কাছে কোথেকে যেন একটা করে মুক্তো আসে ফি বছর।

এইসব সমাধানের ভার পড়লো হোমসের ওপর।



মাসুদ রানা-১৫০

দুইখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই-থ্রিলার

## শান্তিদূত-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

খুন হতে গিয়ে কোনমতে বেঁচে গেল রানা।

কিভাবে যেন বারবার

ওর ঠিকানা পেয়ে যাচ্ছে শত্রুপক্ষ।

শেষমেষ সন্ধান পাওয়া গেল

নিকোলাই ডালচিমস্কির। জানা গেল

কোথায় আঘাত হানবে সে এবার।

ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে রানা।

কিন্তু ওর জন্যেও ফাঁদ পেতে

অপেক্ষা করছে শত্রুপক্ষের একজন।

দেখা যাক কি হয়।

বিশ ঢাকা



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০